মহাপ্রভু
শ্রীচৈতন্য
৪।76
BANARAS
PRESENTED
নারায়ণচন্দ্র চন্দ

# মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

মূল্য : শোভন সংস্করণ—সাত টাকা
সাধারণ সংস্করণ—ছয় টাকা

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীস্বপনকুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, রূপবাণী প্রেস থেকে শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

মায়ের করকমলে
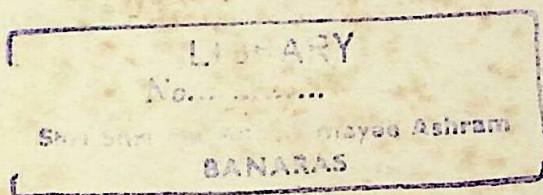
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
তিঁহোঁ যত শক্তি দেন সভে তত গাই'॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

# নিবেদন
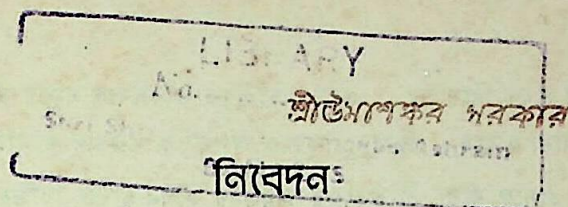
মহাপ্রভুর জীবন ও লীলা মহাসমুদ্রের মতোই; মুগ্ধ করে, অভিভূত করে, আনন্দময় অনুভূতিতে বিহ্বল করে। মায়ের আগ্রহে ও অনুপ্রেরণায় এই পবিত্র জীবন-কথা সহজ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। কাজটি এমন দুরূহ এবং মধুময় আগে ভাবতে পারিনি। গৌরাঙ্গদেবের বিচিত্র জীবনের ঘটনাগুলি কথার রঙে রাঙিয়ে পর পর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি। শিল্প-সুষমা ফুটেছে কিনা সে বিচারের ভার পাঠকের ওপর।

গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করতে আমার প্রায় বছর পাঁচেক সময় লেগেছে। এই সময়টি কেটেছে যেন অপূর্ব পুলকময় জগতে। এই বই লিখতে যেমন একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন আর কোন বইয়ের বেলায় হয়নি। নদীতে জোয়ার এলে স্রোত উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়, যদিও তা অল্পকালের জন্য; মনের ও ভাবের নদীতে-ও এমনি ধরনের জোয়ার উপলব্ধি করেছি। তখন লেখা এগিয়ে চলেছে দ্রুত এবং সাবলীল গতিতে। প্রায় অর্ধেকটা লেখার পর জোয়ার বন্ধ হয়ে গেল; সে সময় প্রায় বছর দেড়েক এক কলম-ও এগোতে পারিনি। বন্ধুগণ তাগিদের পর তাগিদ দিয়েছেন কিন্তু জোয়ারের অভাবে নৌকা ছাড়া হয়নি; চেষ্টা ক'রেও লেখা জমানোর মতো ভাব আনতে পারিনি। নিরাশ হয়ে ভেবেছি—আর হবে না! কিন্তু মা নিরাশ হননি, তাগিদ-ও দেননি। তিনি বলেছেন—জোর জবরদস্ত ক'রে এ-কাজ হয় না, এজন্য কৃপা চাই।

অবশেষে মহাপ্রভুর কৃপায় অনুকূল মনোভাব ও শক্তি ফিরে এলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই বাকি অংশ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হ'ল। মানসিক দিক থেকে নিরলম্ব হয়ে অকূল সমুদ্রে এতদিন ভেসে বেড়াচ্ছিলাম; অনুকূল স্রোতের টানে কে যেন তীরে এনে ফেললো! নিজ সামর্থ্যে হয়তো সম্ভবপর হ'ত না।

জলপাইগুড়ি বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুর চৈতন্যদেবের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা শুনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ বইয়ের

প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন। এতে মহাপ্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। শ্রীমান্ ঠাকুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে যাঁরা শ্রীচৈতন্যের অমৃতময় জীবন-চরিত বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। প্রেম ও ভক্তির অবতার মহাপ্রভুর জয় হোক্॥

জলপাইগুড়ি
রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৫

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

## সূচীপত্র

| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- | --- |

# আবির্ভাব

—দেখুন তো বাবা কি হ'ল! অঘ্রাণ মাসে দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে, আর আজ মাঘ মাস শেষ হ'তে চললো কিন্তু কিছুই তো বুঝিসুঝি নে। চিন্তাকুলা শচীদেবী নীরবে মাথা নীচু ক'রে রইলেন। পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী কন্যার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে আঁক কষতে লাগলেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত জ্যোতিষী তিনি।

এর আগে শচীর আট-আটটি কন্যাসন্তান অকালে বিনষ্ট হয়েছে; বংশের একমাত্র প্রদীপ-শিখা ছেলে বিশ্বরূপ। এবার অদৃষ্টে কি আছে ভেবে শচী এবং জগন্নাথ মিশ্র উভয়েই ব্যাকুল হয়েছেন। প্রসবের সময় কবে পার হয়ে গেছে, কিন্তু এ কি হ'ল! নানাজনে নানারূপ ভয়ের কথা বলে; অগত্যা শচী তাই পিতার শরণাপন্ন হয়েছেন।

আঁক কষতে কষতে নীলাম্বর চক্রবর্তীর মুখে উজ্জল প্রসন্ন আভা ফুটে উঠলো। মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি বলেন—অপূর্ব মা, অপূর্ব! তুমি কোন চিন্তা ক'রো না; অল্পদিনের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—যেমন-তেমন নয়, এবার এক মহাপুরুষ আসবেন তোমার ঘরে।

মেয়ে-জামাইয়ের মন থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। আশার সোনালী আলো ফুটে ওঠে তাঁদের চিত্তাকাশে।

*　　*　　*　　*

শকাব্দ ১৪০৭। ফাল্গুন মাস। পূর্ণিমা তিথি। সেদিন চন্দ্রগ্রহণের যোগ। গঙ্গার তীরে নবদ্বীপ নগরে কল-কোলাহল উঠেছে গগনভেদী হয়ে; লক্ষ কণ্ঠে হরিনামের ধ্বনি। চতুর্দিকে শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা রব—সমগ্র নগর যেন পূজা-উৎসবে মেতে উঠেছে; গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর সমাবেশ। সন্ধ্যায় পূর্বগগনে রজতশুভ্র পরিপূর্ণ চন্দ্র ঝলমল ক'রে উঠলো; ঠিক সেই সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এক শিশুর আবির্ভাব হ'ল; পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদের মতোই নিটোল; অঙ্গের সুষমা চাঁদকেও হার মানায়। প্রতিবেশিনীরা আনন্দে হুলুধ্বনি করেন। আকাশে রূপার চাঁদ, মাটিতে সোনার চাঁদ। সবাই

ছুটে আসে ঘর-আলো-করা ছেলে দেখতে; চোখ জুড়ায়, বুকে আনন্দের তুফান ওঠে।

আকাশের চাঁদকে রাহু গ্রাস করে; আকাশ ক্রমে ধূসর ধূমল বর্ণ ধারণ করে; চারিদিকে স্তবস্তোত্র মন্ত্রপাঠ আরাধনা সঙ্গীতে বাতাস মুখরিত। সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র; গ্রহাদির সমাবেশে সর্বশুভ লগ্নে গোরাচাঁদ আবির্ভূত হলেন; এমন শুভক্ষণে জন্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবে না।

*　　　*　　　*　　　*

এখন থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। বাংলায় তখন পাঠান সুলতানদের আমল। বাংলার রাজধানী গৌড়; নবদ্বীপ তখন বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে, বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। হাজার হাজার টোলে লক্ষ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করে; বিদ্যার যেমন সমাদর, পাণ্ডিত্যের গর্ব ও আভিজাত্যও তেমনি। নবদ্বীপ তখন বিদ্যানগরে পরিণত হয়েছিল।

*　　　*　　　*　　　*

শ্রীহট্টনিবাসী জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপের বাসিন্দা হয়েছিলেন। সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি; অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় দিন অতিবাহিত হ'ত। সংসারে দৈন্য ছিল কিন্তু অন্তরে দীনতা হীনতা ছিল না। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি পুরন্দর আখ্যা লাভ করেছিলেন। বিদ্যা-সেবা ও দেব-সেবা ছিল তাঁর শুদ্ধশান্ত জীবনের অবিচল নিত্যকার ব্রত।

শচীমাতা ছিলেন শুদ্ধাচারিণী, পতিব্রতা, সরলা গৃহিণী। অত্যন্ত স্নেহশীলা। একে একে আটটি সন্তান গেছে; মন হয়েছে স্পর্শাতুর, শঙ্কাকুল; সর্বদা ভয় নয়নের মণির বুঝি কোন অকল্যাণ হ'ল! অন্তরের সবখানি স্নেহ দিয়ে সন্তানকে ঘিরে রাখেন; সন্তানের মঙ্গলকামনাই তাঁর দেবতার কাছে একমাত্র প্রার্থনা।

*　　　*　　　*　　　*

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে গোরাচাঁদ দিন দিন বেড়ে ওঠে। মা ডাকেন নিমাই, পাড়ার মেয়েরা বলেন গোরাচাঁদ। ভুবনমোহন শিশু। কাঁচা সোনায় গড়া সুবাসিত অঙ্গ; হাত-পায়ের তালু হিঙ্গুলের রঙে যেন রাঙানো; পক্কবিম্বের ন্যায় মধুর ওষ্ঠ। পদ্মের পাপড়ির মতো টানা টানা দীঘল চোখ, তাতে ঈষৎ অরুণিমা; নিবিড় কালো চোখের তারায় পুলক-জাগানো আবেশ। যার

দিকে শিশু চায় তাকে মুগ্ধ করে, যে তাকে কোলে নেয় অপূর্ব পুলকে তার মন হয় পরিপূর্ণ, দেহ হয় আনন্দে রোমাঞ্চিত।

নিমাইকে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'তে থাকে।

নিমাইকে ঘরে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা গৃহকাজে ব্যস্ত থাকেন! মন পড়ে থাকে নিমাইয়ের কাছে। মাঝে মাঝে দেখতে আসেন ছেলে কি করছে। কখনো দেখেন শিশুর বুকের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মতো আভা ফুটে রয়েছে; কখনো কখনো জ্যোতির্ময় আকৃতি নজরে পড়ে। কারা যেন শিশুর আশে-পাশে অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়ায়।

পাশের ঘরে শিকায় দুধ দই, ননী মাখন ভাঁড়ে ক'রে ঝুলানো থাকে। কখনো দেখেন শিকার ভাঁড়গুলি কাৎ হয়ে পড়েছে, সারা ঘরে ননী মাখন ছিটানো। কে এমন করলো? এমন দস্যুপনা করার কেউ তো নাই বাড়ীতে! মা ভাবেন—নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার কাজ। নিমাইয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক তাঁর কেঁপে ওঠে। হঠাৎ দেখেন ঘরের মেঝেতে ছোট ছোট পায়ের দাগ! বিস্মিত হন। তাই ত! অবাক কাণ্ড। কার এতটুকু পা? ছুটে গিয়ে দেখেন নিমাই বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছে। মিশ্রকে ডেকে দেখান পদচিহ্নগুলি।

মিশ্র পদচিহ্ন পরীক্ষা ক'রে দেখেন। এগুলি অসাধারণ। কুশচক্রধ্বজ চিহ্ন সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে। শিশুর পদতল পরীক্ষা ক'রে মিশ্রের বিস্ময় আরো ঘনীভূত হয়। এখানেও যে ঐ একই চিহ্ন! পত্নীকে বলেন—তোমার ছেলের দেহে গোপাল বিরাজ করেন। যত্ন ক'রে একে মানুষ ক'রো। আমরা ভাগ্যবান।

কোন কোন দিন শচী শুনতে পান রুনুঝুনু রুনুঝুনু শব্দ; নূপুর প'রে ছোট ছোট পা ফেলে কে যেন ঘরময় হেঁটে বেড়ায়। এসে দেখেন কেউ নাই; নিমাই শুয়ে আছে; সুগন্ধে ঘর পরিপূর্ণ।

* * * *

স্নেহান্ধ জননী পুত্রের মঙ্গলের জন্য তার গলায় রক্ষা-মাদুলী বাঁধেন; জ্ঞানী মিশ্র পুলকিত অন্তরে গৃহদেবতার পূজায় মনোনিবেশ করেন।

* * * *

নিমাই দিন দিন বড়ই চঞ্চল দুরন্ত হয়ে ওঠে। হামাগুড়ি থেকে হাঁটা শিখেছে; সারা আঙ্গিনায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। অঙ্গ থেকে স্নিগ্ধ

আলো ঠিকরে পড়ে। নয়নের আনন্দদায়ক শিশুকে দেখে দেখে কারো তৃপ্তি হয় না।

একদিন। উঠানে এক সাপ বেরিয়েছে, বিষধর সাপ। চঞ্চল শিশু তার লেজ টেনে ধরেছে; সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকল, নিমাই তার ওপর শুয়ে খলখল হাসি হাসতে লাগল। দেখে সবাই ভয়ে অস্থির; কেউ গরুড় গরুড় ডাকে, কেউ বা ইষ্টমন্ত্র জপ করে। অবশেষে সাপ ধীরে ধীরে চলে গেল; মা ছুটে গিয়ে নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাহিলারা বলতে লাগলেন ---নিমাইয়ের পুনর্জন্ম হ'ল। লীলাচ্ছলে অনন্তশয়ন কিংবা কালীয় দমন হ'ল কিনা কে জানে!

নিমাই বড়ই দুরন্ত, চঞ্চল। সারাদিন ঘুরঘুর ক'রে বেড়ায়, কখনো বা বাইরে চলে যায়। যে জিনিসের বায়না ধরে তা না পেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কী কান্না! চোখের জলে মাটি ভিজে যায়। শিশুর চোখ দিয়ে যে এত জল পড়ে তা কেউ দেখেনি। একদিন হয়ত বায়না ধরলো—চাঁদ এনে দাও। কান্না থামে না কিছুতেই; কেবল উচ্চরবে হরিনাম শুনলে শিশুর কান্না বন্ধ হয়; তখন সে হাসে আর হাত তুলে তুলে নাচে।

নিমাইয়ের রূপের তুলনা নাই। সে রূপ কেবল চোখকে আনন্দ দেয় না, মনকেও আকৃষ্ট করে। পূর্ণিমার চাঁদ আর প্রভাত-সূর্যের মাধুরী মিশিয়ে দেহের বর্ণসুষমা; আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ খঞ্জন-আঁখি, অরুণ অধর, কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি। শিশু যখন হাঁটে, হিঙ্গুল-রাঙা পদতলে যেন রক্ত ফেটে পড়ে। সোনার গহনা সোনার অঙ্গে ম্লান দেখায়।

* * * *

চঞ্চল বালক অন্যের অলক্ষ্যে একদিন পথে বেরিয়ে পড়েছে; হেঁটে চলেছে একা একা। গায়ে সোনার অলঙ্কার; তাই দেখে দুই চোরের হ'ল লোভ। তারা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ছেলেকে ভুলিয়ে কোলে তুলে নিল। বললো— চল বাবা, বাড়ী যাই।

এক চোর নিমাইকে কিছুটা সন্দেশ খেতে দেয়। মনে মনে তারা বেজায় খুশি; বাড়ী গিয়েই অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে শিশুকে বিদায় ক'রে দেবে। পথে অগণিত লোক চলাচল করে। কে কার খোঁজ রাখে। চোর পরম সম্পদ কোলে নিয়ে মহানন্দে চলেছে তার বাড়ীর দিকে।

এদিকে বাড়ীতে নিমাইকে খুঁজে না পেয়ে শচীদেবী, মিশ্র ও তাঁদের আপনজন দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শহরে লক্ষ লোকের বাস, পথে হাজার হাজার লোকের আনাগোনা। একাকী শিশু কোথায় গিয়ে দস্যু-তস্করের কবলে পড়লো, কি গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো কে জানে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে মিশ্র কয়েকজন বন্ধুসহ বিষণ্নমনে বারান্দায় বসে আছেন, এমন সময় নিমাই দৌড়ে এসে তাঁর কোলে চড়ে বসলো! সবাই বিস্ময়ে উৎফুল্ল; দেহে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। কে নিয়ে এল? সে উপকারী বন্ধু কোথায় গেল? কে সে?

সে বন্ধু আর কেউ নয়—সেই দুই চোর! ছোট-বড় পথ অতিক্রম ক'রে দ্রুতপদে তারা নিজেদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেছে; মতিভ্রম হয়েছে, কোথায় চলেছে বুঝতে পারেনি। অবশেষে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে এসে শিশুকে নামিয়ে দিয়ে বলেছে—এই তো বাড়ীতে এসে গেছি।.........

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তস্কর দুজন আর দেরী করেনি, মনে মনে লজ্জিত হয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছে; হয়ত বিস্মিত হয়ে ভেবেছে—কেমন ক'রে এমন হ'ল!

* * * *

তখনকার দিনে নবদ্বীপ সারা ভারতবর্ষে বিদ্যার স্থান ব'লে খ্যাত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত ব'লে তীর্থস্থানও বটে। প্রায়ই সাধু সজ্জন, পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে।

একদিন এক তৈর্থিক সন্ন্যাসী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। পরম ভক্ত; কণ্ঠে শালগ্রাম শিলা ঝুলানো, দিবানিশি কণ্ঠে মধুর কৃষ্ণনাম। বাল গোপালের ভক্ত তিনি, তীর্থে তীর্থে পর্যটন ক'রে বেড়ান; অন্তরের আলো চোখের উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশমান। মিশ্র তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রে নিজহস্তে তাঁর পদ প্রক্ষালন ক'রে আসন দান করেন। মিশ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করেন এবং ভোগের দ্রব্যাদি সাজিয়ে দিয়ে তাঁর ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করতে বসেন। এমন সময় বালক নিমাই ধূলিমাখা দিগম্বর বেশে হাসিমুখে এসে ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়ায়। চোখে তার কৌতুকের হাসি। ভোগের অন্ন থেকে এক গ্রাস তুলে নিয়ে সে মুখে দিয়ে হাসতে থাকে।

—হায় হায়, সব নষ্ট করলো! সব নষ্ট করলো—ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'রে উঠেন। ভাবগতিক দেখে নিমাই ছুটে পালায়, ক্রুদ্ধ মিশ্র তার পিছে পিছে ছোটেন শাস্তি দেবার জন্য।

ব্রাহ্মণ মিশ্রকে শান্ত করেন; অবোধ বালকের কি হিতাহিত জ্ঞান আছে? ওকে শাস্তি দিয়ে কি ফল হবে! আজ অন্নপ্রসাদ অদৃষ্টে নাই তাই এমন হ'ল। তীর্থ-পর্যটনে কতদিন তো এমনি উপবাসেই কাটে; তাতে কোন কষ্ট নাই। ঘরে যদি সামান্য ফলমূল কিছু থাকে তাই যথেষ্ট হবে। তাই নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাব।

সাধু প্রসন্নমনে নাম জপ করতে থাকেন। জগন্নাথ ও শচীদেবীর মন সন্ন্যাসীর এই প্রস্তাবে সায় দেয় না। মিশ্র তাঁকে আবার রান্নার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। সাধু তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁকে খুশি করার জন্য আবার রন্ধনে রাজী হন। স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে, দ্বিতীয়বার রান্নার যোগাড় ক'রে দেওয়া হয়। চঞ্চল বালক যাতে পুনরায় বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সেজন্য শচীদেবী নিমাইকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে রাখেন।

সাধু নিশ্চিন্তমনে রান্নার কাজ সম্পন্ন ক'রে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করতে বসেছেন, আবার সেই কাণ্ড। চীৎকার ক'রে উঠলেন—আবার এসেছে, আবার এসেছে; চুরি ক'রে খেয়ে আবার সব নষ্ট ক'রে দিলে!

নিমাই সেই আগের মতোই মনোহর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে এক গ্রাস অন্ন নিজহাতে মুখে তুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। কখন যে সে মায়ের পাহারা থেকে লুকিয়ে এসেছে তা কেউ টের পায়নি। দুঃখে লজ্জায় মিশ্র মাথায় হাত দিয়ে নতমুখে বসে রইলেন। নিষ্ঠাবান অতিথি গৃহে অভুক্ত থাকবে, চিন্তায় সবাই আকুল হলেন কিন্তু সদাপ্রফুল্ল সাধুর কোন ভাবান্তর হ'ল না।

ঈশ্বরপ্রেমিক বিদেশী সন্ন্যাসী তাঁর আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে অনাহারে থাকবেন! সজ্জন গৃহস্থ জগন্নাথ মিশ্র তা কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ সাধুকে তিন-তিনবার রান্নার জন্য অনুরোধ করাও কম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নয়। সবাই যখন দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ এমন সময় মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ এলেন বাড়ীতে। তরুণ কিশোর; ঈশ্বরপরায়ণ, সংসারে উদাসী। সুশ্রী, সুঠাম দেহে অপূর্ব লাবণ্য।

—মানুষের এমন সুন্দর জ্যোতিঃপুঞ্জ অবয়ব! কে এই কিশোর? জিজ্ঞাসা করেন তৈর্থিক সন্ন্যাসী।

—মিশ্রের জ্যেষ্ঠ নন্দন।

সাধুর দেহে পুলক সঞ্চার হয়। বিশ্বরূপ যখন কাছে এসে সাধুকে প্রণাম ক'রে মধুর ভাষণে আপ্যায়িত করেন, তখন তাঁর অন্তরে বাৎসল্য রস উথলিয়ে উঠতে থাকে। মনে মনে ভাবেন ধন্য মিশ্র, ধন্য এ বালকের জননী, পবিত্র এদের বাসভবন।

নিমাইয়ের চাপল্যের কথা শুনে বিশ্বরূপ বড়ই বিব্রত বোধ করেন। ব্রাহ্মণকে বলেন, আপনি ঈশ্বরপ্রেমিক পুরুষ; আপনার দর্শনে পুণ্যলাভ হয়। আপনার পদধূলিতে আমাদের গৃহ পবিত্র হয়েছে। আপনি যদি অনাহারে থাকেন তবে গৃহস্থের হবে অকল্যাণ। আপনার কষ্ট হবে সত্যি, কিন্তু আমাদের সকলের মঙ্গল ও সন্তোষ বিধানের জন্য আপনি যদি আবার রন্ধনের কষ্ট স্বীকার করেন, তবে আমরা কৃতার্থ হব।

বালকের অনুরোধ ব্রাহ্মণ উপেক্ষা করতে পারলেন না; আবার রন্ধনের আয়োজন হ'ল; সাব্যস্ত হ'ল যে নিমাইকে এক ঘরে আটক ক'রে রেখে দরজায় কয়েকজন বসে পাহারা দেবেন।

ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে তৃতীয়বার রন্ধনে প্রবৃত্ত হলেন; এবার সবাই অত্যন্ত সতর্ক। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; চঞ্চল শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে শুনে বাড়ীর লোকজন আশ্বস্ত হয়েছেন যে, এবার আর কোন বিঘ্ন ঘটবে না। রন্ধনশেষে ব্রাহ্মণ ভোগের প্রসাদ ইষ্টদেবতায় নিবেদন ক'রে দিয়ে মন্ত্র জপ করছেন; হঠাৎ চেয়ে দেখেন তাঁর সম্মুখে সেই দুরন্ত বালক এসে দাঁড়িয়েছে।

—সর্বনাশ হ'ল! আবার চঞ্চল শিশু এসেছে, ধরো, ধরো!—ব্রাহ্মণ চীৎকার ক'রে ওঠেন। কিন্তু ধরবে কে? সবাই যে যেখানে বসেছিলেন সেখানেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর আর কারো কানে গেল না। তিনি চেয়ে দেখেন সে অদ্ভুত বালকের মুখে মধুর হাসি; বললো:

তুমিই তো আমায় ডেকে আন; আমার কি দোষ বল? আমার মন্ত্র জপ ক'রে আমায় আহ্বান করো, থাকতে না পেরে আমি তোমার সম্মুখে আসি। তুমি আমাকে নিরবধি দেখার বাসনা করো, তাই তোমাকে দর্শন দিলাম:

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ॥

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত

ব্রাহ্মণ পরম সুকৃতির ফলে দেবতা-বাঞ্ছিত অপরূপ রূপের দর্শন লাভ করেন; পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবরে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের দেহে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিয়ে বলেন:

প্রকৃতিস্থ হও; তুমি আমার জন্মজন্মের কিঙ্কর; তাই তোমার মনো-বাসনা পূর্ণ করলেম। কালে আরো কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবে:

সংকীর্তন আরম্ভে মোহর অবতার
করাইমু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি যোগ বাঞ্ছা করে
তাহা বিলাইমু সর্ব প্রতি ঘরে ঘরে॥

যোগনিদ্রার প্রভাবে গৃহস্থজন সবাই ঘুমে অচেতন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে ঠাকুর অদৃশ্য হলেন; কৃতকৃতার্থ ব্রাহ্মণ আনন্দে হুঙ্কার করতে লাগলেন। সে হুঙ্কার-শব্দে সবাই জেগে উঠে দেখেন—

সর্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার
জয় বাল-গোপাল বলয়ে বার বার॥

পরম কামনার সামগ্রী, আশার অতীত বস্তু অতি আকস্মিকভাবে পাওয়া গেলে মানুষের মনের উল্লাস উদ্দাম হয়ে ওঠে; হাসি অশ্রু হুঙ্কার নৃত্য সবই তখন হয় পরম আনন্দের বিচিত্র প্রকাশ; সাধকের কাছে তার আরাধনার বস্তু হাসিকান্নার ধন।

মেঘ থেকে জল পড়ে এই সত্যটি সহজ এবং স্বাভাবিক; কিন্তু চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশ মেঘের মধ্যে বজ্রের লুক্কায়িত শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিমাইয়ের শৈশব-জীবন দুরন্তপনা ও চাপল্যে ভরা; তার মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ

ঝিলিকের মতো ঐশ্বরিক লীলার আভাস প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষণিকের জন্য হ'লেও তার দীপ্তিতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। একদিনকার এরূপ একটি ঘটনা :

মুরারি গুপ্ত নামে একজন যুবক নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়ন করেন ; মুরারি ধীর, জ্ঞানী, নির্মলচরিত্র। শ্রীহট্টের অধিবাসী এবং জগন্নাথ মিশ্রের পাড়াতেই বাস করেন। মিশ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্বন্ধ। তখনকার দিনে নবদ্বীপে যে বিদ্যাচর্চা চলেছিল তাতে ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র এ সবেরই প্রাধান্য। শুষ্ক তর্কের ধূলিঝড় মনকে আচ্ছন্ন করতো, প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ রসবর্ষণ ছিল না। মুরারি ব্যাকরণ পড়তেন আর পড়তেন যোগবাশিষ্ঠ এবং সোঽহং তত্ত্ব প্রচার করতেন অর্থাৎ 'তিনিই আমি', 'ঈশ্বর আর আমি অভেদ' এই বিশ্বাস করতেন।

একদিন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে পথে চলেছেন ; হাত, মুখ, মাথা নেড়ে একান্ত তন্ময়ভাবে তাদের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা বলছিলেন। এমন সময় পিছনে হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখেন নিমাই তাঁর হাত মুখ মাথা নাড়ার অনুকরণ ক'রে অঙ্গভঙ্গীসহকারে পিছে পিছে আসছে ; তাই দেখে বালকের দলে পড়েছে হাসির রোল। মুরারি স্বভাবতঃ গম্ভীর ; নিমাইয়ের আচরণ দেখে মনে মনে ক্রুদ্ধ হ'লেও গাম্ভীর্য বজায় রেখে এবং বালকের চাপল্য উপেক্ষা ক'রে পূর্ববৎ তাঁর বক্তব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে পথে চলতে লাগলেন। নিমাই-ও আগের মতোই পিছে পিছে অঙ্গভঙ্গীসহকারে যেতে লাগল ; ছেলের দলের কলহাস্যও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ক্রুদ্ধ মুরারি এবার পিছন ফিরে নিমাইকে উদ্দেশ ক'রে বললেন— জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দেখছি অকালকুষ্মাণ্ড দুরাচার জন্মেছে ; বাপের আদরে দিন দিন বেড়ে চলেছে !

—আচ্ছা, এখন যাও ; ভোজনকালে তোমায় শিক্ষা দেব—ব'লে নিমাই ফিরে আসে।

মুরারি যখন মধ্যাহ্নকালে আহার করতে বসেছেন কে যেন গম্ভীরস্বরে ডাকে—মুরারি, মুরারি। কে ডাকে জিজ্ঞাসা করতে করতেই নিমাই এসে মুরারির সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং তাঁর থালা ভরে প্রস্রাব ক'রে দিল। ক্রোধ-ভরে নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে মুরারি ভয়ে অভিভূত হয়ে

পড়েন, দেখেন বালক যেন সাধারণ বালক নয়, তার চোখে জ্বলছে দীপ্ত রোষাগ্নি। মুরারির কণ্ঠে ভাষা জোটে না ; নিমাই বলে—

হাত নাড়া মাথা মাড়া ছাড়হে মুরারি
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥
জীবে আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে ॥

চকিতে নিমাই অদৃশ্য হয়ে যায়। এই এক মুহূর্তের ঘটনা থেকে মুরারির অন্তরে নূতন ভাবের উন্মেষ হ'তে থাকে ; ক্রোধের পরিবর্তে পুলকে অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অন্তরে ধ্বনিত হ'তে থাকে অপ্রত্যাশিত উপদেশ : 'জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি।' পাঁচ বছরের বালক নিমাই, তার চোখে আজ কি দ্যুতি দেখলাম ? আমার অহমিকা খর্ব ক'রে এই নূতন পথের সন্ধান দিয়ে গেল যে বালক সে আসলে কে ?

মুরারি বুঝেছেন এ বালক সাধারণ বালক নয় ; তিনি তখনি ছুটে চলেন জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এবং ভূমিতে লুটিয়ে শিশুকে প্রণাম করেন। নিমাই জননীর অঞ্চল দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে, যেন লজ্জা পেয়েছে ! সরল সজ্জন ব্যক্তি জগন্নাথ মিশ্র মুরারির এহেন আচরণ দেখে বিস্মিত হন, বলেন—তুমি কি কাজ করলে ! তোমার মতো ব্যক্তি প্রণাম করলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে যে !

—আপনার ঘরে কে জন্মগ্রহণ করেছেন আর কিছুদিন পরে জানতে পাবেন—বলেন মুরারি গুপ্ত। শিশু নিমাইয়ের একটি কথায় তাঁর মনের আঁধার অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে গেছে ; মনের দিক থেকে তিনি যেন এক নূতন জগতের প্রান্তসীমা দেখতে পেয়েছেন।

পরবর্তী কালে এই মুরারি গুপ্ত গৌরাঙ্গদেবের অশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ ঘটনা মুরারি গুপ্তের 'কড়চায়' লিখিত আছে ; এগুলি বিস্ময়কর।

* * * *

মাঝে মাঝে বালক নিমাইয়ের আচরণ তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে ; সবাই ভেবেছে—আর যাই হোক শিশুটি অসাধারণ।

নিমাই অত্যন্ত জেদী। একবার কাঁদতে স্থরু করলে সহজে থামে না ; চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় এত জল পড়ে যে, যে দেখে সেই অবাক হয়।

একদিন নিমাই বায়না ধরেছে—কি চায় তা কেউ বুঝতে পারে না, কেবল কান্না আর কান্না। হরিবোল, হরিবোল ধ্বনি শুনেও থামে না। অবশেষে মা বললেন—কি চাও বলো। তুমি যা চাও তাই এনে দেব।

—হিরণ্য ভাগবত আর জগদীশ পণ্ডিত আজ একাদশীর দিনে অনেক ভোগের আয়োজন করেছে ; তাই এনে দাও—শিশুর মুখে এ-কথা শুনে সবাই তো অবাক।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ঠিকই। কিন্তু দুইজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পূজার জন্য যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছেন, তা এক আবদারে শিশুর জন্য কী ক'রে চেয়ে আনা যায়! এই দুই নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের পাড়াতে বাস করেন। তাঁরা নিমাইয়ের আবদারের কথা শুনে কৌতূহলের বশে দেখতে এলেন ব্যাপারটি কি। শিশুর অনুপম লাবণ্য দেখে তাঁদের মনে হ'ল তার দেহে নিশ্চয় গোপালের অধিষ্ঠান, নতুবা মানবশিশু এমনভাবে মনকে আকর্ষণ করে কেন! তাঁরা হৃষ্টচিত্তে পূজার সমস্ত নৈবেদ্য নিমাইয়ের সম্মুখে এনে উপস্থিত করলেন। শিশুর কান্না থামল ; নৈবেদ্য কতক খেলেন, কতক ছিটিয়ে ফেললেন মাটিতে।

সবাই ভাবে অবাক কাণ্ড তো! এইটুকু শিশু কি ক'রে জানল আজ একাদশী তিথি, আর ঐ দুই ব্রাহ্মণের ঘরে আছে পূজার আয়োজন!

## বাল্য ও কৈশোর

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের পরিধিও ক্রমে বাড়ছে। বাড়ীতে চঞ্চলতা তো আছেই, শিশুর দলের দলপতি হয়ে তাদের সঙ্গে এ-বাড়ী, ও-বাড়ী গিয়েও উৎপাতের অন্ত নাই। অন্যের ঘরে প্রবেশ ক'রে খাবার জিনিস চুরি করে; ধরা পড়লে বলে—চুরি তো আমি বরাবরই করি। অদ্ভুত ছেলে! অদ্ভুত এই যে তার নয়নবিমোহন আকৃতি, তার অঙ্গে সোনার দ্যুতি, তার চোখে মন-ভুলানো মায়া, তার কথায় পুলক-জাগানো আকর্ষণ অনুভব ক'রে সবাই যেন মোহিত হয়; ক্ষতি করলেও তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

*       *       *       *

জগন্নাথ মিশ্র অতি সজ্জন নিরীহ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। ছেলের আচরণে বিব্রত হন তিনি; ভাবেন কালে সুবুদ্ধির উদয় হবে, পুত্র তখন হবে ধীর বিচক্ষণ; সেজন্য আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন। যথাসময়ে নিমাইয়ের হাতেখড়ি হ'ল; লেখাপড়ায় অসাধারণ। একবার ক'রে দেখে গেলেই অক্ষর-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়, কাজেই পড়াশুনা দ্রুত এগিয়ে চলে। শিখবার সময় চঞ্চল বালকের সারা দেহে লাগে কালির বিন্দু; মসীমাখা সে অঙ্গেরই বা কি শোভা—যেন ভ্রমর-বেষ্টিত কনকচাঁপা।

*       *       *       *       *

বালক নিমাইয়ের দুরন্তপনার প্রধান স্থল হ'ল গঙ্গার তীর। সঙ্গীদের সঙ্গে জলে ঝাঁপ, সাঁতার, জল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা সহজে থামে না। পূজা অর্চনা করতে লোকে গঙ্গার ঘাটে আসে পূজার উপকরণ, ফুল ফল নিয়ে; নিমাইয়ের অত্যাচারে তা নিরাপদ রাখা মুশ্‌কিল। সাজি থেকে ফুল তুলে নিয়ে সে নিজের মাথায় দেয় কিংবা জলে ভাসিয়ে দেয়; নৈবেদ্য খেয়ে ফেলে, কতক বা ছিটিয়ে ফেলে দেয়; জল ছিটিয়ে দিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের সন্ধ্যা আহ্নিক তর্পণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, কেউ হয়ত কোমর-জলে দাঁড়িয়ে জপ করছে, নিমাই দূর থেকে ডুব দিয়ে এসে তার পা জড়িয়ে ধরলো; স্নানের পর উঠে

পরবে ব'লে ঘাটের উপর শুক্‌না কাপড় রেখেছে, নিমাই চুপি চুপি স্ত্রীলোকদের কাপড়ের সঙ্গে পুরুষদের কাপড় বদলিয়ে রেখে দেয়, কাপড় পরার সময় টের পেয়ে তারা লজ্জায় বিব্রত হয়; ছোট ছেলেদের কানের মধ্যে জল দিয়ে দেয়, বালিকাদের গায়ে বালি ছিটিয়ে দেয়, তাদের কাছ থেকে পূজার নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খায়—এমনিতর উৎপাতে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

একদিন কয়েকজন বালিকা নিমাইয়ের জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে শচীদেবীর কাছে এসে বললো—নিমাইকে শাসন না করলে তো আমরা স্নান, পূজা কিছু করতে পারিনে; বড়ই জ্বালাতন করে। বাড়ীতে ব'লে দিলে অনর্থ বেধে যাবে। কি করি বলুন।

শচী তাদের আদর ক'রে বলেন—ঠিকই বলেছ বাছারা, নিমাই ভারী দুষ্টু হয়েছে; এবার ওকে খুব মতো ব'কে দেব তোমাদের যাতে আর বিরক্ত না করে।

মেয়েরা খুশি হয়ে ফিরে যায়।

কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি এসে নিমাইয়ের অত্যাচারের জন্য অনুযোগ করেন মিশ্রের কাছে। তাঁরা বলেন, এখন থেকে কঠোর শাসন না করলে ছেলে বড়ই দুরন্ত হয়ে উঠবে।

শান্তপ্রকৃতির মিশ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন; তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়; একখানা চাবুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গঙ্গার স্নানের ঘাটের দিকে।

এদিকে নিমাই যখন স্নানের ঘাটে উৎপাতে রত, তখনি তার কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে তার নামে নালিশ হয়েছে এবং তার পিতৃদেব তাকে শাস্তি দেবার জন্য ঘাটের দিকে আসছেন। জল থেকে উঠে নিমাই অন্য পথ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মিশ্র এসে দেখেন ঘাটে নিমাই নাই; তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে—নিমাই তো এখানে নাই।

মিশ্র ফেরেন বাড়ীতে; তার একটু পরেই নিমাই ফিরে আসে; হাতে পুঁথি, পরণে তার সেই শুক্‌না কাপড়; ধূলিমাখা অঙ্গে কালির ছিটাফোঁটা লেগে আছে, স্নানের কোন চিহ্ন নাই দেহে।

মিশ্র বিস্মিত হয়ে ভাবেন—কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি যে অনুযোগ ক'রে গেলেন নিমাই জল তোলপাড় করছে কিন্তু ওর স্নানের লক্ষণ তো কিছুই নাই!

শচীদেবী ভাবেন—মেয়েরা কি তবে মিথ্যা ব'লে গেল! কিন্তু নিজের

চোখকে অবিশ্বাস করেন কি ক'রে? মনের সন্দেহ দূর করার জন্যই যেন নিমাই গিয়ে পিতার কোলে বসলো; আনন্দে তাঁর মন হ'ল পূর্ণ।

নিমাই শচীদেবীকে বলে—মা আমার পুঁথিপত্র রাখো; আমার সঙ্গীরা স্নানে গেছে, আমিও গিয়ে স্নান ক'রে আসি—ব'লে সে চলে যায়।

বিস্মিত জনক-জননী নীরবে চেয়ে থাকেন সন্তানের প্রতি, তাঁদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে থাকে—ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?

* * * *

জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ কনিষ্ঠ পুত্র নিমাই অপেক্ষা দশ বছরের বড়। বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয়। তখন তাঁর বয়স বছর ষোল; তরুণ যৌবন। সুঠাম দেহশ্রী, টানা দীর্ঘ চোখ, চম্পকসদৃশ দেহের বর্ণ, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল। অন্তরের আলোকে দেহকান্তি সমুজ্জ্বল। ভিতরে যখন জ্ঞান ও ভক্তির শিখা শুভ্র আলোক জাগায় তার আভাস ফুটে ওঠে চোখের চাহনিতে।

বিশ্বরূপের পাঠে গম্ভীর নিষ্ঠা, ভক্তি অনন্যসাধারণ। দিবারাত্রি অধিকাংশ সময় জ্ঞান ও ভক্তির চর্চায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু তখনকার নবদ্বীপের সামাজিক পরিবেশ ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল নয়। শুষ্ক বিদ্যা ও বিদ্যার জাহির নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যস্ত; বিদ্যা অর্জন করে এবং তার চমক দেখিয়ে অন্যকে পরাস্ত করা তখন বিদ্বানের কাম্য হয়ে উঠেছে। বিনয়ী, ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তকে লোকে বিদ্রূপ করে; তার্কিক, অহঙ্কারী, বাক্‌কুশল পণ্ডিতের জয়-জয়কার, সর্বত্র তার সম্মান।

বিশ্বরূপ সংসারে অনাসক্ত; কৃষ্ণপ্রেমে মন তাঁর ভরপুর; তর্কের কচকচি ভাল লাগে না। ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তিনি মনে শান্তি পান না; তৃষ্ণার্ত মন তাঁর বালি চায় না, চায় সুশীতল বারি। ব্যাকরণের টোল ছেড়ে কমলাক্ষ মিশ্রের সঙ্গ লাভ ক'রে তিনি এই কাম্য জিনিসের সন্ধান পেলেন।

কমলাক্ষ মিশ্রের বাড়ী শান্তিপুরে; নবদ্বীপেও একটি বাড়ী ছিল। সেখানে অধিকাংশ সময় থাকতেন। একান্ত নিষ্ঠাবান ঈশ্বরভক্ত ব্রাহ্মণ; ভাগবত ও গীতাতে তাঁর অসাধারণ দখল, পাণ্ডিত্যের কণ্টকে তাঁর চিত্তক্ষেত্র আবৃত নয়, ভক্তি-রসের নির্ঝরিণী-ধারায় তা স্নিগ্ধ। মনের দিক থেকে কমলাক্ষ ও বিশ্ব-রূপের মিল হ'ল; কমলাক্ষ মিশ্র যদিও বিশ্বরূপের পিতার বয়সী, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ আলোচনায় বয়সের তারতম্য তাঁদের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাত না। বিশ্বরূপের তরুণ দেহে প্রবীণ মন; উভয়ে একই মনোবয়সী; ভক্তবন্ধু।

কমলাক্ষ মিশ্র অল্প কয়েকজন ভক্ত নিয়ে নিজের বাড়ীতে ইষ্টগোষ্ঠী করতেন। পরে তিনি অদ্বৈত আচার্য নামে পরিচিত হন। বিশ্বরূপ এই গোষ্ঠীতে এসে, ঈশ্বর-কথায় আনন্দ লাভ করতেন। এত বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে তাঁরা দীনহীন হয়ে থাকতেন, বৈষ্ণবকে লোকে হেয় মনে করতো; উগ্র পাণ্ডিত্যের ছিল সমাদর। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ নিজেদের প্রতি জনসাধারণের অবজ্ঞার কথা উল্লেখ করলে কমলাক্ষ মিশ্র বলতেন—আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, এই ভক্তিহীন সমাজে ভক্তির তরঙ্গ দেখতে পাবে; স্বয়ং কৃষ্ণকে এখানে অবতীর্ণ করাবো, তা না করতে পারলে বৃথা আমার আরাধনা। কমলাক্ষ ভক্তিভরে হুঙ্কার করতেন আর প্রতিদিন তাঁর আরাধ্য ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়ে আবাহন করতেন; এসো ঠাকুর, ভক্তির প্রভাব দেখাও ঠাকুর, মানুষের হৃদয়-মরু সুশীতল করো, প্রভু!

মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ সমবেত হয়েছিলেন, আর তাঁদের পুঞ্জীভূত তেজরশ্মি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন দুর্গতিহারিণী দুর্গা। এই ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠীর ভক্তগণ লজ্জানিবারণ, শঙ্কাহরণ, পতিতপাবন শ্রীহরির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, কমলাক্ষের আহ্বানে একদিন শ্রীভগবান তাঁদের নয়নগোচর হবেন। তাঁরা এই মহালগনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

* * * *

কমলাক্ষের বাড়ীতে অল্প কয়েকজন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ভক্তিরসের যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন, তার আনন্দে বিশ্বরূপ ডুবে থাকতেন; নিজের বাড়ীতে বড় একটা আসতেন না। খাবার সময় হ'লে নিমাই গিয়ে দাদাকে ডেকে আনত; বলতো—দাদা বাড়ীতে এসো, মা খেতে ডাকছেন। অতীত সুদর্শন, সর্ব সুলক্ষণযুক্ত এই শিশুটিকে দেখে ভক্তগণের মনের ভিতর তোলপাড় করতো; ভাবত—দেবশিশুর মতো এই বালকটি এমনভাবে প্রাণ আকর্ষণ করে কেন! নিমাইয়ের প্রতি বিশ্বরূপের স্নেহ ছিল নিবিড়।

বিশ্বরূপের যৌবনকাল সমাগত দেখে মিশ্র পুত্রের বিবাহের কথা আলোচনা করেন পত্নীর সঙ্গে। সন্তানকে গৃহী করা দরকার; শচীদেবী সংসারে একা, তাঁর গৃহস্থালীর কাজে সহায়তাও হবে, পুত্রকে সংসারমুখী করাও হবে। কিন্তু বিশ্বরূপের মন সংসারের মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। পিতামাতা যখন পুত্রবধূ আনার এবং পুত্রের নূতন সংসার-রচনার স্বপ্ন দেখেন,

তখন বিশ্বরূপ গোপনে নিশীথকালে গৃহত্যাগ ক'রে মহা-অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মিশ্র-পরিবারের আশাতরু থেকে একটি সুগন্ধি মনোহর কুসুম খসে পড়ে।

দুঃখে শোকে জনক-জননী আকুল হলেন। এমন গুণবান রূপবান ছেলে, যে আর দুদিন পরে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে পিতামাতার ভরণপোষণ, সেবাযত্নের ভার নেবে, যাকে অবলম্বন ক'রে পিতামাতা কল্পনার সুখসৌধ গড়ে তুলেছেন, সে যদি অকস্মাৎ সব আশা নির্মূল ক'রে দিয়ে চলে যায় তবে কোন্ পিতামাতা শোকাকুল না হয়ে পারেন? মিশ্র-পরিবারে হাহাকার উঠলো। নিমাই-ও মাটিতে লুটিয়ে ভাইয়ের জন্য কাঁদতে লাগল। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ ক'রে গেছে তাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে এনে সংসারে বাঁধার চেষ্টা জনক-জননীর অভিপ্রেত নয়। নিজেদের দুঃখ তাঁরা নিজেরাই বহন করবেন, সন্তানকে ধর্মপথ থেকে বিরত ক'রে স্বার্থপরতার পরিচয় দেবেন না। উদার নীলাকাশ ও মুক্ত অরণ্যের শ্যামল মায়া যে পাখীকে আকুল ক'রে তাকে খাঁচায় আবদ্ধ ক'রে রাখলে, সে কি মুক্তির আহ্বান ভোলে!

বিশ্বরূপ আর কখনো দেশে ফিরে আসেননি; তাঁর কোন সন্ধানও পাওয়া যায়নি। গৃহত্যাগের বছর দুই পরে পুনঃ নগরের কাছে পাণ্ডুপুর নগরে অলৌকিকভাবে তিনি অন্তর্ধান করেন।

* * * *

বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ ক'রে চলে গেলে জগন্নাথ মিশ্র নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ এবং সংসারের দিক থেকে অসহায় বোধ করতে থাকেন। তাঁর বয়স হয়েছে; সংসারের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নয়; তাঁর অবর্তমানে পরিবার প্রতিপালন করবে কে? নিমাই তো নিতান্ত বালক! বন্ধুজন সান্ত্বনা দেয়: দুঃখ ক'রো না ভাই; এক দিক দিয়ে তুমি ধন্য। যে পরিবারের এক ব্যক্তিও ঈশ্বরপ্রেমিক হয়ে সংসারত্যাগী হয়, সে পরিবার ও তার পূর্বপুরুষ পবিত্র হয়ে যায়। বিশ্বরূপ তোমার কুলের ভূষণ হয়ে রইলো।

সন্তানহারা পিতৃহৃদয় কি সহজে প্রবোধ মানে! নিমাই এখন কিছু কিছু বোঝে। মিশ্রের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বাবা, আমি তো আছি। আমি সারাক্ষণ তোমাদের কাছে কাছে থাকবো, সেবা করবো।

বংশের একমাত্র দুলাল শিবরাত্রির সল্‌তের মতো নিমাইকে অবলম্বন ক'রে জনক-জননীর আশা আবার দানা বাঁধতে থাকে। অশ্রুজলে-ভেজা দিনগুলি

পার হয়ে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে শোকার্ত হৃদয় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। নিমাইয়ের আচরণে দেখা যায় বিরাট পরিবর্তন। সে চাঞ্চল্য আর নাই; সঙ্গীদল নিয়ে গঙ্গার তীরে উৎপাত আর নাই। নিমাই এখন সুবোধ, শান্ত। অধিকাংশ সময় পিতামাতার কাছে কাছে থাকে, পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ।

কিছুদিন এইভাবে কাটে। নিমাইয়ের ভাবান্তর মিশ্রকে আবার ভাবিয়ে তোলে। তিনি ভাবেন—বিশ্বরূপও এমনি পড়ায় মনোযোগী ছিল; শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সংসারের ওপর সে বীতরাগ হয়ে ওঠে। নিমাই-ও কি তেমনি হবে? ছেলে আমার জ্ঞানী হয়ে সব ফেলে পালাবে; তার চেয়ে মূর্খ হয়ে বাড়ীতে থাক্, এই ভালো। অনেক চিন্তা ক'রে একদিন মিশ্র তাঁর অভিপ্রায় বললেন পত্নীর কাছে।

পণ্ডিতের কন্যা, পণ্ডিতের গৃহিণী, পণ্ডিত পুত্রের জননী শচী স্বামীর প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হন, বলেন: তুমি বলো কি! লেখাপড়া না শিখলে মূর্খ ছেলেকে মানবে কে? মেয়ে দেবে কে? সে সংসার প্রতিপালন করবে কেমন ক'রে?

—শ্রীকৃষ্ণ সবার পালনকর্তা। এমন বহুলোক আছে যাদের বিদ্যা নাই কিন্তু সম্পদ আছে, বিদ্বান্ অর্থের জন্য তাদের দ্বারস্থ। পত্নী-গ্রহণ, তা-ও কি মানুষের হাতে? শ্রীকৃষ্ণই সব-কিছুর নিয়ামক। তোমাকে অকূলে ভাসিয়ে যদি না পালায় তবে বিদ্যা যাই থাকুক বা না থাকুক নিমাই তোমাকে পালন করবে। ওকে শাস্ত্রজ্ঞ করতে আমার আর সাহস হয় না।

পুত্রকে ডেকে বলেন—আমার আদেশ, আজ থেকে তোমার পড়াশুনা বন্ধ। বিদ্যালাভে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।

*　　　*　　　*　　　*

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য। নিমাই আর বই নিয়ে পড়তে বসে না। কিন্তু সময় কাটাতে হবে তো! অত্যন্ত দুরন্ত হয়েওঠে সে। সারা দিনমান তার অত্যাচারে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অন্য বালকের সঙ্গে একত্রে কম্বল-মুড়ি দিয়ে ষাঁড় সেজে অপরের কলাবাগানে প্রবেশ করে; গাছপালা ভাঙে, শাক-সবজি নষ্ট করে। রাত্রিকালে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে বন্ধ-ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে রেখে দিয়ে আসে; ঘর থেকে বেরুতে না পেরে তারা চীৎকার করে। এমনিতর নিত্যনূতন উপদ্রব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

মিশ্র এ-সব কথা শুনেও তেমন শাসন করেন না। অত্যধিক স্নেহ পিতৃ-হৃদয়কে কোমল ও সর্বংসহ ক'রে রাখে।

একদিনের ঘটনা। বাড়ীর পাশে আবর্জনাময় স্থানে যেখানে রান্নার পর মাটির হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেওয়া হয়, সেখানে পরিত্যক্ত কালিমাখা হাঁড়িগুলি একত্র করে সাজিয়ে নিমাই তার ওপর বসে রয়েছে। সোনার অঙ্গে হাঁড়ির তলাকার কালির দাগ লেগেছে। অন্য ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে শচীদেবী এসে নিমাইকে সস্নেহ মৃদু তিরস্কার করেন। বলেন—ছিঃ! ওখানে কি বসতে আছে? ওগুলো এঁটো, অপবিত্র জিনিস। ওখান থেকে শীগ্‌গির এসো, স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে তবে ঘরে আসবে।

নিমাই দুষ্টের মতো হাসে। বলে:

এগুলো অপবিত্র হবে কেন? এতে ক'রে তুমি দেবতার জন্য ভোগ রান্না করেছ, এ কি নোংরা, অপবিত্র হ'তে পারে? আমি কি অপবিত্র স্থানে যাই? আমি যেখানে থাকি সে স্থানই তো পুণ্যস্থান!

—ছি, ছি! এগুলো স্পর্শ করলে যে স্নান ক'রে শুচি হ'তে হবে তা-ও জান না?—মা বলেন অনুযোগের স্বরে।

—কি ক'রে জানব? তোমরা তো আমাকে পড়তে দেবে না! মূর্খ আমি; আমার ভাল-মন্দ বিচারবোধ কেমন ক'রে হবে? আমার কাছে সবই সমান।

শচীদেবীর পাশে প্রতিবেশিনীরা যাঁরা জুটেছিলেন, তাঁরা বুঝলেন পড়াশুনা করতে না পেয়ে বালক ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বেশীর ভাগ ছেলেই বাল্যকালে পড়াশুনা বিশেষ পছন্দ করে না; তাদের গুরুজন কত যত্ন ক'রে তাদের বিদ্যাভ্যাস করান। আর এ বালক নিজের আগ্রহে পড়তে চায় কিন্তু বাপ-মা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রে পুত্রকে মূর্খ ক'রে রাখতে চায়! এ কিরূপ বুদ্ধি! কোন্ শত্রুর পরামর্শ নিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে? প্রতিবেশিনীরা আশ্বাস দেন তাঁরা নিমাইয়ের পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। শচীদেবীও রাজী হন; কিন্তু নিমাই সেখান থেকে নড়ে না। অগত্যা শচীদেবী নিজে গিয়ে পুত্রকে হাত ধরে নিয়ে আসেন; স্নান করিয়ে অঙ্গ মার্জনা ক'রে বাড়ীতে নিয়ে যান।

নিমাই এমনিভাবে কৌশলে আবার বিদ্যাশিক্ষার পথটি সুগম ক'রে নেয়। পূর্বের মতোই সে আবার লেখাপড়া করতে থাকে

## কৈশোর ও যৌবন

নবম বর্ষে নিমাইয়ের উপনয়নের ব্যবস্থা করা হ'ল। জগন্নাথ মিশ্র তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতজনকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমাই মস্তক মুণ্ডন ক'রে রক্তবস্ত্র পরিধান করলো। তখন তার দেহে এমন শ্রীময় লাবণ্য প্রকাশ পেতে লাগল যে, দেখে দেখে যেন চোখের পিপাসা মেটে না। নিপুণ শিল্পীর গড়া সোনার মূর্তিতে যেন জবাকুসুমের স্তবক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে! নিমাই-য়ের উপবীত গ্রহণের দিন দুটি ঘটনা ঘটে—যার মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কিছুটা আভাস মেলে:

মিশ্র পুত্রের কানে যেমনি গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েছেন অমনি নিমাই হুঙ্কার গর্জন ক'রে উঠলো; সর্বদেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল এবং সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল; দেখা গেল দেহ নিস্পন্দ ও পুলকে রোমাঞ্চিত; সর্ব অবয়বে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ চোখে মুখে জলের ছিটা ও বাতাস দেওয়ার পর নিমাই সুস্থ হয়ে উঠে বসলো; তার মুখে তখন এমন গাম্ভীর্য যে কেউ তাকে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে সাহসী হ'ল না। মিশ্র তাকে হাত ধরে নিভৃত স্থানে নিয়ে একটা আসনে উপবেশন করালেন। নিমাইয়ের এই দিব্যভাব লক্ষ্য ক'রে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন; সকলেরই ধারণা হ'ল বালকের দেহে নিশ্চয়ই কোন দেবতার আবেশ হয়ে থাকবে। তখন থেকে অনেকে নিমাইকে 'গৌরহরি' ব'লে ডাকতে লাগল।

নিভৃত স্থান থেকে যথাসময়ে বাইরে এসে বসলে নিমাইকে বিভিন্ন জনে নানারূপ ভিক্ষাদ্রব্য দিতে লাগল। নিমাই যেন নব বামন। একজন ব্রাহ্মণ নিমাইকে একটি সুপারি দিলেন এবং সে তখনি তা খেয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব ভাবান্তর দেখা দিল। নিমাইয়ের তনুদেহ থেকে শুভ্র চোখ-ঝলসানো তেজ নির্গত হ'তে লাগল। অতি গম্ভীরস্বরে সে জননীকে ডাকল। শচীদেবী এসে দেখেন বালক যেন জ্যোতির্ময় এক প্রবীণ বিজ্ঞ পুরুষের মতো আসীন রয়েছে, তার সম্মুখে এসে আপনা থেকেই যেন সম্ভ্রমে শির নত হয়ে আসে।

—মা, এখন থেকে তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ ক'রো না—বিজ্ঞ ঋষির মতো নিমাই বলে তার মাকে।

—এখন থেকে তোমার আজ্ঞা পালন করবো, জননী বলেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। নিজের বালক ছেলের সঙ্গে যে কথা বলছেন তা শচীদেবী মনে ভাবেননি; তিনি যেন কোন পরম জ্ঞানীর আদেশ শিরোধার্য ক'রে নিলেন।

এর পরেই নিমাই মাকে বললো—

মা, আমি এখন এই দেহ ত্যাগ ক'রে চললেম; আবার আসব। এই দেহ থাকল, এ তোমার ছেলে। একে যত্ন ক'রে পালন ক'রো। এই কথা ব'লে জননীকে প্রণাম করতে যেতেই নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সেবা-পরিচর্যার পর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন দেখা গেল সে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করেছে। তার দেহের সেই অমানুষিক তেজ, মুখের সেই প্রশান্ত গাম্ভীর্য, কণ্ঠস্বরে সেই আদেশব্যঞ্জক দৃঢ়তা নাই। নিমাই এখন বালক নিমাই, একান্ত স্বাভাবিক। চেহারা ও হাবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সকলেই বোঝে যে, একটা অসাধারণ কিছু ঘটেছিল; নিমাইয়ের ভিতর যে শক্তির বিকাশ দেখা গিয়েছিল, তা বিদ্যুৎ-চমকের মতো ক্ষণিকের জন্য হ'লেও তা যে অলৌকিক তাতে কোন সংশয় নাই। সর্বাঙ্গসুন্দর বালকের পবিত্র দেহে দেবতার আবেশ হয়েছিল এবং পরেও এরূপ আবেশ হবার সম্ভাবনা আছে—দর্শকগণ এই কথাই অনুমান করেছিল।

নিমাই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে জগন্নাথ মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তোমার মাকে বলেছিলে 'এখন আমি চললেম, আবার আসব?'

বিস্মিত নিমাই শুধায়—কই? কখন? আমি কিছু বলিনি তো!

* * * *

উপনয়নের পর নিমাই পূর্বের মতো পড়াশুনা ও সমবয়সী দলবল নিয়ে গঙ্গাতীরে দুরন্তপনা করতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য জগন্নাথ নিমাইকে তখনকার দিনে খ্যাতনামা পণ্ডিত গঙ্গাদাসের হস্তে সমর্পণ করেন। অধ্যাপনা করতে গিয়ে গঙ্গাদাস নিমাইয়ের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হন। যোগ্য গুরু যোগ্য শিষ্যকে অদ্বিতীয় পণ্ডিতে পরিণত করবেন, নিমাইয়ের খ্যাতিতে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ সারা ভারতবর্ষে সম্মানিত হবেন এই হ'ল তাঁর কামনা।

নিমাই যা একবার পাঠ করে বা শোনে, তাই তার আয়ত্ত হয়ে যায়; শুধু তাই নয়, নূতন নূতন ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে অবাক ক'রে দেয়। শাস্ত্র-

ব্যাখ্যায় ও তর্কে তার সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। কিশোর নিমাই তর্কযোদ্ধা, নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, অবিনয়ী। অন্যকে হারিয়ে দিয়ে অপদস্থ ক'রে সে কৌতুকবোধ করে।

*   *   *   *

পুত্রের কৃতিত্বে কোন্ পিতা আনন্দিত না হয়? নিমাই যখন এত অল্প বয়সে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ব'লে সমগ্র নবদ্বীপে সুখ্যাতি অর্জন করলো, তখন জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃহৃদয় গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তরের এক কোণে সর্বক্ষণ একটি ভয় লুকিয়ে ছিল: নিমাই হয়তো সংসারে থাকবে না; কোন্ দিন সে-ও বুঝি বিশ্বরূপের মতো ফাঁকি দিয়ে পালায়! একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন—নিমাই মুণ্ডিতমস্তক, সন্ন্যাসী বেশ ধারণ ক'রে গৃহে গৃহে হরিনাম বিতরণ ক'রে ফিরছে। সমগ্র নগরবাসী তার সঙ্গে নাম-গানে মেতে উঠেছে।

মিশ্র ভাবেন: একি স্বপ্ন? না, বাস্তবের পূর্বাভাষ? গৃহদেবতার কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করেন: হে রঘুনাথ, নিমাইকে গৃহী ক'রো; ওকে সংসার থেকে বের ক'রে নিয়ে আমাদের অবলম্বনহীন ক'রো না, ঠাকুর; সন্তান হারানোর ব্যথা আর দিয়ো না, প্রভু! সোনার কান্তি নিমাই আমাদের, ডাইনীর দৃষ্টি থেকে ওকে রক্ষা ক'রো প্রভু!

আড়াল থেকে পিতার প্রার্থনা শুনতে পেয়ে নিমাই মৃদু মৃদু হাসে। স্নেহ মানুষকে দুর্বল করে। জগন্নাথ তাঁর স্বপ্নের কথা এবং মনের গোপন আশঙ্কার কথা বলেন পত্নীকে। শচীদেবী স্বামীর মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করেন, বলেন—স্বপ্ন স্বপ্নই; তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। নিমাই বিদ্যারসে মজে আছে, বিদ্যা নিয়েই ও সংসারে থাকবে।

*   *   *   *

দিন চলে যায়। মিশ্রের কাল পূর্ণ হয়ে আসে। অন্তিম সময় উপস্থিত হ'লে বন্ধুজন মিশ্রকে গঙ্গায় নিয়ে যায়। সেখানে আধ-নাভি গঙ্গাজলে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে মিশ্র দেহত্যাগ করেন। নিমাই তখন বারো বছর বয়সের কিশোর, বিধবা জননীর একমাত্র অবলম্বন।

*   *   *   *

পিতৃহীন হয়ে নিমাই নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করে না। বিদ্যা অর্জনে দেখা যায় তার অসাধারণ অভিনিবেশ। রাজহংস যেমন তরঙ্গ-দোলায়

ফুলে ফুলে অবলীলাক্রমে নদী পাড়ি দেয়, নিমাই-ও তেমনি সর্বশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বগুলি অনায়াসে অধিগত ক'রে সকলকে বিস্মিত চমৎকৃত করে। বাল্যের চাপল্য নিমাই ছেড়েছে ; প্রতিবেশীদের ওপর নব নব উপদ্রব ক'রে তাদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে না ; এখন সুরু হয়েছে বিদ্যার চাপল্য। কিশোর হরিণের যখন নূতন শিং গজাতে থাকে, সে গাছের সঙ্গে মাথা ঘষে মাথার সুরুসুরি মেটায়। নবদ্বীপের কিশোর পড়ুয়ামহলে নবলব্ধ বিদ্যার কণ্ডুয়ন ছিল ক্রীড়া-কৌতুকের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন পণ্ডিতের ছাত্রদের বিভিন্ন দল অন্যদলের সঙ্গে বিদ্যার পাল্লা দিত হাটে-বাজারে, নদীর পাড়ে, স্নানের ঘাটে, যেখানে তাদের দেখা হ'ত সেখানেই। ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শন শাস্ত্রের অস্ত্র নিয়ে নবীন ছাত্রদল যেন 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে চলাফেরা করতো ; তর্কের বাক্যজাল বিস্তার ক'রে অন্যপক্ষকে অভিভূত করা, সূক্ষ্ম যুক্তিবাণে বিপক্ষের অভিমত খণ্ডন করা —এই ছিল প্রধান আনন্দের বিষয়। বিদ্যা-রণক্ষেত্রে নিমাই ছিল অদ্বিতীয়, অপরাজেয়। তার অনুগত দল থাকত তার সঙ্গে সঙ্গে ; অপরপক্ষ যখন শাস্ত্র-যুদ্ধে লাঞ্ছিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করতো তখন এদের উল্লাস দেখে কে ! নিমাই তাদের শিরোমণি। নিমাইয়ের প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দেয়, নিমাইয়ের মত খণ্ডন করে এমন কারো শক্তি ছিল না। অন্যে যখন অপারগ হ'ত, সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করতো ; যারা শুনতো তারা অবাক হ'ত —এমন পাণ্ডিত্য, এমন গভীর জ্ঞান, এমন সর্বশাস্ত্রে দখল মানুষে সম্ভবে কি !

যে কয়জন নিরীহ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তিভরে দেবতার পূজা-অর্চনা করতেন তাঁরা ভাবেন : এই শুষ্ক তর্কের ধূলিঝড় একান্তই নিরর্থক ; এর মধ্যে ঈশ্বরলাভের আকুলতা কই ? ভক্তিধারা বর্ষণে চিত্তক্ষেত্র কোমল না হ'লে অহঙ্কারের কণ্টকে যে ছেয়ে যাবে ! মানুষ দুর্লভ নর-শরীর লাভ ক'রে, জ্ঞান বুদ্ধি প্রীতি নিষ্ঠা প্রভৃতির অধিকারী হয়েও মিথ্যা মরীচিকার মোহে মত্ত হয়ে থেকে মানব-জনম ব্যর্থ করে ! কবে এদের সুমতি হবে ? তর্কে অন্যকে পরাভূত করার পরিবর্তে কবে এরা নিজেদের বিলিয়ে দেবে সর্বশক্তির যিনি আধার সেই পরমপুরুষের কাছে ?

* * * *

বাড়ীতে মায়ের ওপর নিমাইয়ের আবদারের অন্ত নাই। সুগন্ধি মালা-চন্দন চাই, গঙ্গা-পূজার উপচার চাই ; দেরী হ'লে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে। মা সব সহ্য করেন ; ছেলে যা

বায়না করে তাই সংগ্রহ ক'রে দেন। শান্ত হ'লে নিমাই লজ্জিত হয় মনে মনে। মা বলেন—নিজের জিনিস ভেঙে নষ্ট করো, ক্ষতি তো তোমারই হ'ল। এ-সব পূরণ করবে কে?

নিমাই বাইরে থেকে ঘুরে এসে দু'তোলা সোনা মায়ের হাতে দেয়, বলে—এই ত্থাখ, কৃষ্ণ সম্বল দিয়েছেন; এ দিয়ে খরচপত্র চালাও।

সরলা জননী ভেবে ঠিক পান না, যখনি অভাব হয় পুত্র কোথা থেকে সোনা এনে তাঁর হাতে দেয়! ছেলে কি কোন মন্ত্রসিদ্ধি জানে? না, কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসে! খরচ করার আগে তিনি ইতস্ততঃ করেন; আপনজনদের দেখিয়ে, তাদের মতামত নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হন। এমনি লীলা-চপলতার ভিতর দিয়ে নিমাই কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উপনীত হয়।

* * * *

নবদ্বীপ নগরে নিমাইয়ের তুলনা মেলে না। বিদ্যায় দেবগুরু বৃহস্পতি-সদৃশ; রূপে ও দেহ-সৌষ্ঠবে কন্দর্পকে হার মানায়। নবযৌবনের উচ্ছল দীপ্তি সর্বাঙ্গে ঝলমল করে। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ, ক্ষীণ কটি, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত সুবলিত বাহু, অরুণ অধর, দীর্ঘ-আয়ত চোখ; ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলদাম গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে কাঁধ স্পর্শ করে, শুভ্র উপবীত সোনার অঙ্গে রূপার কেয়ার মতো বিলম্বিত; পরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন; এর উপর নিমাই যখন নানারঙের ফুলে-গাঁথা দীর্ঘ মালা গলায় তুলিয়ে পথে চলেন, গঙ্গাতীরে বিদ্যার্থীদের সঙ্গে বিদ্যা-চর্চায় রত হন, লোকে তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এমন বিশ্ববিজয়ী রূপ কেউ দেখেনি। স্নান করতে গেলে গঙ্গার ঘাট আলোময় হয়; যে-সব বালিকা আগে নিমাইয়ের উপদ্রবে অস্থির হয়ে শচীদেবীর কাছে নালিশ করেছে, এখন তাদের হৃদয়-মন জুড়ে বিরাজ করে নিমাইয়ের ভুবনমোহন রূপ; সর্বকুমারীর কাম্য তিনি।

* * * *

একদিন স্নানের জন্য অনেক কয়জন বালিকা গঙ্গার ঘাটে সমবেত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কিশোরী, রূপে যেন আলো ক'রে আছে। বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী; স্নিগ্ধ শান্ত সৌম্যমূর্তি, বিকাশোন্মুখ কমলকলিকার মতো লাবণ্য। এমন সময় নিমাই সুরধুনীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন, সকলের দৃষ্টি পড়লো তাঁর ওপর। নিমাই মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখেন না কিন্তু সেদিন কি হ'ল প্রসন্ন নয়ন মেলে চাইতেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল লক্ষ্মীর

পদ্ম-বয়ানের ওপর। চারি চক্ষের মিলন হ'ল, মুহূর্তের মধ্যে চোখের নীরব ভাষায় তাঁদের মনের মালাবদল হয়ে গেল—একজন যেন বললো—আমি তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করলেম। অন্যজন যেন সাদরে স্বীকার ক'রে নিয়ে বললেন—আমি তোমায় গ্রহণ করলেম।

* * * *

গৌর-রূপে হৃদয়কুম্ভ পরিপূর্ণ ক'রে লক্ষ্মী ফিরে যায় পিতৃগৃহে ; নিমাই হৃষ্টচিত্তে প্রবৃত্ত হন নিজ কাজে। দৈবক্রমে সেইদিনই বনমালী আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ শচীদেবীর কাছে গিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেন। জননী বিশেষ উৎসাহ দেখান না, বলেন ঃ পিতৃহীন ছেলে আমার। বেঁচে থাকুক, লেখাপড়া শিখুক, তারপর এ-বিষয়ে চিন্তা করবো।

নিরাশ হয়ে বনমালী ফিরে যান। পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। ব্রাহ্মণকে বিমর্ষ দেখে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

—তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিলেম বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধের কথা বলতে, কিন্তু তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করেন না।

—ওঃ! এইজন্য ? সলজ্জ হাসি হেসে নিমাই পাশ কাটিয়ে যান। বাড়ী গিয়ে মাকে বলেন—বনমালী আচার্য মশাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন, তাঁর কথা শুনলে না কেন ? ছেলের চোখের দিকে চেয়ে মা তার মন দেখে নেন, বোঝেন তার অভিপ্রায়। পরদিন খবর দিয়ে ডেকে পাঠান বনমালী আচার্যকে। শচীদেবীর সম্মতি ও অভিলাষ নিয়ে ঘটক ছুটে যান বল্লভ আচার্যের গৃহে। তাঁরা যেন হাতের কাছে স্বর্গ পেয়ে গেছেন! লক্ষ্মীর অনুরাগ-তপস্যা সফল হয়। শুভদিনে চন্দন-চর্চিত-ভালে, রক্তপট্টাম্বরে সজ্জিতা হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিমাইয়ের গৃহে আসেন নববধূবেশে। কিশোরীর কাছে দিনরাত্রি মধুর স্বপ্নময় ; শচীদেবীর কাছে সর্বপ্রথম পুত্রবধূবরণ! আনন্দময় আবেশে দিন কাটে।

গৃহের শ্রী শতগুণে বেড়ে গেছে। স্বয়ং রমা যেন গৃহে বিরাজিতা। দৈন্য নাই, অসাচ্ছল্য নাই ; কোথা থেকে কি ভাবে আসছে কেউ জানে না কিন্তু ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। ঘরদোর যেন আলোকে ঝলমল করে ; গৃহের বাতাসে পদ্মের সুরভি। শচীদেবী ভাবেন—লক্ষ্মীর অংশে জন্ম আমার বৌমার, তাই সংসার আমার সবসময়ই সম্পদে ভরপুর!

* * * *

অধ্যয়ন শেষ ক'রে নিমাই এখন গৃহী অধ্যাপক। অধ্যাপক শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র। বয়সে নবীন, পাণ্ডিত্যে প্রবীণ-ও পরাভূত। গুণমুগ্ধ শিষ্যবৃন্দ অধ্যাপকের বচন-সুধা পান করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। অধ্যাপকের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে মনেপ্রাণে। সন্ধ্যায় ভাগীরথী-তীরে শিষ্যবৃন্দ বেষ্টিত হয়ে শ্রীবিশ্বম্ভর শাস্ত্র ব্যাখ্যা আলোচনা করেন, যেন আকাশে চন্দ্র-সভা। যেমন জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা, তেমনি বাক্-কুশলতা! যেন হিমাদ্রিদেহ-উৎসারিত গঙ্গাধারা; কুলুকুলু নাদে শ্রবণ জুড়ায়, দেহমন পবিত্র করে।

বিদ্যার প্রভায় নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তরুণ অধ্যাপককে সবাই সমীহ ক'রে চলে। জ্ঞানী গুণী সমাজে তিনি মুকুটমণি কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো তিনি সমাজের অন্যান্য বর্ণের লোকেদের প্রতি তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত করুণা দেখিয়ে দূরে অবস্থান করেন না। বরং তাঁর লীলাচাপল্য এদের নিয়েই বেশী।

* * * *

শিষ্য-পরিবৃত হয়ে তন্তুবায়ের গৃহে গিয়ে উপস্থিত। বলেন—দাও তো তোমার সবচেয়ে সেরা ধুতিখানা। দাম দিতে পারব না কিন্তু। তন্তুবায় দেখে, ঘর-আলো-করা, জীবন-ধন্য-করা জ্যোতির্ময় মূর্তি। দান করতে পারলেই সে ধন্য। সর্বোৎকৃষ্ট মিহি ধুতিখানা ভক্তিভরে তুলে দেয়। নিমাইয়ের প্রসন্নদৃষ্টি তার মনে অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ তোলে।

গোয়ালার বাড়ীতে গিয়ে বলেন, মামার বাড়ী এলেম। কই গো মামারা, দই ক্ষীর, ছানা মাখন নিয়ে এসো। উল্লাস প'ড়ে যায় গোয়ালাপাড়ায়; যার ঘরে সুখাদ্য যা আছে এনে হাজির করে। এমনি ক'রে গন্ধবণিকের ঘর থেকে সুগন্ধি, মালাকারের ঘর থেকে মালা, তাম্বুলীর ঘর থেকে কর্পূরবাসিত তাম্বুল গ্রহণ করে সকলের ঘরে এবং অন্তরে সুধা পরিবেশন ক'রে নিমাই ফেরেন গৃহে। শাস্ত্র-চর্চার আওতা থেকে, তর্কের আখড়া থেকে দূরে যারা সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জীবন-প্রবাহে ভেসে চলে নিমাইচন্দ্র তো তাদের জন্যই। তর্কের, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ধূলিমেঘ দিয়ে তিনি তাদের চিত্ত আচ্ছন্ন করেন না; প্রেমের স্পর্শ দিয়ে তা করেন আনন্দমেদুর। তাদের কাছে নিমাই অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র নন, নিমাই প্রেমের ঠাকুর, আপন জন।

* * * *

**দিগ্বিজয়ীর শিক্ষা ঃ**

মানুষের ঐশ্বর্য থাকলে তার সঙ্গে থাকে দম্ভ আর অহমিকা, যেমন এঞ্জিনের মধ্যে স্টীম বেশী হ'লে ছুটবার জন্য তার সুরু হয় টগবগানি, ফোঁস্-ফোঁসানি। কেউ বিনয় ও আত্মজ্ঞানের নম্রতা দিয়ে দম্ভের অশোভন প্রকাশ ঢেকে রাখে, কেউ বা তা নিয়ে ঢাক পিটিয়ে আকাশ ফাটায়। আগেকার দিনের রাজারা ক্ষমতা জাহির করার জন্য, অন্য রাজাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। ঘোড়ার কপালে নিজের নাম-ধাম লিখে মুক্ত ক'রে দিলেন, সঙ্গে চললো সৈন্যবাহিনী উদ্ধত দম্ভ বহন ক'রে। ভাবখানা এই ঃ আমি শ্রেষ্ঠ। মাথা নীচু করো, আমার বশ্যতা স্বীকার করো, তোমার সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব নাই ; যদি তা না করো তবে তোমাকে চূর্ণ করবো। এ হ'ল ক্ষাত্রশক্তির রাজসিক দম্ভ।

বিদ্যার সম্মান রাজার সম্মানের চেয়েও বেশী। এককালে তাই বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে রাজচক্রবর্তী হবার বাসনায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা বিদ্যার জয়ধ্বজা উড়িয়ে নগরে নগরে হানা দিতেন। এঁদের দম্ভও ক্ষত্রিয়ের দম্ভের মতোই ঃ যার সাধ্য আছে এসো, আমাকে বিদ্যায় পরাস্ত করো ; আর যদি সাহস না পাও জয়পত্র লিখে দাও ; আমি দিগ্বিজয়ী।

এমনি এক দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ এসেছেন নবদ্বীপে। অসাধারণ প্রতিভা। মূর্তিমান উদ্ধত অহঙ্কার। হালচাল রাজার মতোই। সঙ্গে হাতীঘোড়া, লোকজন। দোলায় চ'ড়ে যাতায়াত করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের পণ্ডিত-সমাজ পরাভূত ক'রে এসেছেন নবদ্বীপ-জয়ে। নবদ্বীপ জয় না করলে তাঁর দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয় না। নবদ্বীপ তখনকার দিনে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানগর।

নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ চিন্তিত হয়ে উঠেছে। এ দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ নাকি সরস্বতী-মন্ত্রের উপাসক ; বাগ্দেবীর বরে তিনি অপরাজেয় ; জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যার কণ্ঠে সর্বদা বিরাজিতা বিদ্যার মল্লযুদ্ধে সে অন্যকে ভয় পাবে কেন! নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ শঙ্কিত—এবার বুঝি মান যায়। দিগ্বিজয়ী নগরপ্রান্তে শিবির স্থাপন করেছেন। কিশোর তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কৌতুকের মৃদু গুঞ্জরণ সুরু হয়েছে—এবার একটা লড়াই জমবে!

নিমাই শিষ্যদের কাছে দিগ্বিজয়ীর বিবরণ শুনেছেন। শুনেছেন তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। নিমাই বলেন—যিনি সর্বশক্তিমান তাঁরও তো অহঙ্কার

নাই। দর্পহারী তিনি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, এখানেই দিগ্বিজয়ীর জয়দর্প চূর্ণ হবে।

একদিন। জ্যোৎস্না রাত্রি। গঙ্গাতীরে নিমাই ব'সে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। মৃদু বাতাসে গঙ্গায় তরঙ্গ উঠেছে, স্রোত বয়ে চলেছে কুলুকুলু স্বরে। চাঁদের কিরণ মুঠো মুঠো রূপোর ফুলের মতো ঝলমল করছে নদী-বক্ষে। তরুণ অধ্যাপক নিমাই। দীর্ঘ-আয়ত অপূর্বসুন্দর চোখ, কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশি কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত, সুগঠিত অঙ্গে কাঁচা সোনার আভা। ছাত্রগণ তাঁকে ঘিরে বসেছে, যেন আকাশে চন্দ্র-সভা। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সময় দিগ্বিজয়ী একজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। কিছুটা দূর থেকে গৌরাঙ্গের সুন্দর অঙ্গকান্তি দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে দাঁড়ালেন। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ব্যক্তি কে? শিষ্য উত্তর দেয়—ইনি নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত নিমাই। দিগ্বিজয়ীর মনে যুদ্ধং দেহি ভাব প্রবল হয়ে ওঠে; ভাবেন একে এবার চূর্ণ করবো। মনে মনে গঙ্গাকে নমস্কার ক'রে উন্নত মস্তকে, উদ্ধত পদক্ষেপে দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন।

—তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত? শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা কর?

নিমাই বলেন: আজ্ঞে হাঁ। আপনার সম্বন্ধে আমি জানি। আপনি ভারত-বিখ্যাত অদ্বিতীয় কবি। স্বয়ং দেবী ভারতী আপনার কণ্ঠে বিরাজিতা। আপনি ভাগ্যবান, অপরাজেয়।

দিগ্বিজয়ী মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ভাবেন—পণ্ডিত ভয় পেয়েছে, তাই প্রথমেই স্তুতি বন্দনা দ্বারা আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিল! তা বেশ! প্রকাশ্যে আপ্যায়িতের হাসি হাসেন।

নিমাই বলেন: শুনেছি আপনার কবিত্ব অসাধারণ; আপনি যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু শোনান তবে আমরা কাব্যরসের আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

নিজ প্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছেন দিগ্বিজয়ী। ঈষৎ হেসে বললেন—তা বেশ!

তারপর সুরু হ'ল অদ্ভুত কবিতার আতসবাজি! দিগ্বিজয়ী সংস্কৃত ভাষায় অপূর্বছন্দে অনর্গল শ্লোক রচনা ক'রে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলেন। যেন উৎসমুখ থেকে বিচিত্র রঙের জলরাশি শতধারায় উৎসারিত হয়ে উঠে মনোহর

ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করলো। যেমন ভাব তেমনি শব্দের ঝঙ্কার। আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শত শ্লোক মুখে মুখে রচনা ক'রে আবৃত্তি ক'রে শোনালেন; তারপর সমবেত সকলের মুখের দিকে গর্বমিশ্রিত তৃপ্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দিগ্বিজয়ী ক্ষান্ত হলেন। নিমাইয়ের ছাত্রবর্গ কবির অসাধারণ প্রতিভা দেখে বিমুগ্ধ, স্তব্ধ।

নিমাই বললেন—চমৎকার! এমন কবিত্ব-শক্তি একান্ত দুর্লভ। গঙ্গার প্রশস্তি আপনার কবিতায় নানাভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। আপনার রচিত শ্লোক; আপনি যদি কিছু ব্যাখ্যা ক'রে শোনান তবে আমাদের আনন্দ আরো বর্ধিত হবে।

দিগ্বিজয়ী জয়ের হাসি হাসলেন। কোন্‌টির ব্যাখ্যা শুনতে চাও বল? আমি তো অনেক কিছুই ব'লে গেছি।

নিমাই বলেন—এই শ্লোকের অর্থ করুন:

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্য চরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত-গুণা॥

[ শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল থেকে আবির্ভূত হওয়ায় যিনি পরম সৌভাগ্যবতী হয়েছেন, দেবগণ ও নরগণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় যাঁর চরণ-সেবা করছে এবং যিনি ভবানী-ভর্তার অর্থাৎ শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজিত হয়ে অদ্ভুত-গুণশালিনী হয়েছেন, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ]

নিমাইয়ের মুখে শ্লোকটি শুনে কবি বিস্মিত হয়েছেন। বলেন—আমি ঝড়ের বেগে কবিতা বলে গেছি, তার মধ্যে এ শ্লোক তুমি মনে রাখলে কেন ক'রে?

নিমাই উত্তর দেন—দেবতার বরে আপনি হয়েছেন কবি; তেমনি কেউ তো শ্রুতিধরও হ'তে পারে।

কবি তাঁর কবিতার অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে শোনান। নিমাই বলেন—আপনার কাব্য-প্রতিভায় মানুষকে মুগ্ধ করে। এ কবিতার দোষগুণ আপনি নিজেই বিচার ক'রে আমাদের তৃপ্ত করুন। উদ্ধত কবির অহংবোধ দীপ্ত হয়ে ওঠে; বলেন—এ কবিতা উপমা, অলঙ্কার, অনুপ্রাসের গুণে ঝলমল করছে, এতে

দোষের চিহ্নমাত্র নাই। তুমি বালকের পাঠ্য ব্যাকরণ পড় আর পড়াও, তুমি এর অলঙ্কার কি বুঝবে।

নিমাই ক্রোধ প্রকাশ করেন না। স্মিত হাসি হেসে বলেন—যদি কিছু মনে না করেন তবে এ কবিতার দোষগুলি বিচার করুন। আমার কথা বললেন অলঙ্কার পড়িনি, তা ঠিক, কিন্তু শুনেছি। আমি তো এতে দেখছি পঞ্চ অলঙ্কার এবং পঞ্চ দোষ। দোষ দেখুন—'বিধেয়াবিমর্ষ' দোষ দুই জায়গায়—'গঙ্গার মহত্ত্ব' এই শব্দটি হ'ল কবিতার মূল বিধেয়; 'ইদং' শব্দ এর আগে বসানো উচিত ছিল। তেমনি, দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী সমাসবদ্ধ শব্দে 'দ্বিতীয়' শব্দ 'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ বিনাশ করেছে। তারপর ভবানী-ভর্তা শব্দটির প্রয়োগে একটি মহাদোষ ঘটেছে। এটি হ'ল 'বিরুদ্ধমতি' দোষ; ভবের অর্থাৎ শিবের পত্নী ভবানী; ভবানীর পতি বললে দ্বিতীয় পতি বোঝায়। এটি অতি বিরুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য শেষ ক'রে আবার 'অদ্ভুত-গুণা' এই বিশেষণটি প্রয়োগে 'পুনরাত্ত' দোষ ঘটেছে। তারপর দেখুন, তিন পদে অনুপ্রাস রয়েছে, এক পদে নাই। এ দ্বারা যে দোষ ঘটেছে তাকে বলি 'ভগ্নক্রম'। অবশ্য আপনার শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার আছে কিন্তু এই পঞ্চ দোষ শ্লোকের সকল গুণ ছারখার করেছে।

কবি নির্বাক্ হয়ে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। প্রতিবাদ করবার তাঁর কিছু নাই; তিনি যেন বিচক্ষণ চিকিৎসককে ক্ষিপ্রহস্তে নিজদেহের ওপর অস্ত্র-চালনা করতে লক্ষ্য করেন!

এর পর নিমাই পঞ্চ অলঙ্কারের বিচার ক'রে এর দোষগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। অবশেষে বলেন—এই হ'ল স্থূল বিচার। সূক্ষ্ম বিচারে এ শ্লোকের অশেষ দোষ ধরা পড়বে।

দাম্ভিক কবির উন্নত শির জীবনে এই সর্বপ্রথম নত হ'ল; আত্মপক্ষ সমর্থনে কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিতে কণ্ঠ রুদ্ধ। কিছুই বলতে পারলেন না, পড়লেন মহা ফাঁপরে। তাঁর দুরবস্থা দেখে নিমাই-য়ের শিষ্যগণ হাসাহাসি করতে লাগল। নিমাই তাদের নিষেধ ক'রে বিনয়-বচনে কবিকে প্রবোধ দিলেন। বললেন—অসাধারণ আপনার শক্তি; আপনার কবিতা যেন গঙ্গাজলের ধারা। আপনি ভাগ্যবান। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতির কবিতাতেও দোষ আছে কিন্তু তাই ব'লে তার গৌরব কমেনি। আমি আপনার শিষ্যের সমানও নই। আমার চপলতায় কিছু

মনে করবেন না। আজ আপনি গৃহে যান, আগামী কাল আবার মিলিত হব।

*　　　*　　　*　　　*

দিগ্বিজয়ী ফিরে গেলেন তাঁর তাঁবুতে। পরাজিত, লজ্জিত, সঙ্কুচিত। ভারতের সর্বত্র যিনি জয়ধ্বনি লাভ করেছেন, আজ তাঁর এ কি হ'ল! কোথায় গেল তাঁর অফুরন্ত ভাবের বন্যা? কোথায় গেল তাঁর ভাষার সাবলীল ঝঙ্কার? প্রতিভা তাঁর স্তম্ভিত! তাঁর আরাধ্যা দেবী সরস্বতী কি তাঁর প্রতি রুষ্টা হয়েছেন? নতুবা কেন এই পরাজয়?

পরাজয়ের বেদনা অন্তরে বহন ক'রে কবি সারারাত্রি সরস্বতীর ধ্যানে কাটান। শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যেন স্বপ্নে ইষ্টদেবতার বাণী লাভ করলেন। সংশয় তার দূর হয়েছে। তিনি তখনি দ্রুতপদে নিমাইয়ের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

*　　　*　　　*　　　*

প্রভাত কাল। কবি ভক্তিভরে নিমাইয়ের পদ-বন্দনা ক'রে বললেন—প্রভু, স্বপ্নে আমার আরাধ্য দেবতার কাছ থেকে জানতে পেরেছি আপনি সাধারণ মানুষ নন। অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়েছে। আমাকে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করুন।

—সরস্বতী তোমার কণ্ঠে বিরাজ করেন, তুমি মহাভাগ্যবান। কিন্তু বিদ্যার যোগ্য প্রয়োগ তুমি করনি। বিদ্যা দিয়ে দিগ্বিজয় করায় তার সার্থকতা নাই। দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর।

*　　　*　　　*

গৌরাঙ্গের আলিঙ্গন লাভ ক'রে পুলকিত অন্তরে কবি ফিরে আসেন। মনের তাঁর পরিবর্তন হয়েছে; নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। হাতী-ঘোড়া সঙ্গীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, ঐশ্বর্য আড়ম্বর পরিত্যাগ ক'রে একাকী তিনি স্থান ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। দাম্ভিক জ্ঞানী হলেন ভক্ত সাধক।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল উল্লাস। ভারত-বিজয়ী কবি নবদ্বীপে লাঞ্ছিত হয়েছেন; নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের মানরক্ষা করেছেন নিমাই; নিমাই সকলের মাথার মণি। কৃতজ্ঞ অধ্যাপকগণ তাঁকে 'বাদি-সিংহ' উপাধি দিয়ে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের ঘটনাটি স্মরণীয় ক'রে রাখেন।

**উত্তরবঙ্গে সফর ঃ**

সমগ্র নবদ্বীপ নিমাইয়ের খ্যাতিতে মুখরিত ; তাঁর প্রভাতসূর্য-রুচি দেহকান্তি সকলের অন্তর আলো ক'রে আছে। নিমাইয়ের ইচ্ছা হ'ল উত্তরবঙ্গে সফরে যাবেন। জননীর অনুমতি নিয়ে কয়েকজন প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে চললেন মানুষের মন-বিজয়ে। সুন্দরের প্রতি মানুষের চিরন্তন আকর্ষণ ; সে সুন্দর বস্তু যদি দেবভাবে পূর্ণ জ্ঞান ও পবিত্রতার আধার হয় তবে তা মানুষকে করে বিস্মিত, তার মনে আনে আনন্দের জোয়ার। গৌরাঙ্গের সুঠাম দেহের লাবণ্য এমনি ধরনের। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয় ; যে-পথ দিয়ে যান, লোক ভিড় ক'রে আসে ; বর্ষীয়সী মহিলারা বলেন—ধন্য সেই মা যে এমন ছেলে কোলে পেয়েছে ; তরুণীরা ভাবে—ধন্য সেই বধূ যে এমন স্বামী লাভ করেছে।

পদ্মা পার হয়ে নিমাই উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেন। পদ্মার সৌন্দর্য তাঁকে আনন্দিত করে ; এখানে তিনি আবগাহন স্নান ক'রে পরম সন্তোষ লাভ করেন। পদ্মা যেন দ্বিতীয় ভাগীরথী ; বিপুল তার জলরাশি, বিস্তৃত আরাম-দায়ক তার বালুকা-বিছানো বেলাভূমি।

* * * *

নিমাইয়ের খ্যাতি তাঁর বহুপূর্বেই সেখানে পৌছেছে। যেখানে তিনি অবস্থান করেন সেখানেই যেন তীর্থক্ষেত্র ; আকাশের চাঁদ অঙ্গনে নেমে এসেছে। বিদ্যার্থী আসে দলে দলে নিমাই-পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ; জ্ঞানী গুণী আসে তাদের সমস্যার সমাধান ক'রে নিতে, দীপ্ত প্রদীপ থেকে নিজেদের অন্তরের জ্ঞান-বর্তিকা জ্বালিয়ে নিতে।

তপন মিশ্র নামে এক শুদ্ধ সাত্বিক ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরপরায়ণ। দিবানিশি ইষ্টমন্ত্র জপ করেন কিন্তু সাধনার বস্তু কি, সাধনার পদ্ধতি কি এ সম্বন্ধে নিজের মনে যেন কেমন একটু সংশয় থেকে যায় তাঁর। কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চলতে হবে স্থির করতে পারেন না ; মনে তাঁর সেজন্য অত্যন্ত অস্বস্তি। একদিন নিশিশেষে স্বপ্নে দেখেন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বলছেন—নিমাই-পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তোমায় সাধ্য এবং সাধন কি সে বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

পথের সন্ধান পেয়ে প্রভাতে তপন মিশ্র ছুটে আসেন গৌরাঙ্গের নিকট। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে করজোড়ে বলেন—প্রভু,আমার মনের সংশয়-অন্ধকার

দূর করুন; সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন বিষয়-সুখে আমার মন বসে না; কিসে আমার প্রাণ জুড়াবে তার উপায় দেখিয়ে দিন, ঠাকুর।

মধুর হাসি হেসে নিমাই বলেন—কৃষ্ণ-ভজনা করতে মন হয়েছে, তুমি তো ভাগ্যবান। কলিযুগে তপ যজ্ঞ কিছু নাই, কৃষ্ণনাম জপ, হরিনাম সংকীর্তনই একমাত্র ভজন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে এই মহামন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর হ'লে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব উপলব্ধি হবে। নাম-সংকীর্তনই আরাধনা।

মিশ্রের মনের আঁধার কেটে যায়। তিনি বারংবার প্রণাম করতে থাকেন। বলেন—আমাকে তোমার সঙ্গে যাবার অনুমতি দাও, প্রভু। গৌরহরি স্নেহভরে তপন মিশ্রকে আলিঙ্গন দান করেন। শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ পেয়ে মিশ্রের দেহ পুলকে কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

প্রভু বলেন—আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নাই। তুমি বারাণসীতে যাও, সেখানে আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। মিশ্র সংগোপনে রাত্রির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলেন। নিমাই স্মিতহাস্যে উপদেশ দেন—এ-সব গোপন-কথা এখন আর কারো কাছে ব'লো না। তোমার কাজ ক'রে যাও।

প্রভুর বাক্য শিরোধার্য ক'রে তপন মিশ্র চলেন বারাণসীর দিকে। নিমাই ফিরে আসেন নবদ্বীপে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর দেহান্ত ঘটেছে। গৃহে রয়েছেন শচীমাতা; পুত্রবধূর শোকে বিষণ্ণ। একাকিনী। পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা।

*　　*　　*　　*

বিষ্ণুপ্রিয়া ঃ

শচীমাতা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করতে যান। ঘাটে শত শত মহিলার সমাবেশ। প্রত্যহ একটি কিশোরী স্নানের ঘাটে তাঁকে প্রণাম করে, কাছে এসে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অপরূপ সুন্দরী বালিকা। স্থিরবিদ্যুতের মতো সৌন্দর্য। দীর্ঘ পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। অধর যেন হিঙ্গুল দিয়ে রাঙানো। মেয়েটির প্রতি শচীমায়ের কেমন মায়া হয়। নাম জিজ্ঞেস করেন।

মধুরকণ্ঠে বালিকা উত্তর দেয়—বিষ্ণুপ্রিয়া। কিশোরী নবদ্বীপের সম্পন্ন গৃহী পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা।

শচীদেবীর ইচ্ছা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি পুত্রবধূরূপে ঘরে আনেন। ঘটক কাশী মিশ্র শচীদেবীর অভিলাষ জানান সনাতন মিশ্রকে। নিমাই তখন বিদ্যায়, খ্যাতিতে, রূপে অদ্বিতীয়। এ হেন জামাতা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই। সনাতন সানন্দে রাজী হন। রাজ-আড়ম্বরে বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুরাগ-তপস্যা হ'ল সফল সার্থক।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কামনা যখন সার্থক হয়েছে, নিমাইকে স্বামীরূপে লাভ ক'রে অন্তর যখন তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ, সেই সময়ে ছোট্ট একটি ঘটনা তাঁর মনে গোপন আশঙ্কার ছায়ারূপে জেগে রইলো। স্বামীর সঙ্গে বাসর-ঘরে যেতে হঠাৎ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উচট লেগে রক্ত ঝরতে লাগল। নিমাই তৎক্ষণাৎ আপন পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরলেন। রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল। নববধূর ব্যথারও উপশম হ'ল কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগল—এ কি কোন অমঙ্গলের চিহ্ন!

*  *  *  *

রূপে-আলো-করা লক্ষ্মীস্বরূপিণী নববধূকে শচীমাতা কোলে ক'রে নিজের গৃহে বরণ ক'রে নিলেন। তাঁর মনের অভাব আর ঘরের অভাব পূরণ হ'ল।

*  *  *  *

**প্রেমের বন্যা—সূত্রপাত ঃ**

নিমাইয়ের বয়স বছর একুশ। অধ্যয়নে অধ্যাপনায় দিন চলেছে। বাদি-সিংহ শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। গৃহে স্নেহশীলা জননী ও ভক্তিমতী পত্নী; টোলে মেধাবী শিষ্য ছাত্রবৃন্দ। সমগ্র নদীয়ায় রাজার ন্যায় সম্মান। সুখের সংসার। অলক্ষ্যে এই সংসার-নাট্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়।

*  *  *  *

গয়াক্ষেত্র উদ্দেশে যাত্রা করেছেন নিমাই। গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ শোধ করবেন। সঙ্গে চলেছেন মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্য আর প্রিয় শিষ্যগণ। গঙ্গার তীর ধরে চলেন।

মন্দারে এসে পৌছলে নিমাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রবল জ্বর। সঙ্গীরা চিন্তিত হলেন। কি উপায় করা যায়? নিমাই নিজেই ওষুধের ব্যবস্থা

করলেন। বললেন—একজন ব্রাহ্মণের পাদোদক এনে দাও। সেই পরম ঔষধ। পাদোদক আনা হ'ল। পান করলেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের মহিমা প্রচারের ভিতর দিয়ে লোকশিক্ষা দেওয়া হ'ল। চাই বিশ্বাস, চাই ভক্তি।

গয়াতীর্থে উপনীত হয়ে নিমাই তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ক'রে চক্রবেড়ে এলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে। কত যাত্রীর সমাবেশ। ব্রাহ্মণগণ পদচিহ্নের মহিমা কীর্তন করছেন—এই দেখ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। এখানে গয়াসুরের মস্তকে তিনি শ্রীপদ স্থাপন করেছিলেন; মহেশ্বর দিবানিশি এই পদযুগল ধ্যান করেন; এই শ্রীপদ থেকে গঙ্গার উদ্ভব। দেখ, জীবন সার্থক কর। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অন্তরে অঙ্কিত ক'রে নিয়ে জীবন ধন্য কর।

নিমাই একদৃষ্টে শ্রীপাদপদ্ম নিরীক্ষণ করছিলেন। ব্রাহ্মণদের ভক্তি-জাগানো কথাগুলো কানে মধু বর্ষণ করছিল। হৃদয়ের ভিতর থেকে যেন আনন্দ-ধারা শতধারে বেরিয়ে আসতে লাগল। সারা দেহ কম্পিত হ'তে লাগল, পুলক-রোমাঞ্চ জেগে উঠলো, অধর অল্প অল্প স্ফুরিত হ'তে লাগল, অশ্রুবাষ্পে চোখ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর সেই অশ্রুধারা শুভ্র বৃহৎ মুক্তাফলের ন্যায় গণ্ড বেয়ে, বক্ষ বেয়ে অবিরল স্রোতে প্রবাহিত হ'ল। দর্শকগণ মুগ্ধবিস্ময়ে এই অপূর্বসুন্দর ভাবাবিষ্ট মূর্তির দিকে চেয়ে রইলো। ভক্তির ছটায় নিমাইয়ের সর্ব অবয়ব ঝলমল করছে। বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে আসছে; এখুনি হয়ত টলে পড়ে যাবেন।

ভাগ্যক্রমে সেখানে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরপুরী। কৃষ্ণপ্রেমিক সংসারবিরাগী সাধু। ভক্তশিরোমণি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য তিনি। মাধবেন্দ্র-পুরীর কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নাই। আকাশে মেঘদর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠতো, প্রেমানন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। এমনি গুরুর যোগ্য শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে গিয়ে নিমাইকে দর্শন করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি নিমাইয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন।

নিমাই যখন কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শনে তন্ময়, মহিমা শ্রবণে ভাবে বিভোর, তখন তাঁর অলক্ষিতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরপুরী এই অলৌকিক ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করছিলেন। নিমাই অচেতন হয়ে পড়ে যাবার আগেই তিনি তাঁকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন। নিমাই চোখ মেলে দেখেন ঈশ্বরপুরী। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম আরো

উথলিয়ে ওঠে ; উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন-বদ্ধ ক'রে প্রেমাশ্রুপাত করতে থাকেন। নিমাই বলেন—আমার তীর্থদর্শন সার্থক, আমার জীবন সার্থক যে তোমাকে পেয়েছি। আমার দেহ আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলেম। আমায় তুমি সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার কর ; আমার ওপর এই কৃপা কর গোঁসাই আমি যেন কৃষ্ণপ্রেমসুধা পান করতে পারি।

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে গভীর প্রেমভরে আলিঙ্গন-বদ্ধ করেন। বলেন—পণ্ডিত, নবদ্বীপে যখন তোমায় দেখেছি তখন থেকেই তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ করছো। তোমাকে হৃদয়ে পেয়ে নিরন্তর আমি অপূর্ব পুলক অনুভব করছি। আমি তোমারই অধীন ; তুমি যেরূপ আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো।

বাসস্থানে ফিরে এসে নিমাই নিজের জন্য রন্ধনের আয়োজন করেন। রন্ধন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় ঈশ্বরপুরী এসে উপস্থিত। তিনি আর নিমাইকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা পুরী-গোঁসাই বলেন—আজ আমার বড় ভাগ্য। আমি ক্ষুধার্ত হয়ে তোমার কাছে এলাম, এদিকে তোমার রন্ধনও সমাপ্ত হ'ল।

—সে তো আমারই ভাগ্য, গোঁসাই। তুমি কৃপা ক'রে এ অন্ন গ্রহণ কর।

—তুমি কি খাবে পণ্ডিত? বরং এসো এই অন্ন দু'ভাগ ক'রে আমরা দুজনে গ্রহণ করি।

নিমাই তাতে রাজী হন না। যত্ন ক'রে ঈশ্বরপুরীকে ভোজন করিয়ে তিনি আবার নিজের জন্য রান্না ক'রে নেন। ঈশ্বরপুরী অত্যন্ত প্রীত হন। একই ভাবের ভাবুক দুজন। এঁদের মিলন যেন গঙ্গা-যমুনার পুণ্যধারার মেশামিশি। তারপর এক শুভদিনে ঈশ্বরপুরী নিমাইকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন—দশ অক্ষরী গোপীজনবল্লভের মন্ত্র। গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের দিন যে চিত্তের আবেগ পূর্ণচন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র-বক্ষের মতো স্ফীত হয়ে উঠে নিমাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, তা এখন প্রবাহিত হ'ল সুনির্দিষ্ট খাতে। গৌরাঙ্গের জীবনে এক নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল।

নিমাইয়ের পূর্বের চপলতা আর নাই। এখন তিনি সম্পূর্ণ এক নূতন জগতের মানুষ। দিবানিশি বিরলে বসে গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, বাহ্যজ্ঞান নাই, দেহচেষ্টা নাই ; অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে। কখনো উর্ধ্বমুখে উদাস

দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কখনো বা আপনা-আপনি কথা বলেন। অধোমুখে বসে অশ্রুপাত করেন। অন্তরে কিসের ব্যাকুলতা সঙ্গীরা বুঝতে পারে না।

একদিন একাকী নিভৃতে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন। অকস্মাৎ 'কৃষ্ণ আমার বাপরে আমার কোথায় গেলে রে' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠে জ্ঞানহারা হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা ছুটে এল, জলের ছিটা, পাখার বাতাস দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলল কিন্তু আবার দেহ এলিয়ে পড়লো। আকুলকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন—কৃষ্ণ, বাপ আমার! তোমা বিনে আর জীবন ধারণ করনে পারিনে। আর লুকিয়ে থেকো না। তোমার অদর্শন আর সহ্য হয় না। দয়াময়, দর্শন দাও। দর্শন দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করো। তোমা বিনে আমার বিশ্বভুবন অন্ধকার। দেখা দাও, দেখা দাও।

সে কাতর আকুতি দেখে সঙ্গিগণ বড়ই অসহায়বোধ করে। কেমন ক'রে নিমাইকে সান্ত্বনা দেবে? তাঁর কাতরতা দেখে নিজেরাও চোখের জল রাখতে পারে না। নিমাই বলেন—তোমরা বাড়ী ফিরে যাও। আমি আর বাড়ী যাব না; কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমি বৃন্দাবন চললেম। আমার মাকে তোমরা সান্ত্বনা দিয়ো, ব'লো—নিমাই তোমার কৃষ্ণের সন্ধানে বৃন্দাবন গেছে। 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' ব'লে নিমাই পাগলের মতো ছুটে যেতে চান বৃন্দাবন অভিমুখে। সঙ্গিগণ অতিকষ্টে তাঁকে সংযত ক'রে প্রবোধ দিয়ে রাখে; অবশেষে ফিরিয়ে আনে নবদ্বীপে। কিন্তু সে পণ্ডিত নিমাই আর নাই। এখন প্রেমিক নিমাই। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল নিমাই।

## নদীয়ায় এলো বান

নিমাই গয়াধাম থেকে ফিরে এসেছেন। বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলেন আশ্বিন মাসে, ফিরলেন পৌষ মাসের শেষদিকে। অন্তরঙ্গ বন্ধুজন তাঁর জন্য অধীর হয়ে ছিলেন ; জননী এবং বিরহকাতরা পত্নীর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। নিমাই ফিরেছেন শুনে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। তাঁর সাথীদের কাছে কেউ কেউ শুনেছেন নিমাইয়ের পরিবর্তনের কথা। এতে তাদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এসেছেন নিমাইয়ের বাড়ীতে। নিমাইকে দেখে সবাই বিস্মিত। এই কয়েক মাসের মধ্যে কী পরিবর্তন! সে উদ্ধত, চঞ্চল, কৌতুকপ্রিয় নিমাই আর নাই। নিমাই এখন নম্র, শান্ত, বিনয়ী। অন্তরে যেন কিসের আকুলতা, চোখে জলের ধারা। দেহের সৌন্দর্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁচা সোনায়-গড়া সুগঠিত দেহ থেকে দীপ্তি বেরোয়।

অপরাহ্নে তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এসেছেন তীর্থ-কাহিনী শুনতে। শ্রীমান পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত আর সদাশিব কবিরাজ। বহির্বাটীতে বসে নিমাই তীর্থের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। গয়ার কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বন্ধুগণ, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলা দেখলাম সেখানে। সেখানে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করছেন ; সেই তীর্থে কৃষ্ণ গয়াসুরের মস্তকে পদস্থাপন করেছিলেন। সেই চরণের কি মহিমা! সেই চরণ থেকে গঙ্গার উদ্ভব, সেই শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করবার জন্য শিবের তপস্যা। সেই ত্রিলোকপাবন পাদপদ্মচিহ্ন এখনো রয়েছে। সেই পরম দয়াল কৃষ্ণের পদচিহ্ন—বলতে বলতে নিমাইয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, নয়নের অঝোর ধারায় মাটি ভিজে গেল। সব দেহ রোমাঞ্চিত ; থর থর ক'রে কাঁপছে। নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই অপূর্ব ভাব দেখে বন্ধুগণ বিস্মিত! তাঁরা ভাবেন—এমন ভক্তির উচ্ছ্বাস, এমন আকুলতা কি মানুষে সম্ভবে? নিশ্চয়ই এঁর 'পর কৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়েছে। সেবা-যত্ন ক'রে নিমাইকে কিঞ্চিৎ সুস্থ ক'রে তোলেন তাঁরা। নিমাই বলেন—আমার মনের দুঃখ বলা হ'ল না। আজ তোমরা ঘরে যাও ; কাল সকালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে যেও। সেখানে নিভৃতে আমার মনের কথা তোমাদের বলবো।

* * * *

শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে চিন্তিত হন ; ব্যাপার কি বুঝতে পারেন না। সুস্থ সবল সুন্দর শরীর, তরুণ বয়স। এখন নিমাই আনন্দ-উল্লাসে দিন কাটাবে ; এতদিন পরে বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরেছে, আপনজনের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎফুল্ল হবে কিন্তু এ কি! তার কিসের গোপন ব্যথা ? সারাদিন এমনভাবে অশ্রুজলে ভাসে কেন ? সে যখন উদ্ধত ছিল, চঞ্চলতা প্রকাশ করেছে তখনই ভালো ছিল! গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কি মন্ত্র দিলেন, তার জন্যই কি নিমাই আমার এমন হ'ল ? জননীর মনে অস্বস্তি তোলপাড় করতে থাকে। আবার ভাবেন হয়ত এ-সবই সাময়িক। বৌমার সেবা-যত্ন পেলে নিমাই আবার আগের মতোই হাসিখুশি হবে।

* * * *

রাত্রিতে শয়ন-ঘরে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলাপ করার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি স্ববশে নন। দু'-চারটে কথা বলার পরই চোখে নামে অশ্রুর বান। সরলস্বভাবা কিশোরী কিছুই বুঝতে পারেন না। স্বামীকে কি সান্ত্বনা দেবেন তিনি ? নিমাইয়ের আকুলতা দেখে ভয় পেয়ে নিরুপায় হয়ে শাশুড়ীকে তাঁর ঘর থেকে ডেকে আনেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ডাক শুনে শচীদেবী ব্যস্ত হয়ে নিমাইয়ের ঘরে আসেন, দেখেন নিমাইয়ের বক্ষ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। জননী পুত্রের মস্তকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন—তোমার কিসের দুঃখ, বাবা ? তোমার দুঃখ দেখে আমাদের যে বুক ফেটে যায়।

নিমাই বলেন—আমার কোন দুঃখ নাই, মা। আমার যে চোখের জল তা দুঃখের নয়। তাকে যখন দেখি, আমি আত্মহারা হয়ে যাই, পুলকে আমার শরীর-মন ভরে যায়। এক অপূর্বসুন্দর শ্যামল কিশোর, গলে তার বনফুলের মালা, মুরলী বাজিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে ; পায়ের নূপুর রুনুঝুনু বাজে। নেচে নেচে হেসে হেসে আমার কাছে আসে, আবার ছুটে পালায়। তাকে না দেখলে সব অন্ধকার মনে হয়, প্রাণ আকুল হয়। আবার আসে, আবার সেই মোহন রূপে আমায় ভোলায়। তাকে আমার কাছে এনে দাও, তাকে এনে দাও। সেই কালোরূপে আলো-করা বনমালী আমার সকল আনন্দের উৎস! এমন মধুর রূপ আমি আর কখনো দেখিনি।

কৃষ্ণকথা আলোচনার আনন্দে রাত্রি শেষ হয়। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে প্রবোধ দেবার ভাষা পান না। তাঁরা ভাবেন কেমন সেই নয়নরঞ্জন ঠাকুর যার জন্য নিমাই এমন আকুল হয়েছে! নিজেরা নিরুপায় অসহায় বোধ করেন।

* * * *

প্রভাতে শ্রীবাসের ফুলবাগানে ফুল তোলার জন্য কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব একত্রিত হয়েছেন। একটি বড় কুন্দফুলের ঝাড়ে প্রচুর ফুল হ'ত। সেখান থেকে সবাই ফুল তুলছেন। শ্রীমান পণ্ডিত ফুল তুলছেন আর মৃদুমৃদু হাসছেন। তাঁকে দেখে শ্রীবাস বলেন—আজ যে পণ্ডিতের মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখি, ব্যাপার কি? শ্রীমান পণ্ডিত বলেন—কারণ আছে, তাই তো হাসি।

—কী কারণ, শুনি?

নিমাই পণ্ডিত গয়াক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন, তোমরা শুনেছ। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। শ্রীক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেম। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কী নম্র, কী বিনয়ী, কী ভক্তির উচ্ছ্বাস; কৃষ্ণকথা বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, চোখের জলে মাটি ভেজে। মানুষের এমন ভাব আমি কখনো দেখিনি। নিমাই পণ্ডিত হয়েছেন পরম বৈষ্ণব।

শুনে সবাই আনন্দ-ধ্বনি ক'রে ওঠেন। শ্রীবাস বলেন—আজ বড় শুভ সংবাদ দিলে, পণ্ডিত। কৃষ্ণ আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুন, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীমান পণ্ডিত বলেন—নিমাই কাল তাঁর মনের সব কথা বলতে পারেননি। আজ সকালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে আমাদের কয়েকজনকে মিলিত হ'তে বলেছেন। সেখানে গিয়ে এখন তাঁর কাছে কৃষ্ণের আখ্যান শুনব।

* * * *

গঙ্গার তীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ। সেখানে মুরারি গুপ্ত, শ্রীমান পণ্ডিত আর সদাশিব কবিরাজ প্রফুল্লমনে একত্রিত হয়েছেন। গদাধর অতি সুদর্শন, সুকণ্ঠ, ঈশ্বরপ্রেমিক। তিনি প্রভাতে ফুল তোলার সময় শুনেছেন নিমাই শুক্লাম্বরের গৃহে আসবেন; তাই কৃষ্ণকথা শোনার আগ্রহে সেখানে এসেছেন কিন্তু তাঁর তো থাকার অনুমতি নাই, তাই গৃহের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। বারান্দায় কয়েকজন নিমাইয়ের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন এমন সময় নিমাই টলতে টলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ, সবল পুরুষ কিন্তু চলনে দৃঢ় ভাব নাই; অশ্রু-ঝাপ্‌সা চোখে স্খলিতচরণে তিনি কোন রকমে পথ চলছেন। উঠান পার হয়ে এসে বারান্দায় উঠেই 'হা কৃষ্ণ' ব'লে জ্ঞানহারা

হয়ে পড়লেন। পড়বার সময় বারান্দার একটি খুঁটি ধরেছিলেন, সেটি-সহ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

বন্ধুগণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিমাইকে তুললেন। দেখেন দেহে জীবনের চিহ্ন নাই; চক্ষু স্থির, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে, সর্বশরীর রোমাঞ্চিত। চোখে মুখে জল-সিঞ্চন করাতে কিছুক্ষণ পরে তাঁর কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চার হ'ল। তখন তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে কাতরস্বরে রোদন করতে লাগলেন। 'আমার কৃষ্ণ নাই; এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিল, কোথায় গেল; কোথায় গেল আমার কৃষ্ণ!' ব'লে নিমাই মাটিতে লুটিয়ে আকুলস্বরে কাঁদতে লাগলেন। সঙ্গিগণের যত্নে একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেন, আবার 'হে কৃষ্ণ' ব'লে মূছিত হয়ে পড়েন। নিমাইয়ের এই অপূর্ব ভক্তিভাব দেখে বন্ধুগণ ভক্তিতে গদগদ হয়ে কাঁদতে থাকেন। নিমাই তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলেন—ভাই, নিরন্তর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল; তোমরা আমার দুঃখের খণ্ডন কর। তোমরা আমার নন্দের নন্দনকে এনে দাও।

বাইরে যখন ভক্তগণ ভক্তির তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে থাকেন, ঘরের ভিতর থেকে গদাধর তার রস আস্বাদন করেন। একবার আত্মহারা হয়ে তিনি কেঁদে উঠেছেন। তা শুনে নিমাই জিজ্ঞেস করেন—ঘরে কে?

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বলেন—তোমার গদাধর। গদাধর তখন নতমস্তকে বসে; অশ্রুধারা বক্ষ বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁকে আনা হ'ল বারান্দায়। নিমাই তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলেন—তুমি ভাগ্যবান, গদাধর। বাল্যকাল থেকে তুমি কৃষ্ণ-ভজনা করছো। বৃথা বসে আমার জীবন গেল। অমূল্য নিধি পেলাম কিন্তু নিজদোষে তা হারালেম, গদাধর—ব'লে কাতরভাবে রোদন করতে থাকেন। সারাটি দিন এইরূপ কৃষ্ণানন্দে অতিবাহিত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাই সন্ধ্যাকালে ফিরে চলেন নিজগৃহে।

* * * *

পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল। গুরুদেব গয়াক্ষেত্রে তীর্থ করতে গেলে শিষ্য ছাত্রগণ পাঠ বন্ধ ক'রে গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। নিমাই ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। তাদের দেখে নিমাইয়ের অধ্যাপনার কথা মনে পড়লো। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান ক'রে চললেন অধ্যাপনার কাজে।

নবীন অধ্যাপক বসেছেন মাঝখানে, তাঁকে ঘিরে ছাত্রদল। ছাত্রগণ সবাই উৎফুল্ল। অনেকদিন পর নূতন উদ্যমে পাঠ আরম্ভ হবে। পুঁথি সব ডোর দিয়ে বাঁধা ছিল; 'হরি হরি' ব'লে শিষ্যগণ পুঁথির ডোর খুললো। মধুর হরিনাম শোনামাত্র নিমাইয়ের ভাবান্তর হ'ল ; আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। বললেন—কৃষ্ণনাম কী মধুর! সর্বশাস্ত্রের সার এই এক কৃষ্ণনাম। শ্রীকৃষ্ণের ভজনা ছাড়া যে অন্য কর্মে লিপ্ত থাকে তার জীবন বৃথা যায়। আগম-নিগম বেদ-বেদান্ত সকল শাস্ত্রের সার হ'ল কৃষ্ণভক্তি। জগৎ-জীবন, সেবক-বৎসল, করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণের নামে যার রতি নাই সর্বশাস্ত্র পড়া হ'লেও তার দুর্গতির শেষ নাই। কৃষ্ণ-আরাধনা, কৃষ্ণ-লাভই জীবের একমাত্র কাম্য। ভাই সকল, কৃষ্ণ-আরাধনাতেই মন নিবিষ্ট কর।

এইভাবে আত্মহারা হয়ে ভগবৎ-আলোচনায় মগ্ন হয়ে কতক্ষণ সময় কাটিয়েছেন খেয়াল নাই। হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসায় শিষ্যদের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে থাকলেন। বললেন—আজ মঙ্গলাচরণ হ'ল। আজ এই পর্যন্তই থাক্। কাল থেকে পাঠ শুরু হবে। আজ চলো গঙ্গাস্নানে যাই।

পরদিন ছাত্রগণ আবার পুঁথিপত্র নিয়ে গুরুকে ঘিরে বসেছে। কিন্তু গুরুর মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা আসে না। অন্তর তাঁর কৃষ্ণময়, ভক্তিরসে আপ্লুত। জ্ঞানতর্কের শুষ্ক বারুদ ভক্তির জলে ভিজে গেছে, আর জ্বলে না; নিমাই পণ্ডিতের বাক্যের রংমশাল তুবড়ির অগ্নিকণার মতো আর শ্রোতাকে মোহমুগ্ধ করে না। পণ্ডিত ভক্তি-সমুদ্রে ডুবেছে। কৃষ্ণপ্রেমিক নিমাই বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণকথা বলেন, ছাত্রগণ মুগ্ধ হয়ে শোনে। এইভাবে পর পর সাতদিন গেল; নিয়মিত পাঠ আরম্ভ হ'ল না।

সকল শিষ্যের কাছে এইরূপ অবিরত কৃষ্ণকথা পছন্দ হয় না। কতক মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; নিমাইয়ের শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ছাত্রগণ সব কথা জানায় এবং অধ্যাপক যাতে পূর্বের ন্যায় সুস্থমনে পাঠদান করেন, সেরূপ উপদেশ দিতে অনুরোধ করে। নিমাইয়ের কথা শুনে গঙ্গাদাস বিদ্রূপের হাসি হাসেন। তাই নাকি! নিমাই শেষে হরি-ভজা হ'ল! আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যাতে পাগলামি ছেড়ে অধ্যাপনায় মন দেয়।

নিমাই শিষ্যদের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গাদাসকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। 'তোমার বিদ্যালাভ হউক্' ব'লে গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করেন। গঙ্গাদাস বড় পণ্ডিত

কিন্তু নাস্তিক। বিদ্যালাভই তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র কাম্য। তিনি নিমাইকে বুঝিয়ে বলেন—তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র—এঁরা বিখ্যাত পণ্ডিত। তুমিও কুলের মান রেখেছ—সমগ্র গৌড়দেশে তোমার অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি নাকি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে হরি-ভজা হয়ে কি সব পাগলামি সুরু করেছ। ও-সব ছাড়; তোমার যা ব্রত সেই অধ্যাপনায় মন দাও।

নিমাই নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো নতমস্তকে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন। জোড়হস্তে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন। এখন থেকে যথারীতি অধ্যাপনা করবো। শিষ্যগণ উৎফুল্ল, নিমাই আবার অধ্যাপক হবেন। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে তাঁরা রত্নগর্ভ আচার্যের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। রত্নগর্ভ শ্রীহট্টের লোক, ঈশ্বরপরায়ণ। সেখানে নিমাই শিষ্যদের কাছে শাস্ত্রের কথা বলছিলেন এমন সময় রত্নগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক মধুরস্বরে আবৃত্তি করলেন। সেই শ্লোকে কৃষ্ণের বর্ণনা শুনে মুহূর্তের মধ্যে নিমাইয়ের অবস্থার পরিবর্তন হ'ল, সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শিষ্যগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগল। কতক্ষণ পরে নিস্পন্দ দেহে প্রাণের সঞ্চার হ'ল; অর্ধচেতন হ'তেই নিমাই উঠে বসলেন আর বলতে লাগলেন—'শ্লোক বল', 'শ্লোক বল'।

রত্নগর্ভ যেমন শ্লোক আবৃত্তি করেন, অমনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে উঠে বসেই বলেন—বোল, বোল। এইভাবে ভাব-বিহ্বলতায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হ'ল। গদাধর সেখানে ছিলেন। তিনি রত্নগর্ভকে শ্লোক আবৃত্তি করতে নিষেধ করলেন, কেননা শ্লোক শুনে নিমাই স্থির থাকতে পারছিলেন না। সোনার অঙ্গ ধূলা-কাদায় ভরে গেছে। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে নিমাই লজ্জিত হলেন। শিষ্যদের বললেন—আমি কি চাঞ্চল্য করলেম, বল দেখি।

* * * *

পরদিন প্রভাতে নিমাই টোলে উপস্থিত হয়েছেন। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছেন। শিষ্যদের সামনে যাতে আত্মহারা হয়ে না পড়েন, সেজন্য সদাই সজাগ। সুন্দর জ্যোতির্ময় দেহ; দীর্ঘ-আয়ত নয়ন অরুণ বর্ণ ধারণ করেছে। শিষ্যগণ কৌতূহলী হয়ে গুরুকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু নিমাই কিছুতেই পাঠে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। অবশেষে ছাত্রদের বললেন

—ভাই সকল, আমাকে তোমরা মুক্তি দাও। আমার বায়ুরোগ, না কি হয়েছে কিছুতেই শাস্ত্র-চর্চায় মন দিতে পারছিনে। এত চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই মনস্থির রাখতে পারিনে। তোমাদের কাছে পাঠ দিতে বসলেই দেখতে পাই কৃষ্ণবর্ণের এক শিশু মুরলী বাজাচ্ছে। তখন আমার সব জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়, কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা মুখে আসে না। আমার সাধ্যমতো শিক্ষা আমি দিয়েছি, এখন অনুমতি দিচ্ছি তোমাদের যাঁর কাছে পড়ার অভিরুচি হয়, তাঁর কাছে পাঠ অভ্যাস কর। আমায় বিদায় দাও।

এবার শিষ্যদের সকলের চোখে জল এসে পড়লো। সুদর্শন, অদ্বিতীয় পণ্ডিতের কাছে তারা বিদ্যা ও অপরিসীম স্নেহ লাভ করেছে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে চিন্তা ক'রে সবাই কেঁদে আকুল হ'ল। একজন প্রধান শিষ্য বললেন—গুরুদেব, তোমার মতো যত্ন ক'রে আর কে পড়াবে! তুমি যা শিখিয়েছ তাই যথেষ্ট। আশীর্বাদ কর তোমার দেওয়া বিদ্যা যেন আমাদের হৃদয়ে থাকে। নিমাই একে একে সকল ছাত্রের মস্তক আঘ্রাণ ক'রে সস্নেহে আলিঙ্গন দান করলেন। বললেন—আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্বাদ করার অধিকার আমার আছে। আমি মনেপ্রাণে এই আশীর্বাদ করি যে, আমি যদি একদিনও কৃষ্ণ-ভজনা ক'রে থাকি তবে তোমাদের সকলের অভিলাষ সিদ্ধ হোক্; কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে শাস্ত্রের স্ফুরণ হোক্। সবাই তোমরা কৃষ্ণের শরণ লও, কৃষ্ণনামে তোমাদের সবার বদন পূর্ণ হোক্।

শিষ্যগণ চতুর্দিকে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। নিমাই বলেন—তোমরা আমার জন্মজন্মের বান্ধব। এতদিন তোমাদের সঙ্গে যে বিদ্যাচর্চা করলেম, এস আজ কৃষ্ণের নাম কীর্তন ক'রে তা পরিপূর্ণ করি। কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ক'রে তোমরা আমার শ্রবণ জুড়াও।

কেমন ক'রে কীর্তন করতে হয় তা তো জানি না গুরুদেব, শিষ্যগণ বলেন। ভক্তিরসে হৃদয় তাঁদের পূর্ণ হয়ে এসেছে। নিমাই বলেন—আমি সুর ক'রে আগে গাই, তোমরা পিছে হাতে তালি দিয়ে গাও—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

সুরু হ'ল নাম-কীর্তন। কীর্তনের আনন্দে, নামরসে আবিষ্ট হয়ে নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। উচ্চ কোলাহল শুনে লোক জুটে যায়।

বৈষ্ণবগণ কীর্তন শুনে সেখানে সমবেত হন। তাঁরা দেখেন ভক্তিরসের বন্যা। ইতর সাধারণ ভাবে—পড়ুয়াদের এ কী পাগলামি! এই কি পাঠের রীতি!

নবদ্বীপে হরিনাম কীর্তনের আরম্ভ হ'ল। পণ্ডিত নিমাই বিদ্যাচর্চার জন্য টোল স্থাপন করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমিক নিমাই নামকীর্তন দিয়ে টোলের পাঠ সমাপ্ত করলেন। এখন থেকে সমগ্র দেশ তাঁর হরিনাম কীর্তনের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

## গোরাচাঁদের কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কাঁদে

গয়াধামে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনে নিমাইয়ের অন্তরে যে ভাবের তরঙ্গ উঠেছিল তা বেড়েই চলেছে ; যে অশ্রুর বন্যা নেমেছিল তাঁর চোখে তার বেগ হয়েছে আরো প্রবল। বিদ্যাচর্চা. অধ্যাপনা শেষ হয়েছে ; সংসারের প্রতি হয়েছেন উদাসীন, নিজ দেহ ও জীবনধারণের প্রতিও। মন তাঁর রসের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে রয়েছে। তার সন্ধান যে না জানে, সে বুঝবে কেমন ক'রে ?

দিবানিশি নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান নাই ; কারো সঙ্গে বাক্যালাপ নাই। 'হা কৃষ্ণ, কোথা গেলে, এই যে এখানে এলে আবার কেন চলে গেলে। তোমরা আমার কৃষ্ণকে এনে দাও, এনে দিয়ে আমায় প্রাণে বাঁচাও'—কেবল এই বুলি। কখনো নীরবে উদাসদৃষ্টিতে আকাশপানে চেয়ে থাকেন ; প্রশ্ন ক'রে কেউ উত্তর পায় না। মুখে কেবল কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা আসে না।

শচীমাতা চিন্তিত হয়ে ভাবেন নিমাইয়ের এ কী হ'ল ! খাওয়া-দাওয়ার আদর-যত্ন করেন, তরুণী বধূমাতাকে সুসজ্জিতা ক'রে তাঁকে দিয়ে খাবার পরিবেশন করান, তাঁকে সামনে বসিয়ে রাখেন—নিমাই চোখে দেখুক, আকৃষ্ট হোক্, সাধারণ যুবকের মতো সংসারে তার মন আসুক, এই উদ্দেশ্য। কিন্তু নিমাই অসাধারণ। কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নাই। মায়ের সন্দেহ হয়—নিমাইয়ের কি বায়ুরোগ হ'ল ! প্রতিবেশিনীরা বলেন—অবস্থা যেন কেমন মনে হয় ; বায়ু শান্ত হয় যাতে এমন ঠাণ্ডা তেল মাথায় মালিশ করো। অগত্যা পরামর্শ নেবার জন্য শচীমাতা শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডেকে পাঠান। শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুলোক, জ্ঞানী, ধীর এবং পরম ভক্ত।

* * * *

নিমাই করজোড়ে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করছিলেন। গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা পড়ছে। শ্রীবাস এসে নীরবে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের সুন্দর অবয়ব আর ভক্তিপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করছিলেন। তাঁকে দেখে নিমাইয়ের ভক্তি উথলিয়ে উঠলো। শ্রীবাসকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এসে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ

পরে জ্ঞানলাভ ক'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে আকুলভাবে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীবাস কাছে বসে অনেক যত্নে তাঁকে শান্ত করলেন।

নিমাই শ্রীবাসকে প্রণাম ক'রে বললেন—পণ্ডিত, দেখতো আমার কি হ'ল। ঘন ঘন মূর্ছা হয়, চোখের জল থামে না ; আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল, আমি আমার স্ববশে নাই। লোকে বলে বায়ুরোগ। কেউ কেউ বলে, আমাকে বেঁধে রেখে মাথায় শিবাদি ঘৃত প্রয়োগ করতে হবে। এখন আমি কি করবো তাই ব'লে দাও। মা বড় ব্যাকুল হয়েছেন। কিসে এ-সবের উপশম হবে তাই ব'লে দাও।

শ্রীবাস বিচক্ষণ। এই ভাবের ভাবুক। নিমাইয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝেছেন তিনি। হেসে বললেন—নিমাই, তোমার এ বায়ুরোগ বটে! আমি ভিক্ষা চাইছি আমায় এই বায়ুরোগ একটু দাও না। এ বায়ু ব্রহ্মাদি কামনা করেন। এ তোমার কৃষ্ণপ্রেম। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হয়েছে, তুমি মহাভাগ্যবান। তোমার দেহে যে ভক্তির লক্ষণ দেখছি, তা যে মানুষে সম্ভব সে ধারণা আমার ছিল না।

বায়ুরোগ নয় শুনে নিমাই আশ্বস্ত হয়েছেন। শ্রীবাসকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন ক'রে বলেন—অনেকে বলেছে বায়ুরোগ। তুমিও যদি আজ সেই কথাই বলতে, তবে আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম গঙ্গায় দেহ বিসর্জন দিতাম। তুমি এই নূতনভাবে আশ্বাস দিয়ে বড়ই উপকার করলে, পণ্ডিত।

শচীমাতা এঁদের কথাবার্তা সব বুঝতে পারেন না। তবে এইটুকু বোঝেন যে, নিমাই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই আচরণ করেছেন। শ্রীবাস তাঁকে বলেন—আপনি নির্বোধ লোকের কথা শুনে মোটেই বিচলিত হবেন না। নিমাইয়ের বায়ুরোগ-টোগ কিছু নয়, এ অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেম। মানুষে এমন প্রেম সম্ভবে না। আপনি শান্ত থাকুন, অনেক রহস্যময় লীলা দেখতে পাবেন। নিমাইকে বলেন—অন্য লোকে কে কি বলে, তা শোনার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও। এখন এসো, আমার বাড়ীতে আমরা সবাই মিলে সংকীর্তন করবো।

নিমাই সানন্দে রাজী হন। শচীমাতা খুশি হন। যাক্ বায়ুরোগ নয় তো, এই ভালো। সবাই মিলে কীর্তন ক'রে আনন্দ লাভ করুক, যাতে সুখী হয় ; তাই হোক্।

* * * *

নবদ্বীপে নিমাই সুপরিচিত। সবাই জানে নিমাই পরম পণ্ডিত, পরম সুন্দর, পরম উদ্ধত। তাঁর বিস্ময়কর ভাবান্তরের কথা-ও সবাই শুনেছে। কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ বা করেনি। পণ্ডিত সমাজ ভেবেছে নিমাইয়ের মাথা বিগ্‌ড়ে গেলে নবদ্বীপের বড় ক্ষতি; বৈষ্ণবগণ ভেবেছেন নিমাই কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হ'লে নবদ্বীপের পরম লাভ।

কমলাক্ষ মিশ্র নবদ্বীপে বৈষ্ণবপ্রধান। শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাই নামে তিনি সম্মানিত। বৃদ্ধ, ঈশ্বরপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ভক্ত। নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ ছিলেন তাঁর অনুরক্ত সঙ্গী। নিমাইয়ের পরিবর্তনের কথা তিনি শোনেন। কৃষ্ণপ্রেমে নিমাই পাগলপ্রায় হয়েছেন শুনে তিনি উৎফুল্ল হন। তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছে একটি গোপন-কথা ব্যক্ত করেন। গীতার একটি শ্লোকের যথার্থ অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে শ্রীঅদ্বৈত বিষণ্নমনে সারারাত্রি উপবাসী হয়ে ছিলেন। শেষরাত্রিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, এমন সময় একজন সুদর্শন যুবক এসে শ্লোকের ব্যাখ্যা ব'লে দিয়ে বললেন—ওঠ আচার্য, তোমার আহ্বানে আমি এসেছি। তুমি আর দুঃখ করছো কেন? তোমার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে। অচিরে কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ হবে। এই কথা শুনে শ্রীঅদ্বৈত চোখ মেলে চাইলেন, দেখেন বিশ্বম্ভর তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঐ কথা বলছেন। দেখতে দেখতে সোনার কান্তি অদর্শন হ'ল; অপূর্ব পুলকে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে রইলো। সেই থেকে তিনি নিমাইয়ের পথ চেয়ে আছেন। নূতন উদ্যমে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ক'রে চলেছেন; নিত্য তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে পূজা ক'রে বলছেন—তোমাকে আসতে হবে ঠাকুর, জীব উদ্ধার করতে তোমাকে আমার এই ভবনেই আসতে হবে।

* * * *

একদিন নিমাই বাল্যবন্ধু গদাধরের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আচার্য তখন তুলসী-সেবা করছিলেন। আচার্যকে দেখে নিমাই কৃষ্ণ ব'লে হুঙ্কার ক'রে উঠানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দেহ নিস্পন্দ, জ্যোতির্ময়। আচার্য উঠে এসে অপূর্বসুন্দর তরুণের প্রতি অপলকনেত্রে চেয়ে রইলেন। দীর্ঘ পদ্মপলাশ আঁখি মুদিত, কৃষ্ণ কুন্তলদাম ধূলিলুণ্ঠিত; অন্তরের উচ্ছল আনন্দ যেন বিকশিত পুষ্পের লাবণ্যের মতো ফুটে রয়েছে। আচার্য নয়নভরে রূপ দেখছেন আর বিস্মিত হয়ে ভাবছেন—কে এই সর্বসুলক্ষণ হৃদয়-মন-আকর্ষণকারী? ইনি কি আমার আরাধ্য দেবতা

শিখিপুচ্ছধারী বনমালী শ্রীকৃষ্ণ? ইনিই তো আমায় দর্শন দিয়ে বলেছিলেন আমি এসেছি! সেই আরাধনার বস্তু আজ সশরীরে আমার ভবনে উপস্থিত! আচার্যের হৃদয় ভক্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি তাড়াতাড়ি পূজার উপকরণ নিয়ে আসেন। নিমাইয়ের শ্রীপদযুগল গঙ্গাজলে ধুইয়ে দিয়ে তাতে তুলসীচন্দন অর্পণ ক'রে ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সত্তর বছরের বৃদ্ধ, সর্বজনপূজ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তুলসীচন্দন দিয়ে নিমাইয়ের চরণ পূজা করছেন দেখে, গদাধর বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রাণের বন্ধু নিমাইয়ের কোন অকল্যাণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি আচার্যকে বলেন—কি করেন আচার্য, নিমাই আপনার কাছে বালকমাত্র! তার চরণ পূজা করলে তার যে অকল্যাণ হবে! আচার্য বিশ্বাসের হাসি হাসেন, বলেন—নিমাই কেমন বালক, তা অচিরেই দেখতে পাবে।

বাহ্যজ্ঞান লাভ ক'রে নিমাই উঠে আত্মভাব সংবরণ করেন। আচার্যকে প্রণাম ক'রে তিনি বলেন—আপনি ভক্তশিরোমণি, আপনার দর্শনেই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়। আপনাকে এই দেহ সমর্পণ করলেম, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ক'রে দিন।

নিমাই বিনয়ের অবতার। তাঁর বিনয়নম্র বচনে, তাঁর সরল ভক্তিপূর্ণ আচরণে অদ্বৈতের মনে সংশয় জাগে। পূর্বমুহূর্তে যাঁর প্রতি ঈশ্বরজ্ঞানে বিশ্বাস এবং ভক্তি পরিপূর্ণমাত্রায় উথলিয়ে উঠেছিল, পরমুহূর্তে তাঁর দীন ভাব দেখে সে-বিশ্বাসে যেন কিছুটা ভাটা পড়ে। মানব-মনের স্বভাবই এমনি। সংশয় সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাস করে এবং সহজে ছেড়ে যেতে নারাজ। জ্ঞানের আলোকে আর ভক্তির প্লাবনে সংশয় দূর ক'রে মনকে শুভ্র সতেজ করার প্রয়োজন হয়। যিনি বিশ্বাসী, তিনিই ভাগ্যবান।

শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে ভাবেন—তুমিই আমার প্রাণের ঠাকুর কিনা আবার পরীক্ষা করতে হবে। আমি থাকব গিয়ে শান্তিপুরে। সত্যই যদি তুমি আমার প্রভু হও, তবে আমার সন্ধান তোমাকে নিতেই হবে।

## শ্রীবাসের আঙিনায় নাচে গোরারায়

শ্রীবাস পণ্ডিত বিচক্ষণ, বিশ্বাসী, কৃষ্ণপ্রেমিক সজ্জন ব্যক্তি। তাঁরা চার ভাই। সবাই একই পথের রসিক। সানন্দে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীবাস নিমাইকে নিজের বাড়ীতে কীর্তন করতে নিয়ে যান। কৃষ্ণ-কথায় আনন্দ পান এমন কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সেখানে এসে জোটেন—মুরারি গুপ্ত, গদাধর, সদাশিব, কীর্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত। নিমাইয়ের অন্তরে উঠেছে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার, নিজেকে সামলাতে পারেন না। তাঁকে ঘিরে ভক্তবৃন্দ বসেছেন, কিন্তু 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতেই তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে; যা বলতে চান, বলতে পারেন না; মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞান লাভ করলে করুণস্বরে রোদন করতে থাকেন: আমার প্রাণ বাঁচাও ভাই, কৃষ্ণ এনে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করো। সঙ্গীদের কারো গলা জড়িয়ে ধরে বলেন: ভাই, কৃষ্ণ ভজ; কৃষ্ণ আমার বড় দয়াল। এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই। নিমাইয়ের গদগদ ভাব সঙ্গীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। নিমাই-য়ের আবিষ্ট অবস্থা দেখে সবাই আনন্দে উন্মত্ত অধীর।

কতক্ষণ পরে কিছুটা শান্ত হ'লে নিমাই আপ্তগণকে বলেন: আমার দুঃখের কথা কি আর বলবো! পেয়েও আমি আমার-জীবন-কানাইকে হারালেম। ভক্তগণ উৎসুকচোখে গৌরহরিকে ঘিরে বসেন; রহস্যকথা শোনার আগ্রহ তাঁদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

নিমাই শান্ত প্রেমাতুর কণ্ঠে কৃষ্ণ-দর্শনের কাহিনী বলেন: গয়াধাম থেকে ফেরার পথে গৌড়ের নিকট কানাইয়ের নাটশালা নামে এক গ্রাম। সেখানে দেখি তমাল-শ্যামল সুন্দর এক বালক, মাথায় নবগুঞ্জার মালা, মনোহর কুন্তলদাম, তাতে ময়ূরপুচ্ছ; হাতে মোহনবাঁশি, নূপুর রুনুঝুনু বাজে। নীলস্তম্ভ জিনি সুঠাম বাহুতে রত্ন-অলঙ্কার, পরণে পীতবাস, কানে মকরকুণ্ডল, চিত্তহারী কমল-নয়ন। এই ভুবনমোহন শিশু হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে আমার কাছে এলো; আমাকে আলিঙ্গন ক'রে কোন্ দিক দিয়ে লুকাল আর খুঁজে পেলাম না। সেই মধুর স্পর্শে দেহ-মন আমার পুলকিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তাকে আর তো পাই না। তাকে পেয়েও আমি হারিয়েছি, ভাই!

*     *     *     *

ভক্তগণ এমনি অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আকণ্ঠ পান করেন। তাঁরা আনন্দে বিহ্বল। প্রেমানন্দে নিমাই ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত হয়ে পড়েন ; দেহ হয় নিস্পন্দ, অবিরল ধারায় অশ্রু বয় চোখে। কখনো বা সর্বাঙ্গ থরথরি কাঁপতে থাকে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠক্ শব্দ, মনে হয় ভেঙে গেল বুঝি। চেতনা পেয়ে উঠেই 'হা কৃষ্ণ', 'কোথায় কৃষ্ণ', ব'লে আকুল কণ্ঠে রোদন করতে থাকেন। এমনিভাবে রাত্রি অতিবাহিত হয়। দিনের আলো ক্রমে ফুটে ওঠে। বিরহকাতর নিমাইয়ের কাছে মনে হয় সারাটি রজনী বৃথা কেটে গেল। একটা রাত চলে গেল—আমি কৃষ্ণকে পেলাম না—ব'লে নিমাই ভাবের আবেগে অচেতন হয়ে পড়েন। আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদ, নীচে অতল জলধি। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উদ্বেল। নিমাইয়ের হৃদয়-সমুদ্র এমনিভাবে কৃষ্ণকিশোরকে পাওয়ার আকুলতায় উদ্বেলিত।

*     *     *     *

প্রভাতে নিমাই গৃহে ফিরে আসেন। সারাদিন কাটে একই রকম ভাবের ঘোরে। কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম অবস্থা—যেন রাধিকার নব অনুরাগ। প্রাণবল্লভ হৃদয়-মন অধিকার ক'রে থাকে ; তার স্পর্শ পাওয়ার জন্য মন উৎসুক ; তার চিন্তায় আনন্দ, তার নাম মনে হয় সুধামাখা ; তা শুধু শ্রবণই জুড়ায় না, চিত্তে আনে পুলক শিহরণ। সন্ধ্যায় ভক্তগণ সমবেত হন। সুরু হয় কৃষ্ণনাম কীর্তন ঃ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

তালে তালে হাততালি দিয়ে মধুরকণ্ঠে মধুর কৃষ্ণনাম গান। আনন্দে মত্ত হয়ে নিমাই প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন। সেই আনন্দের তরঙ্গে ভক্তগণও বিভোর। নিমাই কখনো নাচতে নাচতে অচেতন হয়ে পড়েন, মনে হয় অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল বুঝি! শচীমাতা শিউরে উঠে সঙ্গীদের বলেন—নিমাইয়ের আমার কোমল শরীর ; ছাখো, ছাখো কি বা হ'ল! তোমরা ওর কাছে কাছে থেকো ; দেখো যেন আঘাত না লাগে। নিমাই তখন স্ববশে নাই। কখন পড়ছেন মূর্ছিত হয়ে, কখন দেহ অসাড়, যেন প্রাণহীন ; আবার পরমুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে উঠে সুরু করছেন উদ্দাম নৃত্য। এমনি কীর্তনে, নৃত্যে, আনন্দে সারারাত কাটে।

এর পর থেকে শ্রীবাসের প্রশস্ত আঙিনায় নিত্য কীর্তন-উৎসব চলে। নিমাই ও তাঁর ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণনামের আনন্দে মত্ত হয়ে নিশি ভোর করেন। ভক্তগণ সন্ধ্যায় এসে সমবেত হন; দেউড়ির দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কীর্তন সুরু করা হয়। সকলের প্রবেশের অধিকার নাই। অনেকে গান-বাজনা শুনে ব্যাপার কি দেখতে আসে কিন্তু দ্বার রুদ্ধ; বাইরে জটলা করে। প্রতি রাত্রিতে চলে এমনি ধরনের সারারাত্রিব্যাপী কীর্তন ও নৃত্য। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়; কারো বা ভয় হয় মুসলমান শাসক বুঝি অল্প কয়েকজনের জন্য সকল হিন্দুর ওপর অত্যাচার চালাবে! কেউ কেউ নিমাই পণ্ডিতের এরূপ পরিবর্তন নিয়ে বিরূপ আলোচনা করে; ভগবানের ভজনা করবে তা বাপু হৈ-হুল্লোড় কেন, নাচা-কাঁদা কেন? সারারাত্রি ধরে আর সকলর শান্তি ভঙ্গ করে কেন? ঈশ্বর ভজনা করতে হয়, জপ-তপ করো না কেন? কিন্তু এ আবার কী ধরনের হুঙ্কার আরাধনা! ভগবান তো এতে চটে যাবেন আর তার ফলে হবে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী।

কেউ কেউ অনুমান করে, দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভক্তরা কীর্তন করে, সকলকে প্রবেশ করতে দেয় না; এর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে: এরা নিশ্চয়ই নেশাভাঙ খায়, নতুবা এত উৎসাহ আসে কোথা থেকে! কেউ কেউ কাজীর কাছে নালিশ করে: হুজুর মালিক, নিমাই পণ্ডিত. শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে ধর্মের নামে অনাচার সুরু করেছে; সনাতন হিন্দুধর্মের দারুন ক্ষতি সাধন করছে; এদের লম্ফঝম্প আর নেশা-কীর্তন বন্ধ ক'রে আমাদের ধর্ম রক্ষা করুন।

তখনকার দিনে উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করা, সঙ্গিদল আর বাদ্যভাণ্ড নিয়ে নেচে গেয়ে ঈশ্বরের নামে মত্ত হওয়া সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। নিমাই ও তাঁর সঙ্গীদের এরূপে নাচা-গাওয়া নানাজনের নানারকম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কেউ বলে পাগলামি, কেউ বলে ভণ্ডামি আর বাড়াবাড়ি; কেউ বা বলে অনাচার। কাজীর কাছে নালিশ হয়েছে এ-কথাও জানাজানি হয়ে গেছে। আরো রটনা হয়েছে যে, গৌড় থেকে নৌকাপথে মুসলমান সৈন্য আসছে; নিমাই পণ্ডিত আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের ধরে নিয়ে যাবে। শ্রীবাস এবং অন্যান্য সঙ্গীরা শুনেছেন এ গুজব। নিমাই-ও শুনেছেন। ভক্তরা কিছুটা চিন্তিত—কি জানি মুসলমানের রাজত্ব, সত্য

হ'তেও পারে। নিমাই পুরুষসিংহ, নির্ভীক। এ-কথা শুনে মন্দ মন্দ হাসেন আর বলেন—বেশ তো! গৌড়ের বাদশা যদি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, সে তো হবে রাজ-সম্মানের ব্যাপার! এ সুযোগ ছাড়ব কেন?

কীর্তন চলতে থাকে আগের মতোই। হয় তো আগের চেয়েও বেশী উদ্যমে। শঙ্কাহরণকে যাঁরা অন্তরে অনুভব করেন তাঁরা কার ভয়ে নিরস্ত হবেন? জলের উচ্ছ্বাস যখন পাহাড় বিদীর্ণ ক'রে আত্ম-প্রকাশ ক'রে বালি মুষ্টি ছিটিয়ে চলে, তখন তা ঠেকানো যায়?

*　　　*　　　*　　　*

**ভগবান্-ভাবের প্রকাশ :**

গয়াধামে যেদিন নিমাই গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করেন, সেদিন থেকে তাঁর জীবনে এক নূতন ভাবের সূত্রপাত—সে হ'ল ভক্তিভাব। প্রেমের উত্তাপে হৃদয় তাঁর গলে গেছে। কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রু বয় চোখে, কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করার কামনায় মন হয়েছে পাগল। তাঁর কাছে জগতে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ নাই, তাঁকে লাভ করা ছাড়া মানুষের অন্য কাম্য কিছু নাই। নব অনুরাগের উন্মাদনায়, বিরহের আতিশয্যে নিমাই কেবল 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' ব'লে আকুল হয়ে রোদন করেন আর ভক্তদের কাছে দীনভাবে নিবেদন করেন—তোমরা আমার কৃষ্ণকে এনে আমার প্রাণ বাঁচাও। এই অবস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রীনিমাইয়ের দেহে এবং আচরণে দেখা গেছে অমানুষিক শক্তির, ঈশ্বর-ভাবের দীপ্ত প্রকাশ। অল্পকালস্থায়ী হ'লেও তা অলৌকিক।

গ্রীষ্মকাল। একদিন শ্রীবাস মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে নিজের বাড়ীতে পূজার ঘরে দরজা দিয়ে ইষ্টদেবতা নৃসিংহদেবের ধ্যান করছেন। এমন সময় বাইরে বন্ধ দরজায় আঘাত—দরজা খোল, দরজা খোল। কার কণ্ঠস্বর বুঝতে না পেরে শ্রীবাস বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কে? বাইরে থেকে উত্তর আসে—'তুমি যার ধ্যান করছো আমি সেই।' কার এমন দুঃসাহস! কিছুটা কৌতুক অনুভব ক'রে শ্রীবাস দরজা খুলে দেন। দেখেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীনিমাই। নিমাইয়ের সর্বদেহ দিয়ে শুভ্র আলোর মতো দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে। শ্রীবাস কিছু বলবার আগেই নিমাই দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ ক'রে বিষ্ণুখট্বা থেকে শালগ্রাম শিলা একপাশে সরিয়ে রেখে নিজে সেই আসনে

উপবেশন করলেন। শ্রীবাস এবার আরো বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে জ্যোতির্ময় শ্রীনিমাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। নিমাই বললেন—আমি এসেছি, তুমি অভিষেকের আয়োজন কর। নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গ দিব্য বিভায় ঝলমল করছে। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সে দীপ্তি। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজও তার কাছে ম্লান, যেন ডে-লাইটের পাশে মাটির প্রদীপের আলো। শ্রীবাস অনুভব করেন তাঁর আরাধ্য দেবতা, বাঞ্ছিত ভগবান তাঁর সম্মুখে সশরীরে বিরাজিত। তিনি প্রথমে দিশেহারা হয়ে যান। পরে অভিষেক করার নির্দেশ পেয়ে উচ্চকণ্ঠে ভাইদের ডাকতে থাকেন, ডাকতে ডাকতে বাইরে যান—ওরে কে আছিস্ শীগ্‌গির আয়; একশোটা কলসী যোগাড় কর; একশো কলসী গঙ্গাজল এনে উঠানে সাজা; ভগবান এসেছেন, তাঁর অভিষেক হবে, আদেশ হয়েছে। শীগ্‌গির সবাই ছোট্।

শ্রীবাসের পরিবারে আনন্দের, কৌতূহলের সাড়া পড়ে যায়। কলসীর যোগাড় হয়। সবাই গঙ্গাজল নিয়ে আসে কলসী-কলসী ক'রে—ঝি, চাকর, অন্তঃপুরের বধূরা পর্যন্ত। আজ তাঁদের কী সৌভাগ্য! প্রভু স্বয়ং তাঁদের সেবা গ্রহণ করবেন। আয়োজন সম্পন্ন হয়। প্রভুকে প্রাঙ্গণে একটি আসনে উপবেশন করিয়ে পরিবারের সকলে মিলে গঙ্গাজল ঢালেন তাঁর মস্তকে। দেহ থেকে যে অপূর্ব তেজ নির্গত হ'তে থাকে তাতে দিবালোক আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেহ-নিঃসৃত জলের সঙ্গে অঙ্গের জ্যোতি মিশে যায়, তাতে যেন স্বর্ণরেণু-মাখানো। স্নানের পর সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহ মার্জনা ক'রে, অতি উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়ে প্রভুকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় পূজাগৃহে। ঘরের দরজা পর্দা দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে গৃহমধ্যস্থ দীপ্ত আলোর রশ্মি যেমন দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি শ্রীনিমাইয়ের দেহ-রশ্মি মধ্যাহ্নকালেও পর্দার ফাঁক দিয়ে, বেড়ার ছিদ্র দিয়ে বাইরে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। ঘরে ভগবান স্ব-মহিমায় বিরাজমান। এই আকস্মিক মহাভাগ্যে শ্রীবাস হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপছেন, এমন সময় শ্রীনিমাইয়ের কণ্ঠ শোনা গেল—শ্রীবাস, তোমার শয়ন-কক্ষে আমার স্থান করো। সেখানে আমি যাব

বিষ্ণুখট্বা সেখানে নিয়ে তার ওপর শুভ্র আসন বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। আসনের ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হ'ল। দরজায় লাগানো হ'ল ঝালর-

যুক্ত পর্দা। প্রভু সেখানে গিয়ে ঘর আলো ক'রে বসলেন। দেবতার গৃহ থেকে এলেন মানুষের গৃহে, যেন দেবলোক থেকে মর্তলোকে। এই ঐশ্বরিক শক্তি-প্রকাশের কথা লোকমুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। নিমাইয়ের ভক্তজন খবর পেয়ে ছুটে আসেন শ্রীবাসের গৃহে। কেউ ফুলের মালা পরিয়ে দেয় ঠাকুরের কণ্ঠে, কেউ চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে সম্মুখে। কেউ স্তব করতে থাকে, কেউ চরণে চন্দন অগুরু লেপন ক'রে দেয়, কেউ বা আনন্দে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। গদাধর চামর নিয়ে ব্যজন করতে থাকেন। সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান শ্রীবাসের ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভু বলেন ঃ জান আমি কে? তোমাদের অন্তরে যিনি বিরাজিত, সর্বজীবের যিনি জীবন, সৎ চিৎ আনন্দময় শক্তি—আমি সেই। জীব উদ্ধারের জন্য এসেছি। এবারে শাস্তি দিয়ে নয়, দুষ্কৃতকে বিনাশ ক'রে নয়, প্রেমে কোমল পবিত্র ক'রে আমার দিকে আকর্ষণ করবো। তোমরা কোন ভয় ক'রো না, যবন নৃপতি তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের যে অবস্থা হয়েছিল, শ্রীবাস-ও কতকটা তেমনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। স্তুতির ভাবে বলেন—শঙ্কাহরণ দয়াময় প্রভু যেখানে, সেখানে আর ভয় কিসের? ঐশী শক্তির কিছুটা চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার উদ্দেশ্যেই প্রভু উচ্চকণ্ঠে ডাকেন—নারায়ণী, নারায়ণী। নারায়ণী শ্রীবাসের ভাইয়ের মেয়ে, বয়স চার বছর। আহ্বান শুনে শিশু সেখানে আসে। প্রভু বলেন—'আমি বর দিলাম, তোমার কৃষ্ণপ্রেম হোক্।' সঙ্গে সঙ্গে হে কৃষ্ণ ব'লে নারায়ণী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ ক'রে কাতরভাবে রোদন করতে থাকে, দেহে দেখা দেয় অশ্রু, কম্প, হর্ষাদি প্রেমভাবের লক্ষণ। ঈষৎ হেসে শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন—যবন রাজা আমার সামনে এলে তার-ও এই অবস্থা হবে। কিন্তু তার এমন ভাগ্য হ'তে দেরী আছে।

ভক্তগণ কীর্তন করার জন্য নানা বিরূপ সমালোচনা আর প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিধর্মী রাজার কাছ থেকে অত্যাচার আশঙ্কা ক'রে তাঁরা শঙ্কিত-ও হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের আশ্বস্ত করবার জন্যই শ্রীভগবানের ক্ষণিকের জন্য বরাভয়দায়ীরূপে প্রকাশ। তাঁর অঙ্গ থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ছিল তা উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ। সূর্যের আলোকে ম্লান করে তার দীপ্তি, কিন্তু চোখ ঝলসায় না। দর্শককে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করে। ঘরের মধ্যে এই রকম দর্শনোৎসব চলেছে, বাইরে থেকে অন্তঃপুরিকারা এই লীলা

দেখবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। নিমাই নিজেই ডেকে বললেন—মহিলাদের এখানে আসতে দাও। এসে দর্শন করুক। অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, নয়ন সার্থক হয়। সেই পরম রমণীয় স্নিগ্ধ বিভামণ্ডিত মূর্তির সম্মুখে তাঁরা অসঙ্কোচে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেন। তাঁদের স্বর্ণালঙ্কার ও বেণীশোভিত মস্তকে চরণ স্থাপন ক'রে নিমাই বর দেন—তোমাদের চিত্ত আমাতে হোক্।

অল্পক্ষণ পরেই এই ঐশ্বরিক আবেশের অবসান হয়। আমি এখন যাই, আবার যথাসময়ে আসব ব'লে নিমাই হুঙ্কার ক'রে বিষ্ণুখট্বা থেকে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরূপ দীপ্তি নিভে গেল, ঘর যেন অন্ধকার হয়ে গেল। নিমাইয়ের দেহ নিস্পন্দ, যেন প্রাণহীন। ভক্তগণ যত্ন-পরিচর্যা ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন। তাঁর যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। লজ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এখানে এলেম কখন, কেমন ক'রে? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? শ্রীবাস ও তাঁর পরিজন ভাবেন তাঁরা ধন্য, ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁরা দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করলেন তাঁরা। তাঁদের গৃহ হ'ল পবিত্র।

* * * *

আর-একদিন এমনি ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ মুরারি গুপ্তের বাড়ীতে। শ্রীবাসের গৃহে ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা হচ্ছিল। বিষ্ণুর বরাহ-রূপ-ধারণের কথা শুনেই তাঁর দিব্য ভাবান্তর হ'ল। ছুটে গেলেন মুরারির গৃহে। 'শূকর, শূকর' ব'লে প্রবেশ করলেন তাঁর পূজাগৃহে। বিস্মিত মুরারি পিছে পিছে গৃহে প্রবেশ ক'রে দেখেন বরাহরূপে গর্জনহুঙ্কার ক'রে ফিরছেন। একটি জলপূর্ণ পাত্র ছিল সম্মুখে। সেটি দাঁতে ধরে তুলে নিয়ে দূরে স্থাপন করলেন। মুরারিকে বললেন—আমি এসেছি। আমি সেই যজ্ঞ-বরাহ, ধরণীর রক্ষাকর্তা। আমার স্তব করো।

ভয়ে কম্পমান মুরারি ভগবানের মহিমা-স্তোত্র কি আবৃত্তি করবেন! বলেন—তোমার মহিমা আমি কি জানি! তোমার প্রতি রোমকূপে লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। বেদ-ও তোমার সর্বতত্ত্ব জানে না। তোমার মহিমা কেবল তুমিই জান; যাকে জানাও সেই জানে।—গলবস্ত্র হয়ে মুরারি বারংবার প্রণাম করতে থাকেন।

নরবরাহ বলেন—তোমার কোন ভয় নাই, মুরারি। আমি বেদের অগোচর। বেদ আমার হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানে না, আকার মানে না। কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদের কুশিক্ষা দিয়ে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করছে। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার ভজনা কর। সংসারে হরিনাম প্রচার করতে আমি এবার এসেছি।

ঈশ্বর-ভাব রহিত হ'লে নিমাই অচেতন হয়ে পড়েন। সংজ্ঞা লাভ ক'রে সলজ্জভাবে মুরারিকে বলেন—আমি এখানে কিভাবে এলাম? আমি তো বিষ্ণুর অবতার-কাহিনী শ্রবণ করছিলেম। এখানে কোন রকম চপলতা করিনি তো? নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে মুরারি ভাবেন, তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যই দয়াময় প্রভুর এই লীলা।

## নিমাই-নিতাই মিলন

বসন্তের আমেজ-মাখা দখিনা বাতাস যখন বইতে থাকে, মধুলোভী মৌমাছির পাখায় জাগে গুঞ্জন। কোকিলের কুহু-ঝঙ্কার সেই পুষ্পবিভোর আনন্দবিহ্বল দিনকে স্বাগত জানায়। বনে বনে জাগে অনাগতের আগমনের সঙ্কেত। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মনেও তেমনি এক নূতন বারতা এসে পৌঁছে—কে যেন আস্‌ছে; বসন্তহিল্লোলের মতোই আনন্দের সুধাভাণ্ড নিয়ে কে যেন আস্‌ছে।

নিমাই তাঁর সঙ্গীদের বলেন—আমার মনে হয় কোন এক মহাপুরুষ আমাদের এখানে আসবেন—শীগ্‌গিরই আসবেন। তার যেন আভাস পাচ্ছি। ভক্তদের উল্লাস বাড়ে—জয় কৃষ্ণকিশোর, আমাদের গোষ্ঠী বাড়ুক। কয়েকদিন পরে নিমাই বলেন—তিনি এসেছেন। আমি এক অদ্ভুত স্বপ্নে দেখেছি তাঁকে। বিশাল দেহ, পরণে নীলবস্ত্র, মাথায় নীলবস্ত্র-জড়ানো, কানে কুণ্ডল; সদাপ্রফুল্ল ভাব। কাঁধে তাঁর এক বিশাল স্তম্ভ, বাম হাতে বেতে-বাঁধা কমণ্ডলু, অত্যন্ত চঞ্চল। আমার বাড়ীর সম্মুখে এসে বলেন—এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের? আমি বলি—তুমি কোন্ মহাজন? তিনি হাসেন, বলেন—আজ আসি ভাই, কাল পরিচয় হবে।

নিমাই কয়েকজন ভক্তকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—তোমরা নগর ঘুরে দেখে এসো তো। আমার মনে হয় হলধর এসেছেন। মুরারি, শ্রীবাস দুজন সঙ্গী নিয়ে আনন্দিত হয়ে ছুটেন মহাপুরুষের সন্ধানে কিন্তু সারা নবদ্বীপ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তাঁরা কোন নবাগত সাধুসন্তকে দেখতে পান না। ফিরে এসে বলেন সে-কথা। নিমাই মৃদু মৃদু হাসেন। বলেন—আচ্ছা আমার সঙ্গে এসো, দেখি কোথায়। কৌতূহলী ভক্তগণ চলেন সঙ্গে সঙ্গে। যেন হারানো জিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে। সোজা চলে যান নন্দন আচার্যের গৃহে। সেখানে আচার্যের বারান্দায় এক দীর্ঘকায়, সুগঠিতদেহ যুবাপুরুষ বসে রয়েছেন। বেশ-ভূষা নিমাই যেমন বর্ণনা করেছেন ঠিক তেমনি। পরিধানে নীলবস্ত্র, মাথায় নীলবস্ত্র-বাঁধা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা, পদ্মচক্ষু, মুখে স্মিত-হাসি। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বছর। ইনি নিত্যানন্দ।

পর্ষদ্‌গণসহ নিমাই প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালেন। কেউ কোন কথা বলেন না। নিতাই পলকহীন দৃষ্টিতে নিমাইয়ের রূপ-সুধা পান করেন। ভাবেন এমন ভুবন-ভোলানো রূপ তো কোথাও দেখিনি, এমন পদ্মপলাশ লোচন, এমন আজানুলম্বিত বাহু, এমন চাঁচর কেশের ঝিকিমিকি! ইনিই কি আমার আরাধ্য বৃন্দাবনবিহারী? গায়ের আসল রঙ বদলিয়ে এমন কাঁচা-সোনা মাখলে কেন?······নিতাই নির্বাক। মনে তাঁর কথার কুসুমকলি ফুটছে। নিমাই ইঙ্গিতে শ্রীবাসকে শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন। শ্রীবাস ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করলেন ঃ

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্তিঃ॥

[ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-রচিত চূড়া, উভয় কর্ণে কর্ণিকার কুসুম, পরিধানে নীল-পীতমিশ্রিত বর্ণের বস্ত্র, কণ্ঠে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরচিত বৈজয়ন্তী মালা। এমনি নটবরবেশে অধরস্পর্শে মধুর বংশীধ্বনি করতে করতে গোপবৃন্দের আনন্দ-সঙ্গীতে মুখরিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। ]

কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী বর্ণনা শোনামাত্র নিতাই বিবশ হয়ে প্রেমানন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দেহ নিস্পন্দ, পুলকে রোমাঞ্চিত।

নিমাইয়ের আদেশে শ্রীবাস ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি ক'রে চলেন। কিছুক্ষণ পরে নিতাই সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উদ্দাম নৃত্য সুরু করেন। কারো সাধ্য হয় না তাঁকে শান্ত করেন। অবশেষে নিমাই বাহু মেলে তাঁকে বক্ষে ধারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সব শান্ত, যেন ঝড় ক্ষান্ত হয়েছে, যেন উত্তাল জলধারা সমুদ্রে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে। বিনয়ের অবতার শ্রীনিমাই বলেন —আমাদের বড় ভাগ্য যে, তোমার মতো এমন কৃষ্ণপ্রেমিকের দর্শন পেলাম। তোমার এই প্রেমভক্তির কণিকা দান ক'রে আমাদের কৃতার্থ করো।

নিত্যানন্দ বলেন—আজ আমার শুভদিন। কুড়ি বছর ধরে ভারত-তীর্থে কৃষ্ণের সন্ধান ক'রে ফিরেছি। সব জায়গায় দেখেছি আসন শূন্য, কৃষ্ণ নাই। ভাল লোকে বললেন, কৃষ্ণ এবার বৃন্দাবনে নয়, বাংলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুনলেম নবদ্বীপে বড় সংকীর্তন সুরু হয়েছে, তাতে ভগবান যোগ দিয়েছেন,

ভাবের নৃত্য আর আনন্দ চলেছে। পাপীজন উদ্ধার পাবে এই ভরসায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছি নদীয়ায়। দেখি কৃষ্ণ কেমন দয়াল।

* * * *

নিতাইয়ের আবির্ভাব রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে। পিতা হাড়াই পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান, স্নেহশীল ব্রাহ্মণ। জননী পদ্মাবতী স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণী। পুত্র কুবেরের বয়স তখন দশ-এগার বছর। এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ীতে অতিথি হয়ে রাত্রি বাস ক'রে যাবার সময় এই সুদর্শন পুত্রকে ভিক্ষা চেয়ে নেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুবের সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। বলিষ্ঠ অথচ শিশুর মতো সরল, সদাচঞ্চল অথচ ভক্তিতে শান্ত, শক্তিমান অথচ কোমল এই কুবের হলেন সদাপ্রফুল্ল, আপনভোলা নিত্যানন্দ। সংসার-বিরাগী, দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী। সাধুসজ্জনের কাছে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের প্রকাশ ও কীর্তন প্রবর্তনের কথা শুনে বহু আশা নিয়ে ঈশ্বর-দর্শনে এসেছেন।

* * * *

প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়কে চিনেছেন। যেন কতকালের পরিচিত। নূতন পরিবেশে, নূতন বেশে নূতন ক'রে দেখা। উভয়ের মধ্যে কথা হয় ঠারে-ঠারে, আকারে-ইঙ্গিতে। সঙ্গীরা তাঁদের এই ভাব-বিনিময়ের ভাষা বুঝতে পারেন না, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। প্রথমে নিতাই নিমাইকে দেখে বিস্মিত, মুগ্ধ, পুলকিত, উল্লসিত। যেন দুর্গম পর্বত-আরোহী কাম্য উৎসের সন্ধান পেয়েছে, যেন মরুযাত্রী ছায়াশীতল স্নিগ্ধবারিপূর্ণ মরূদ্যানের সন্ধান পেয়েছে। নিতাই বুঝি ঠারে জিজ্ঞাসা করেন—কালো অঙ্গ কোথায় লুকালে? এবার যে দেখি রাধার অঙ্গ-সুষমা নিজের অঙ্গে মেখেছ! ধড়াচূড়া কই? মোহনবংশী কই? এবারে কেমন লীলা? হয়ত ঠারে উত্তর পান—ক্রমে দেখতে পাবে।

নিমাই নিতাইকে বলেন—কাল পূর্ণিমা। তোমার ব্যাসপূজা কোন্ বাড়ীতে হবে? নিতাই শ্রীবাসকে দেখিয়ে বলেন—এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। শ্রীবাস সানন্দে রাজী হন। বলেন—ঘৃত, তণ্ডুলাদি যা লাগবে তা গৃহেই আছে। পূজাবিধির বই নাই, তা একখানা যোগাড় ক'রে নেব। তারপর সবাই শ্রীবাসের বাড়ীতে গিয়ে উপনীত হন। প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে আঙিনায় সুরু হয় কীর্তন ও ভাবের নৃত্য। গৌর-নিতাই হাত-ধরাধরি ক'রে মধুর নৃত্য করতে থাকেন। কখনো আনন্দের আতিশয্যে নিতাই জোড়া-পায়ে

লাফ দিতে থাকেন। পদভরে গৃহ যেন টলমল করে। একবার নিমাইয়ের বলরাম-ভাবের আবেশ হয়। উচ্চকণ্ঠে আদেশ করতে থাকেন—মদ আনো, মদ আনো। শ্রীবাস ব্যাপারটি বুঝতে পারেন, বুদ্ধিও খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একপাত্র গঙ্গাজল নিয়ে তুলে দেন নিমাইয়ের হাতে। আবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান-আবেশ হয়, নাড়া, নাড়া ব'লে হুঙ্কার দিতে থাকেন। আমার নাড়া কোথায়? এই নাড়া কে, ভক্তগণ বুঝতে পারেন না। শ্রীবাস করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু, নাড়া কাকে বলছেন?

—নাড়া আমার অদ্বৈত গোঁসাই, তার আরাধনায় হুঙ্কারে গর্জনে আমার আগমন। এবার দেখাবো নূতন লীলা, প্রেমের বন্যা। সে কোথায়?

আনন্দে সকলের মন পরিপূর্ণ। হঠাৎ নিমাইয়ের আবেশ ছুটে যায়। লজ্জিতভাবে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করেন—পণ্ডিত, আমি কি প্রলাপ বলছিলাম? ভক্তগণ নিমাইয়ের এমন আচরণের সঙ্গে অপরিচিত নন। তাঁদের কাছে এটি হ'ল আলো-ছায়ার খেলা। গৌর-নিতাইয়ের মিলনের প্রথম আনন্দ-হিল্লোলে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের মনে কি ভাবের উদয় হ'ল কে জানে। কীর্তন-শেষে তিনি নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু নিজেই হুঙ্কার ক'রে ভেঙে ফেললেন। সন্ন্যাসীর এই প্রতীক-চিহ্ন নিয়ে তিনি ভারতবর্ষময় ভ্রমণ করেছেন। শেষে কি অভীষ্ট লাভের পর এগুলো নিরর্থক মনে হ'ল? এদিন হ'তে তাঁর জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত। প্রভাতে খবর পেয়ে নিমাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলেন নিতাইয়ের কাছে। নিজহাতে তিনি সেগুলো গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। নিতাইয়ের বাহু এখন মুক্ত, কীর্তনের আনন্দে আর নিমাইয়ের সেবায় অংশ নেবার জন্য তা মুক্ত।

### নিতাই-এর ব্যাসপূজা ঃ

শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজার আয়োজন হয়েছে কিন্তু পূজক উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করতে থাকেন। শ্রীবাস পূজা সম্পন্ন ক'রে মালা নিবেদন করতে বলেন কিন্তু নিতাই মালা হাতে নিয়ে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করেন। শ্রীবাস বলেন—বলো·নমো ব্যাসায়; নিতাই বলেন—হুঁ।

—হুঁ কি! বলো নমো ব্যাসায়, ব'লে মালা প্রদান করো। কিন্তু সে-কথা নিতাইয়ের কানে যায় না। অগত্যা শ্রীবাস ডাকেন নিমাইকে। প্রভু একবার এদিকে আস্‌তে আজ্ঞা হয়। দেখুন ইনি পূজায় মন দিচ্ছেন না।

নিমাই এলেন। ব্যাপার কি? নিমাই কাছে আসতেই নিতাই যেন যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁকে কাছে পেয়েছেন। তাঁর গলায় পূজার মালা দিলেন পরিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। নিতাই দেখেন, নিমাই যড়ভুজ মুর্তিতে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল ও মুষলধারী অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তি—একই দেহে বিষ্ণু ও বলরামের রূপ। এই অপূর্বদর্শন মূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে পুলকে নিতাই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বিষম ভারী বোঝা বহন করা যেমন মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, বিপুল আনন্দ সুস্থচিত্তে বহন করাও একান্ত দুরূহ। আত্মভাব সংহত ক'রে নিমাই নিতাইয়ের নিস্পন্দ দেহে কোমল শ্রীহস্ত বুলিয়ে দেন। শ্রীপাদ সংজ্ঞালাভ ক'রেও নিশ্চল হয়ে থাকেন। নিমাই বলেন—তোমার সকল বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে। এখন ওঠো। তোমার কাজ বাকি রয়েছে—জীবর মধ্যে প্রেম বিলাও, জীবকে ধন্য করো।

* * * *

উৎসব-শেষে নিমাই নিতাইকে নিয়ে যান নিজগৃহে। মাকে ডেকে বলেন—দ্যাখো তো মা, কাকে নিয়ে এসেছি। মা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি। মনের মধ্যে পুত্রস্নেহ জাগে এঁকে দেখে। ভাবেন, আমার বিশ্বরূপ থাকলে হয়তো এমনিই হ'ত। জিজ্ঞাসা করেন—কে বাবা? নিমাই মৃদু মৃদু হাসেন—আমার ভাই, তোমার ছেলে! ব্যগ্রকণ্ঠে মা শুধান—একি সত্যি?

—নিমাই বলছে, তুমি আমার বিশ্বরূপ। একি সত্যি, বাবা? মায়ের চোখ ছলছল করে। নিতাই বলেন, হ্যাঁ মা। মা ভাবেন বিশ্বরূপ এতদিন পরে মা আর ভাইয়ের কাছে ফিরে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিতাইকে কোলে তুলে নেন আর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। হারানো ছেলে ফিরে পাওয়ায় আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠেছে তাঁর মনে; সেই সঙ্গে স্বামীর কথাও মনে পড়ছে। তিনি নাই; থাকলে আজ কি আনন্দই না হ'ত! পরে বলছেন—যাক্ বাবা, আমার দুশ্চিন্তা গেল। এতদিন নিমাই আমার অসহায় ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন কি হয়। এখন থেকে তুমি তোমার ক্ষ্যাপা ছোট ভাইটির দেখাশোনার ভার নাও। এখন থেকে আমার চিন্তা দূর হ'ল।

# অদ্বৈতের বাসনা পূরণ

অদ্বৈত গোস্বামী একদিন নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ দেখেছিলেন তাঁর নিজগৃহে। মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ঈশ্বরের লীলার আভাস পেয়েছিলেন নিমাইয়ের আচরণে। তাই সেদিন গঙ্গাজলে তাঁর চরণ ধৌত ক'রে তুলসীচন্দন দিয়ে সেই রাতুল পদযুগল পূজা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষণিক পরেই তাঁর মন সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তিনি পূর্ণ লীলা-প্রকাশের অপেক্ষায় শান্তিপুরে গিয়ে বাস করছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঠাকুর যখন স্ব-মহিমায় আত্ম-প্রকাশ করবেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই আহ্বান করবেন তিনি।

* * * *

একদিন নিমাই রয়েছেন শ্রীবাসের ভবনে। ভগবান-ভাবের আবেশ হয়েছে। তখনকার পরিবর্তিত হাবভাব, জ্যোতিপুঞ্জ অবয়ব দেখেই সবাই বুঝতে পারেন নিমাই তখন সাধারণ নিমাই নন। বিষ্ণুখট্বায় গিয়ে আরোহণ করেন তিনি; নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধারণ করেন, শ্রীবাস জোড়হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে বলেন—রামাই, তুমি এখুনি শান্তিপুরে যাও, নাড়াকে ব'লো—তুমি যার জন্য আরাধনা, হুঙ্কার গর্জন ক্রন্দন করেছ সেই আমি এসেছি। পূজার সামগ্রী নিয়ে সস্ত্রীক শীঘ্র চলে এস। আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।

লীলাময় প্রভুর এই অপূর্ব বারতা নিয়ে রামাই ছুটে চলেন শান্তিপুর অভিমুখে। অন্তর তাঁর ভক্তি আর আনন্দে পরিপূর্ণ। জয় ভকতবৎসল প্রভু। তোমার আপন-জনকে তুমি এমনিভাবে কাছে আহ্বান করো! শ্রীরাম অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হলেন। তাঁর মনের সন্তোষ চোখে-মুখে প্রকাশমান। অদ্বৈত বলেন—রামাই পণ্ডিত যেন কোন সুখবর নিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে। কি, আমার ডাক পড়েছে বুঝি? রামাই বলেন—আপনি তো সবই জানেন। এখন শীঘ্র চলুন, গিয়ে দর্শন করবেন।

অদ্বৈতের মনে সংশয় জেগে ওঠে। বলেন—মানুষের ভিতর কোথায় ভগবান এসেছেন? নদীয়ায় যে অবতার হবে তার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? রামাই সরল, ভক্তিমান। তিনি অদ্বৈতের চরিত্র জানেন; কোন উত্তর

করেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসেন। পরমুহূর্তে আবার অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করেন —আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়েছে ?

—যার জন্য আপনি এত আরাধনা করেছেন, এত উপবাস করেছেন, নয়ন-জলে মাটি ভিজিয়েছেন, সেই আরাধনার বস্তু এসেছেন। আপনি পূজার উপচার নিয়ে সস্ত্রীক গিয়ে তাঁর বন্দনা করুন। আপনার প্রতি এই আদেশ।

—'স্বয়ং প্রভু আমায় আহ্বান জানিয়েছেন, ঠাকুর আমার বড় দয়াল' ব'লে আচার্য আনন্দে দু'হাত তুলে ক্রন্দন করতে থাকেন। আনন্দের সাড়া পড়ে যায় পরিবারের সকলের অন্তরে। আচার্যের এতদিনের সাধনা কি আজ সফল হ'তে চলেছে ? তিনি তাঁর পত্নীকে পূজার সামগ্রী যোগাড় ক'রে নিতে বলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী গন্ধমাল্য, ধূপ, বস্ত্র, দধি সর ক্ষীর ননী প্রভৃতি পূজা ও ভোগের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে হরষিত মনে যাত্রা করলেন স্বামীর সঙ্গে। অদ্বৈত আনন্দে উৎফুল্ল। রামাইকে বলেন— যদি ভাগ্যে থাকে তবে আমার প্রভুকে নয়নভরে দেখব। পরমুহূর্তে আবার তাঁর প্রভুকে যাচাই ক'রে, পরখ ক'রে দেখার বাসনা জাগে মনে। রামাইকে বলেন—আমরা নন্দন আচার্যের বাড়ীতে লুকিয়ে থাকবো, তুমি গিয়ে বলবে— আচার্য এলেন না। দেখি প্রভু কি বলেন। আর দেখা হ'লে প্রভু যদি স্বেচ্ছায় আমার মাথায় চরণ তুলে দেন, তবে বুঝবো তিনিই আমার প্রভু। সাবধান রামাই, এ-সব কথা কিছুই তুমি বলবে না, সব গোপন রাখবে। প্রভুকে আমি পরীক্ষা করবো।

রামাই মনে মনে হাসেন। বলেন—আপনি যা আজ্ঞা করেন তেমনি হবে।

* * * *

এদিকে রামাই এসে গৃহে পৌঁছবার আগেই নিমাই বলেন—ঐ নাড়া আসে, ঐ নাড়া আসে। সে এখানে না এসে নন্দন আচার্যের বাড়ীতে লুকিয়ে রয়েছে। সে আমায় পরীক্ষা করবে।···

এমন সময় রামাই গৃহে ফেরেন। তাঁকে প্রভু বলেন—এখুনি যাও ; আচার্যকে ব'লো, আমি প্রসন্নমুখে আদেশ করছি সস্ত্রীক এসে শীঘ্র আমার বন্দনা করুক।······রামাই আবার ছুটেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। গিয়ে আচার্যকে বলেন —প্রভুর অবিদিত কিছু নাই। আমি কিছু বলবার আগেই আবার এখানে এসে সংবাদ দেবার আদেশ হয়েছে আমার ওপর। শীঘ্র চলুন।

আচার্য এবার হরষিত মনে শ্রীবাসের গৃহে এসে উপস্থিত হন। ভাবছেন—প্রভু অন্তর্যামী। আমার অভিলাষ কি অপূর্ণ থাকবে? দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল। দূর থেকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে করতে তিনি দিব্যমহিমায় বিরাজমান প্রভুর সম্মুখে এসে উপনীত হলেন।

শুভ্র তেজে ঝলমল জ্যোতির্ময় মূর্তির সম্মুখে এসে আচার্যের চোখ ঝলসে গেল। তিনি কেমন দিশেহারা, বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনের সংশয়-অন্ধকার দূর করার জন্য উজ্জ্বল বিভূতি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। তিনি দেখেন কনকসুন্দর কলেবর, প্রসন্নোজ্জ্বল দীপ্তি প্রভু সিংহাসনে আসীন। কনকস্তম্ভের মতো সুশ্রী সুবলিত বাহু, বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি; মকরকুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালায় শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। দেহনির্গত স্নিগ্ধছটায় গৃহ পরিপূরিত। সেই আলোকমণ্ডলের মধ্যে দেখেন দিব্যদর্শন মূর্তি—কেউ পদসেবা করেন, কেউ বা স্তব ও বন্দনায় রত। হতবাক্ আচার্যকে আশ্বস্ত ক'রে, তাঁর ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভু বলেন—তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্যই আমার আগমন। জীবের দুঃখ সহ করতে না পেরে, সবাকার উদ্ধারের জন্য স্তবস্তুতি প্রেমের আকর্ষণে আমাকে অবতীর্ণ করিয়েছ। চতুর্দিকে যা সব দেখতে পাচ্ছ তারা আমারই গণ, লীলাসহচর।

নিমাইয়ের মহাঠাকুরাল দেখে আচার্য আত্মহারা হয়ে পড়েন। মহা-সম্ভ্রমে তিনি বারংবার প্রণাম করতে থাকেন। সুবাসিত জলে চরণপদ্ম ধৌত ক'রে, সচন্দন তুলসীমঞ্জরী প্রভুর চরণে অর্পণ ক'রে কৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে প্রণিপাত করেন ঃ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

তারপর সুরু হয় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-স্তোত্র। নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আচার্য শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন ক'রে প্রভুর পদমূলে দীঘল হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করেন। সেই মুহূর্তে অন্তর্যামী প্রভু অদ্বৈতের বাসনা পূরণ ক'রে তাঁর শুভ্রকেশমণ্ডিত মস্তকে চরণ স্থাপন করলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরি হরি ব'লে জয়ধ্বনি ক'রে ওঠেন। অদ্বৈত ভাবেন ধন্য হ'ল তাঁর জীবন, পুণ্য হ'ল তাঁর দেহ।

প্রভু বলেন—আচার্য, তোমার অভিলাষ তো পূর্ণ হয়েছে। এখন ওঠ, প্রেমানন্দে নৃত্য ক'রে সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করো। মন্ত্রমুগ্ধবৎ কুতূহলী আচার্য

উঠে ঘুরে ঘুরে বাহু তুলে, অঙ্গ দুলিয়ে নৃত্য করতে থাকেন। শ্রীবাসের গৃহে আনন্দের মহোৎসব পড়ে যায়। অবশেষে ভগবান-আবেশে নিমাই অদ্বৈতের গলায় নিজের মালা পরিয়ে দেন এবং বলেন—আচার্য, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো; তোমার যা অভিরুচি তাই প্রার্থনা করো। বাসনা পূর্ণ হবে।

অদ্বৈত কোন উত্তর করেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রভু আবার বলেন—তোমার যা অভিলাষ তাই প্রার্থনা কর। আচার্য উত্তর করেন—প্রভু, আমার সকল অভিলাষ পূরণ হয়েছে; তোমার অবতার প্রত্যক্ষ করলেম, তোমার সম্মুখে নৃত্য করলেম—আমার আর কোন কামনা বাসনা অপূর্ণ নাই।

শ্রীবিশ্বম্ভর বলেন—তোমার জন্যই আমার প্রকাশ। ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করবো, প্রেমভক্তি বিতরণ করবো।

শ্রীঅদ্বৈত তখন বলেন—তবে প্রভু এই প্রার্থনা করি, তুমি যে ভক্তি বিতরণ করবে তা যেন মূর্খ, নীচ, পতিত, চণ্ডাল সকলকেই দিয়ো। সকলেই যেন তোমার কৃপার পাত্র হয়।

অদ্বৈতের প্রার্থনা শুনে প্রভু আনন্দে হুঙ্কার করেন, বলেন—তাই হবে। সমবেত ভক্তজন উল্লাসে জয়ধ্বনি ক'রে ওঠেন।

# সাত-প্রহরিয়া ভাব

স্বাভাবিক অবস্থায় নিমাই একান্ত বিনয়ী ; ভক্তিরসে ডগমগ। সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্তনে তাঁর আনন্দ। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথায় তাঁর রুচি নাই। কিন্তু আবেশ হ'লে তখন নিমাইয়ের আচরণে আসে পরিবর্তন ; দেহজ্যোতি হয় উজ্জ্বলতর। তখন তিনি যেন প্রভু, অন্য সবাই সেবক। তিনি দাতা, অন্য সবাই কৃপাপ্রার্থী। আবেশ শেষ হ'লে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। আবেশিত অবস্থার কথা স্পষ্ট মনে থাকে না। হয়ত তাঁর নিজের কাছে তা স্বপ্ন বা তন্দ্রার ঘোরে প্রলাপ ব'লে মনে হয়।

এ পর্যন্ত নিমাইয়ের যে কয়েক বার ঈশ্বর-আবেশ হয়েছে তা অল্পকাল-স্থায়ী। শ্রীবাসের গৃহে একদিন এর ব্যতিক্রম হ'ল। সকালবেলা স্নান আহ্নিকের পর নিমাই শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। ভক্তগণ একে একে এসেছেন, কৃষ্ণকথা আলোচনা চলেছে। এমন সময় সঙ্গিগণ নিমাইয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন ; দেখেই বুঝলেন তিনি স্ববশে নাই। ভক্তবৃন্দ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলেন। নিমাই ধীরে ধীরে গিয়ে বিষ্ণুখট্বায় উপবেশন করলেন আর আদেশ দিলেন—আমার অভিষেকের আয়োজন কর।······অঙ্গের জ্যোতিতে ঘর ঝলমল করে। দরজায় পর্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়। নিতাই মস্তকে ছত্র ধারণ করেন।

শ্রীবাসের পরিবারের লোকজন—ঝি-চাকর এমন কি অন্তঃপুরিকাগণ পর্যন্ত মিলে কলসী কলসী গঙ্গাজল নিয়ে আসে ; নিমাইকে উঠানে একটি উত্তম আসনে উপবেশন করিয়ে তাঁকে স্নান করানো হ'ল ; উত্তম বস্ত্রে অঙ্গ মার্জনা ক'রে, উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়ে তাঁকে আবার নেওয়া হ'ল পূজা-গৃহে। ফুল, মালা, তুলসী-চন্দন দিয়ে ভক্তগণ পূজা করলেন ; পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে আরতি করা হ'ল। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর ভুবনমোহন রূপে তাঁদের সম্মুখে বিরাজিত ; তাঁর সুবর্ণকান্তি দেহের ছটায়, নীলপদ্ম-আঁখির স্মিত আলোকে প্রসন্ন-স্নিগ্ধ মাধুরী।

ভক্তবৎসল ঠাকুর ভক্তদের আপ্যায়িত করার জন্য বলেন—ভোগের সামগ্রী কি আছে, আনো। ভক্তগণ দেখেন প্রভু যেন আপনজন, তাঁদের সেবা গ্রহণ করার জন্য দিব্যমহিমায় সম্মুখে বিরাজিত। তাঁরা আনন্দিত হয়ে ভোগের জিনিস সংগ্রহ ক'রে আনেন—চিনি-মিশ্রিত ডাবের জল, দই, সন্দেশ, ক্ষীর ননী, কাঁদি কাঁদি কলা। সবাই নিজহাতে ঠাকুরের হাতে তুলে দিতে চায়, নিজের মনের মতো সামগ্রী প্রিয় প্রভুকে ভোজন করিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চায়। ঠাকুর একের নৈবেদ্য গ্রহণ করলে অন্য সকলের উপহারও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়; কাউকে তিনি বিফল নিরাশ করতে চান না। এক-একজন আবার শুধু একবার নৈবেদ্য দিয়েই তৃপ্ত হয় না, বারে বারে নানা জিনিস নিয়ে আসে। যে যত জিনিস আনে ততই সবই প্রভু গ্রহণ করেন; ভক্তদের মনোরথ পূরণ ক'রে সবই তিনি নিঃশেষে ভোজন করেন। সেদিন তিনি বিশ্বম্ভর।

এর পর প্রভু ভক্তদের কারো কারো একান্ত গোপন দু'একটি ক'রে ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা যে তাঁর প্রিয়, তাঁর দৃষ্টির বাইরে নন এ-কথা তাঁরা অনুভব করেন। প্রভু শ্রীবাসকে বলেন—দেবানন্দের গৃহে ভাগবত পাঠ শুনে তোমার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রব হ'ল। বিহ্বল হয়ে ভূমিতে পড়ে তুমি কাঁদতে লাগলে কিন্তু দেবানন্দের অবোধ শিষ্যগণ তোমার ভাব-অনুরাগের মর্ম না বুঝে তুমি পাঠে বিঘ্ন করছো মনে ক'রে তোমাকে ধরাধরি ক'রে দেবানন্দের বাড়ীর বাইরে ফেলে রেখে দেয়। সেদিন তোমার মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলাম আমি।···গঙ্গাদাসকে দেখে বলেন—সেদিন রাজভয়ে অন্ধকার রাত্রিতে সপরিবারে পালিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু নদীর ঘাটে নৌকা নাই। কেমন ক'রে পার হবে ভেবে আকুল হয়ে ভাবতে লাগলে, চোখের সম্মুখে পরিজনদের লাঞ্ছনা দেখতে হবে! তার চেয়ে নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দেব। তখন আমি নৌকা নিয়ে খেয়ারির রূপে এসে পরিবার-সহ তোমায় পার করি। তুমি সেদিন একটি টাকা আর একজোড়া বস্ত্র দিয়েছিলে আমার পারিশ্রমিক।···

ভক্তগণ অনুভব করেন প্রভু অন্তর্যামী, লজ্জানিবারণ, বাঞ্ছাপূর্ণকারী। আনন্দে, উল্লাসে, ভক্তিতে অভিভূত হয়ে কেউ নৃত্যগীত, কেউ স্তবপাঠ, কেউ পুষ্পচন্দনে অর্চনা, কেউ বা ভূমিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে থাকেন। সারাদিন এবং প্রায় সারারাত্রি চলে এই একই ভাবে। প্রভু তাঁর দীনভক্ত

শ্রীধরকে স্মরণ ক'রে বলেন—শ্রীধরকে নিয়ে এসো আমার কাছে। গভীর রাত্রি তখন। শ্রীধর নিজগৃহে একাকী কৃষ্ণনাম করছিলেন। কয়েকজন ভক্ত দ্রুত গিয়ে তাঁকে প্রভুর আহ্বান জানালেন। ভক্তিতে গদগদ, প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ শ্রীধর এসে উপনীত হলেন প্রভুর সম্মুখে। প্রভুর মোহনীয় জ্যোতি-বিভাসিত রূপ, নীলপদ্মদল-আঁখির স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি দেখে তিনি জীবন সার্থক মনে করেন; তাঁর উপাস্য দেবতা যেন তাঁর সম্মুখে আনন্দঘন মূর্তিতে বিরাজিত।

প্রভু স্মিতহাস্যে শ্রীধরকে বলেন—তোমার সেবা আমি অনেক গ্রহণ করেছি। এবার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো। তোমার যেমন অভিলাষ তেমন বর প্রার্থনা কর; তোমায় আমি অষ্টসিদ্ধি দেব। শ্রীধর কর-জোড়ে বলেন—অষ্টসিদ্ধি দিয়ে আমি কি করবো, প্রভু! আমি ধনদৌলত চাইনে, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি চাইনে। তুমি দয়া ক'রে আমার অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করো, এই আমার প্রার্থনা।...খোলা-বেচা শ্রীধর। দীনদরিদ্র ব্যক্তি। কলাপাতা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রি ক'রে সামান্য উপার্জন করেন। সত্যবাদী, নির্লোভ। সৎভাবে সামান্য আয় করেন, তাতেই সন্তুষ্ট। নিমাই তাঁকে ভালভাবে জানেন। তাঁর সঙ্গে কৌতুক ক'রে থোড়-মোচা আদায় করেছেন। ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশ ক'রে তিনি যখন শ্রীধরকে ধনদৌলত দিনে চান, একনিষ্ঠ ভক্ত মোহমুক্ত ব্যক্তির মতো ভগবানকেই চান, সম্পদ চান না। উচ্চপদ, প্রতিষ্ঠা কামনা ক'রে ধ্রুব তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান যখন বর দিতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন—কাচখণ্ড খোঁজ করতে করতে দিব্যরত্ন লাভ করেছি; তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর কোন বর চাই নে।...মানুষ পরম প্রেয়কে যখন পায় তখন অন্য সব কামনা-বাসনার ধন ম্লান হয়ে যায় তার মনের কাছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'তে পারতেন কিন্তু ঈশ্বর-লাভে তা সহায়ক হবে না শুনে তার প্রতি তিনি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ঠাকুরের আদেশে সর্বার্থদায়িনী মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করতে যেয়ে বারে-বারেই নরেন জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য কামনা করেছিলেন—অর্থ-সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা নয়।

* * * *

মানুষ ঈশ্বর-ভাবের প্রকাশ দেখার কামনা করে সত্যি, কিন্তু অসাধারণ কিছু বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। তার দেহের সহন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, মানসিক উন্মাদনা তা যতই আনন্দের হোক না কেন, তার মনকে ক্লান্ত শ্রান্ত করে। সে তখন সহজ, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে চায়। মহাধনুর্ধর অর্জুন পর্যন্ত কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-প্রদর্শনের লীলা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেননি।......

ঈশ্বর-ভাবে অপূর্ব দিব্যজ্যোতি বিকাশ ক'রে নিমাই শ্রীবাসের ঘর আলো ক'রে বিরাজ করেন। সাতপ্রহরব্যাপী এই লীলা দর্শন ক'রে ভক্তগণ তীব্র আনন্দে, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের অবস্থা উপলব্ধি ক'রে, তাঁদের প্রার্থনায় প্রভু ভাব-সম্বরণ করেন। প্রভাত সময়ে তিনি হুঙ্কার ক'রে বিষ্ণুখট্বা থেকে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। দেহ প্রাণহীন, নিস্পন্দ, নিশ্বাস পর্যন্ত বয় না। অঙ্গের সে দিব্যজ্যোতি নিবে গেছে। পরিশ্রান্ত ভক্তগণ তাঁর সেবাযত্ন করেন; চোখে মুখে জলের ছিটা, পাখার বাতাস দিতে থাকেন। বহুক্ষণ চলে যায় কিন্তু প্রাণের কোন চিহ্ন ফিরে আসে না। সবাই বিমূঢ়, শঙ্কিত। ভাবেন প্রভু বুঝি এখানেই তাঁর লীলা শেষ করলেন। অবশেষে জীবনের চিহ্নবিহীন কিন্তু স্বভাবসুন্দর দেহ ঘিরে সকলে নীরবে বসে রইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা দুপুর হ'ল, নিমাইয়ের দেহ একই অবস্থায় শায়িত রয়েছে স্থির প্রশান্ত, প্রাণের চিহ্নবিবর্জিত। ভক্তগণ সঙ্কল্প করেছেন প্রভু যদি জেগে না ওঠেন, তবে তাঁরাও প্রাণত্যাগ করবেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা যাবৎ প্রভু মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন; শিষ্যগণ নির্বাক্, ম্রিয়মাণ। একজন মৃদুকণ্ঠে বললেন —আমরা কিছুক্ষণ কীর্তন ক'রে দেখি না। ভাবে অচেতন হ'লে আমরা তো কীর্তন শুনিয়ে প্রভুকে আগেও জাগিয়ে তুলেছি।

ভক্তগণ নিমাইকে ঘিরে বসে শান্তকণ্ঠে কীর্তন সুরু করেন। নিরাশায় মন আচ্ছন্ন। ক্রমে কীর্তনের আনন্দ জমে ওঠে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হয়। অকস্মাৎ একজনের নজরে পড়ে নিমাইয়ের দেহে যেন পুলক-শিহরণের অতি ক্ষীণ চিহ্ন দেখা যায়। এ কি সত্যি? না, চোখের ভ্রম, মনের মরীচিকা? কীর্তনে উৎসাহ আসে। ক্রমে দেখা যায় সত্যই দেহে পুলক-সঞ্চার হয়েছে, প্রাণের অরুণাভাস দেখা দিয়েছে। ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে কীর্তনে মেতে ওঠেন; মহিলাগণ হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিতে গৃহ মুখরিত ক'রে তোলেন। সুরু হয় আনন্দ-হুঙ্কার, উল্লাস-নৃত্য। গভীর

নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন, তেমনি ভাবে নিমাই উঠে বসেন, দেখেন অনেক বেলা হয়েছে। সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন—ব্যাপার কী? আমি কী করছিলেম?

ভক্তগণ প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। সবাই মৃদু মৃদু হাসেন। শ্রীবাস স্মিত-হাস্যে বলেন—ধরা পড়েছ এবার, আর ফাঁকি চলবে না। নিমাই তাঁর আবেশ-সময়কার ঘটনা কিছুই জানেন না। কাজেই কিছুই বুঝতে পারেন না। বলেন—কিসের ফাঁকি?

# জগাই-মাধাই

শ্রীনিমাই তাঁর ভক্তদের কাছে প্রেমভক্তির উৎস, আনন্দের নির্ঝর, শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু। তাঁকে ঘিরে নিত্য কীর্তনোৎসব চলে। যে সহজ সরল ঈশ্বর আরাধনা ভক্তদের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে, তাই প্রচার করতে হবে নদীয়ার ঘরে ঘরে। নিমাইয়ের মনে এই বাসনা হ'ল। নিতাই আর হরিদাসকে দিলেন এই নামকীর্তন প্রচারের ভার। তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে সংসারী মানুষকে বলবেন—ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ—এই আমাদের ভিক্ষা। প্রভুর আদেশে ভক্ত দুজন এই অদ্ভুত প্রার্থনা জানাতে যান শহরের ঘরে ঘরে। হরিদাস শান্ত, গভীর, আত্মস্থ। নিত্যানন্দ চঞ্চল, শিশুর মতো কৌতুকপ্রিয়। উভয়েই ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা, ভক্তিতে ডগমগ। গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালে বাড়ীর লোকে সানন্দে ভিক্ষা নিয়ে আসে সাধুদের জন্য। তাঁরা বলেন—কৃষ্ণের ভজনা করো, কৃষ্ণের নামকীর্তন করো এই আমাদের ভিক্ষা। অন্য কিছু চাইনে। এই প্রার্থনা কারো মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, মনে তোলে আলোড়ন; কারো মনে কোন দাগ কাটে না, মন তাদের অন্য বিষয়ে মগ্ন; কেউ বা বিরক্ত হয়, ভাবে এ-সব ভণ্ডামি। ঈশ্বরপরায়ণ-প্রচারক দুজন মান-অভিমান শূন্য। রূঢ় আচরণে তাঁরা বিরক্ত হন না; লোকের দুর্দশার কথা ভেবে করুণায় তাঁদের অন্তর পূর্ণ হয়।

* * * *

জগন্নাথ ও মাধব দুই ভাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান। নদীয়ায় জগাই-মাধাই নামেই পরিচিত। নগরের কোতোয়াল তারা। অর্থশালী, অধীনে আছে অস্ত্রধারী সেপাই সৈনিক। প্রচণ্ড প্রতাপ; প্রকৃতপক্ষে তারাই নদীয়ার রাজা, কিন্তু প্রজানুরঞ্জক নয়। দিনরাত্রির বেশীক্ষণ সময়ই মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নরহত্যা, অখাদ্য গ্রহণ—এমন কোন অপকর্ম নাই যা তারা করেনি। একান্ত দুর্জন। তাদের অত্যাচারে লোকে অতিষ্ঠ কিন্তু অসহায়। কাজীকে তারা অর্থ দিয়ে বশ ক'রে রেখে নগরবাসীদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়।

একদিন পথে দুই ভাইকে দেখতে পেয়ে নিতাই হরিদাসকে বলেন—চলো, ওদের কাছে গিয়ে হরিনাম করার অনুরোধ জানাই। হরিদাস বলেন—তুমি কি ওদের চেন না? আর, তোমার কি প্রাণের ভয় নাই? ওখানে গেলেই বিপদ। নিত্যানন্দ জেদ ধরেন জগাই-মাধাইকে হরিনাম দিতেই হবে। বলেন—আমাদের কি! আমরা কেবল প্রভুর আদেশ জারি করবো। অবশেষে দুজনে জগাই-মাধাইয়ের কাছে যান; নিতাই বলেন—তোমরা কৃষ্ণ-ভজনা করো, কৃষ্ণনাম করো, এই আমাদের ভিক্ষা।

—বটে রে ভণ্ড সাধুর দল! তোদের বুঝি প্রাণের মায়া নাই! বড় যে নাম বিলাতে বেরিয়েছিস্—ব'লে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দাঁড়া তোদের শিক্ষা দিই—এই ব'লে নিতাই ও হরিদাসকে ধরার জন্য মাতাল দুজন ধাওয়া করে।

বেগতিক দেখে নিতাই হরিদাসকে টানতে টানতে নিয়ে ছুটতে থাকেন, পিছে পিছে ছুটে জগাই আর মাধাই। নেশার ঘোরে তারা অপ্রকৃতিস্থ, তাতে স্থূলকায়; জোরে দৌড়াতে পারে না। রাস্তার লোকে নিতাই আর হরিদাসের দুর্দশা দেখে। কেউ বা মনে কষ্ট পায়, কেউ বা হাসে; বলে—এখন বোঝ, নাম-বিলানোর কেমন মজা!

এখানেই ঘটনার শেষ নয়, ঘটনার সূত্রপাত। নিত্যানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করেন, এ পাষণ্ড দুজনকে কৃষ্ণনামের জোয়ারে ভাসিয়ে স্বদলে আনতেই হবে। এমনি দুরাচার পাপিষ্ঠজনই তো নিমাইয়ের সর্বব্যাপী প্রেমের যোগ্য অধিকারী, উত্তম পরীক্ষার পাত্র, মহিমা-প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র। নিতাই হরিদাসকে বলেন—প্রভু বড় দয়াল। তোমার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না। তুমি তাঁকে শক্ত ক'রে ধরবে—জগাই-মাধাইয়ের একটা গতি করতেই হবে। হরিদাস হাসেন। বলেন—বুঝেছি। তোমার করুণা যখন জেগেছে তখন ওদের কপাল ভালো। উদ্ধার ওরা হবেই।

গৃহে ফিরে নিতাই নিমাইয়ের কাছে জগাই-মাধাইয়ের ঘটনার বিবরণ দেন। অবশেষে বলেন—আর আমরা কৃষ্ণনাম প্রচার করতে নগরে বের হব না। যতক্ষণ তুমি এই দুজনকে উদ্ধার না করছো ততক্ষণ অন্যের কাছে নামকীর্তন ভিক্ষা ক'রে কোন লাভও হবে না। ভালো মানুষকে ঈশ্বর-ভজনা সকলেই করাতে পারে; এই পাষণ্ড দুজনকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে তোমার পতিত-পাবন নামের প্রমাণ দাও, প্রভু।...

নিতাই যতই বলেন, নিমাই কেবল মৃদু মৃদু হাসেন। শেষে বললেন —বুঝেছি। জগাই-মাধাইয়ের অদৃষ্ট ভালো। তোমার নজরে যখন পড়েছে তখন তাদের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। ভক্তগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠেন। তাঁরা জানেন নিমাইয়ের শ্রীমুখের বাণী অব্যর্থ।

* * * *

জগাই-মাধাই নগরের বিভিন্ন অংশে শিবির স্থাপন ক'রে বাস করতো। যখন যে অঞ্চলে শিবির পড়তো তখন সেখানকার অধিবাসীদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকত না। তাদের উৎপীড়ন কখন কি আকারে প্রকাশ পাবে কে জানে! নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যেদিন তাড়া ক'রে মারতে এসেছিল, তার অল্প কিছুদিন পরেই নিমাইয়ের পাড়াতে তাদের তাঁবু পড়লো। যেন গ্রামে বাঘ এসেছে। দু'চারজন একত্রে না হ'লে পথ চলতে কেউ সাহস পায় না। লাঞ্ছনার যেখানে প্রতিকার নাই সেখানে শক্তিমান অত্যাচারীর ভয়ে সবাই ভীত হয়।

শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন চলেছে আগের মতোই। রাত্রিতে বাইরের অঙ্গনের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে খোল করতাল নূপুর সহযোগে মধুর নামগান। রাত্রিতে নেশার ঘোরে জগাই-মাধাই দুই ভাই গান-বাজনা শুনে সেখানে আসে, দেখে দরজা বন্ধ, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই। মদের নেশায় বিভোর হয়ে তারা সারারাত গানের তালে তালে নেচে কাটিয়েছে। প্রভাতে ভক্তগণ দরজা খুলেই দেখেন দুই মূর্তিমান দুরাচার। একজন বলে—নিমাই পণ্ডিত, তোমার সম্প্রদায়ের গান তো বেশ ভালো। এ কি মঙ্গলচণ্ডীর গীত? তোমার দল নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ী গিয়ে গাইতে হবে।…দুজনের কথার উত্তর দেয় না কেউ। নিমাই ও ভক্তগণ তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে যান। ভক্তগণ শঙ্কিত, ভাবেন এ দুরাচারদের হাত থেকে উদ্ধার পাব কবে। নিমাই চিন্তিত হন, ভাবেন এদের কী করা যায়।

অপরাহ্নে ভক্তগণ নিতাইকে পুরোভাগে ক'রে নিমাইয়ের কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হন। নগরে নামকীর্তন প্রচার করতে তাঁরা আর বের হ'তে সাহস পান না, মনে তাঁদের আগের মতো উৎসাহও আসে না। প্রভু যদি জগাই-মাধাই দুই পাষণ্ডকে উদ্ধার ক'রে আপন মহিমা প্রচার করেন, তবে তাঁরা নির্ভয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনামের

গৌরব প্রচার করতে পারেন। শত উপদেশের চেয়ে একটি উদাহরণই বেশী কার্যকরী।

ভক্তবৃন্দ সকলেরই যখন ইচ্ছা যে পাষণ্ড দুজন উদ্ধার হোক তখন নিমাই বললেন—বেশ তাই হবে। আজ বিকালে সবাই মিলে গিয়ে তাদের হরিনাম দেব। হরিনামের মহিমা দেখতে পাবে সকলে। বাদ্যভাণ্ড নিয়ে ভক্তদের সকলকে প্রস্তুত হ'তে খবর দাও। ভক্তদের এবার মহা আনন্দ। খোল করতাল শঙ্খ ভেরী নিয়ে পায়ে নূপুর পরে সবাই প্রস্তুত হ'ল। নাম দিয়ে, প্রেম দিয়ে পাপী-জয়ের অভিনব অভিযান। পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নম্রতার, হিংসার বিরুদ্ধে মৈত্রীর অভিযান। কীর্তনীয়াদের দলের সম্মুখদিকে রয়েছেন নিতাই, পশ্চাতে নিমাই। মহা উল্লাসে গান করতে করতে দল অগ্রসর হ'ল। জগাই-মাধাই তাঁবুর ভিতর নিদ্রিত ছিল। মাতাল অবস্থায় রাত্রি জাগরণের পর অপরাহ্নকালেও তারা ঘুমে ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। কীর্তনের কোলাহল শুনে ঘুম ভেঙে গেল, প্রহরীকে আদেশ দেয়—অমন হৈচৈ করতে বারণ ক'রে দাও। প্রহরী গিয়ে নিতাইকে সে-কথা বলে কিন্তু কে কার কথা শোনে! প্রহরী ফিরে এসে খবর দেয়—নিমাই পণ্ডিতের দল কীর্তন ক'রে আসছে; নিষেধ মানল না। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে দু'ভাই। কী, এত বড় স্পর্ধা! বৈষ্ণবের গোষ্ঠী আজ নির্মূল করবো নদীয়া থেকে। শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো দুইজন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে স্খলিত বসন কোন রকমে সামলাতে সামলাতে বাইরে বেরিয়ে আসে। চোখ অরুণবর্ণ, রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। উভয়ে এসে দলের সম্মুখে দাঁড়ায়। নিতাই হরিনামে মত্ত। সম্মুখে জগাইকে দেখতে পেয়ে মিনতি ক'রে বলেন—জগাই, একবার হরিনাম করো; হরিনাম ক'রে আমায় কিনে নাও। জগাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। নিতাইয়ের আকুতি হয়তো তার মনকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু মাধাইয়ের ক্রোধ শান্ত হয়নি। পথ থেকে ভাঙা কলসীর একটি খণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে সে সজোরে নিক্ষেপ করে নিতাইয়ের মাথা লক্ষ্য ক'রে। মাথা কেটে যায়, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। নিতাইয়ের যন্ত্রণা বোধ হয় না, 'গৌর গৌর' ব'লে তিনি আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। মাধাই আর এক কলসীখণ্ড তুলে নেয় আবার আঘাত হানার জন্য। এবার জগাই তাকে থামায়, হাত থেকে ঢিলটি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—থামো, থামো, বিদেশী সন্ন্যাসীকে মেরে কি লাভ হবে।

খবর শুনে নিমাই ছুটে আসেন নিতাইয়ের কাছে। তখন রক্তে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে। সাদরে নিতাইকে জড়িয়ে ধরে নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিলেন। নিতাই প্রফুল্ল কমলের মতো উৎফুল্ল। অকস্মাৎ নিমাইয়ের রোষ দীপ্ত হয়ে ওঠে। দুরাচারদের শাস্তি দিতে হবে। রুদ্ররূপ ধারণ ক'রে তিনি 'চক্র' 'চক্র' ব'লে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করতে থাকেন। রোষবহ্নিসদৃশ সে আকৃতি দেখে জগাই-মাধাই স্তম্ভিত। মুরারি বলেন—আদেশ করুন প্রভু, আমি এখুনি এ দুই পাষণ্ডকে শেষ ক'রে ফেলি।...... নিতাই ব্যাকুলভাবে করজোড়ে অনুনয় করতে থাকেন—শান্ত হও প্রভু, এ দুজনকে আমি গ্রহণ করেছি। এদের শাস্তি দিয়ে কি হবে; অবোধ এরা; দয়া করো এদের, ক্ষমা করো এদের।...কিন্তু প্রভু অটল। তাঁর নয়নের রোষাগ্নি শান্ত হয় না। অবশেষে বলেন—এ দুজনকেই তুমি শাস্তি দিতে পার না। জগাই তো আমার প্রাণরক্ষা করেছে। মুহূর্তে নিমাইয়ের চোখ করুণায় আর্দ্র হয়। জগাই তোমায় বাঁচিয়েছে? জগাইয়ের ভিতর তা হ'লে মনুষ্যত্ব আছে? হ্যাঁরে জগাই, তুই আমার নিতাইকে রক্ষা করেছিস্! আয় তবে তোকে আলিঙ্গন দিই—ব'লে প্রভু প্রেমভরে জগাইকে বক্ষে ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব পুলকে মূর্ছিত হয়ে সেখানেই সে লুটিয়ে পড়ে। ভক্তজন এই দৃশ্য দেখে আনন্দে হরিধ্বনি ক'রে ওঠে। ধীরে ধীরে মাধাইয়ের মনে অনুশোচনা জাগে, কঠিন মন তার কোমল হয়ে আসে। নিমাইয়ের পদতলে লুটিয়ে সে অনুনয় করে—ঠাকুর, আমি অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করো; আমায় উদ্ধার করো। আমি তোমার পাপী সন্তান, তুমি বিনে কে উদ্ধার করবে, প্রভু।

নিমাই বলেন—আমি তোমার কিছু করতে পারব না, মাধাই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কাছে তুমি অপরাধী। তিনি তোমায় ক্ষমা ক'রে করুণা না দেখালে তোমার উদ্ধার নাই। তুমি তাঁকে ধরো। মাধাই তখন গিয়ে নিতাইয়ের পায়ের ওপর পড়ে, বলে—পাতকী আমি। তাই ব'লে কি আমায় দয়া করবে না, ঠাকুর! নিমাই নিত্যানন্দকে অনুরোধ ক'রে বললেন—শ্রীপাদ, তুমি করুণার অবতার। মাধাই অনুতপ্ত। ওকে ক্ষমা করো। সাধুজন চরণাশ্রিত ব্যক্তিকে চিরদিন ক্ষমা ক'রে থাকেন। এ অধমকে ক্ষমা ক'রে তোমার মহানুভবতার পরিচয় দাও।

নিতাই বলেন—প্রভু, তুমি ওকে উদ্ধার করবে, জানি। আমাকে আদেশ

ক'রে কেবল ভক্তের গৌরববৃদ্ধি করছো। পদতলে লুণ্ঠিত মাধাইকে বলেন— ওরে নির্বোধ, প্রভু তোকে আগেই ক্ষমা করেছেন ; তাই তো দেখছিস্ না তোর জন্য ভগবান আমার মতো ব্যক্তিকে পর্যন্ত অনুনয়-বিনয় করছেন। এসো মাধাই, তোমায় আলিঙ্গন দিই।—এই ব'লে মাধাইকে হাত ধরে তুলে আলিঙ্গন করতেই সে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে জগাইয়ের পাশে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। চক্ষু স্থির, দেহ নিস্পন্দ। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য পথে লোকের ভিড় হয়ে গেছে। নিমাই জগাই-মাধাইকে অচেতন অবস্থায় রাস্তায় রেখে ভক্তগণসহ নিজের বাড়ী ফিরে এলেন। তাঁরা বিজয়ী।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে দরজার পাশে কে যেন 'ঠাকুর, ঠাকুর' ব'লে কাতর-স্বরে ডাকে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল জগাই-মাধাই। প্রভুর আদেশে মুরারি গিয়ে দুজনকে কোলে ক'রে ভিতরে এনে প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিলেন। 'ঠাকুর' ব'লে তারা মাটিতে দীঘল হয়ে পড়লো। নিমাই নিতাইকে বললেন— শ্রীপাদ, এদের গঙ্গাস্নান করিয়ে হরিনাম দান করো। এখন নিয়ে এসো এদের গঙ্গার তীরে।...ভক্তগণ সংজ্ঞাহীন দুজনকে ধরাধরি ক'রে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যান। স্নান করানোর পর তাদের জ্ঞান ফিরে এলে নিমাই তাদের হাতে তামা তুলসী দিয়ে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলেন—হে জগন্নাথ, হে মাধব, আমি তোমাদের সকল পাপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তোমরা এ যাবৎ যত পাপ করেছ সে-সব তামা তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে আমায় উৎসর্গ ক'রে দাও, দিয়ে তোমরা নির্মল নিস্পাপ হও।

অনুশোচনায় জগাই-মাধাইয়ের অন্তর পুড়তে থাকে। সুপ্ত বিবেক যেন জেগে ওঠে। দুজনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন, বলেন—হায় ঠাকুর, আমাদের পাপরাশি তোমার হাতে তুলে দেব! এমন পাপ নাই যা করিনি— তাই দিয়ে অঞ্জলি দেব! বাক্‌রোধ হয়ে আসে। তাঁরা অঝোরে কাঁদেন। গঙ্গাতীরে হাজার হাজার কুতূহলী দর্শক নির্বাক্, বিস্মিত। জগাই-মাধাইকে উদ্দেশ ক'রে নিত্যানন্দ বলেন—তোমাদের দুঃখ কি? যিনি পতিতপাবন তিনি স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত। বিনা সঙ্কোচে তোমাদের পাপ প্রভুর হাতে তুলে দাও। এতে তোমাদের কোন কলঙ্ক নাই ; বরং প্রভুর যশ বৃদ্ধি হবে।

নিমাই আবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—আমি তোমাদের পাপরাশি ভিক্ষা চাইছি। সে-সব আমাকে দিয়ে তোমরা নির্মল হও। এবার নিত্যানন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তা অনুসরণ ক'রে জগাই-মাধাই তামা

তুলসী গঙ্গাজলসহ তাঁদের কৃত কর্মফলসমুদয় প্রভুর হস্তে সমর্পণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে নিমাইয়ের সোনার অঙ্গ যেন কালো হয়ে গেল। নীলকণ্ঠ হলেন তিনি। দর্শকগণ স্থির সিদ্ধান্ত করলো—জগাই-মাধাই নিষ্পাপ হয়েছেন।

* * * *

এর পর নিমাইয়ের গৃহে ফিরে আনন্দ-নৃত্য। কৃষ্ণনামের বিজয়োৎসব। সে নৃত্য-উৎসবে জগাই-মাধাই হলেন প্রধান অংশীদার। হরিনামের জয়ধ্বনি উঠলো। সেদিন কেবল নিমাই পণ্ডিতের গৃহে নয়, নদীয়াবাসীর ঘরে ঘরে, ভক্তজনের প্রেম-পুলকিত অন্তরে অন্তরে।

এর পর জগাই-মাধাইয়ের কি হ'ল ? তাঁরা হলেন বিষয়ত্যাগী, সংসার-বিরাগী, দীন ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত। পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনায় পরিণত হয়। একদিনের ঘটনায় মানুষের জীবনের কী বিরাট পরিবর্তন! যা ছিল কাঁটাগাছ, তা হ'ল সুগন্ধি কুসুমে আবৃত। যেখানে ছিল প্রখর তৃষ্ণার প্রাণঘাতী মরুভূমি, সেখানে দেখা দিল ছায়াশীতল, নির্মল জলস্নিগ্ধ মরূদ্যান। মাধাই দিবানিশি নাম জপ করতেন আর গঙ্গাতীরে আগত সকলের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতেন; বলতেন—সকলের কাছে আমি অপরাধী। তোমরা আমায় ক্ষমা করো।……নিজের হাতে কোদাল দিয়ে কেটে কেটে গঙ্গার এক ঘাট ক'রে দিলেন লোকের উপকারের জন্য। লোকে বলে—মাধাইয়ের ঘাট। কয়লা-হৃদয় গ'লে হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু। জগতে কে ঘৃণার যোগ্য ?

# নবদ্বীপে লীলা

শ্রীবাস পণ্ডিত নিষ্ঠাবান ভক্ত। গৌরাঙ্গগত প্রাণ। তাঁর গৃহে নিত্য নামকীর্তন আর নিমাইয়ের প্রেমাবেশে নৃত্য। আনন্দের হিল্লোলে শ্রীবাস-ভবন পূর্ণ। তাঁর পরিবার-পরিজনরাও এ রসের আস্বাদন করেন কিন্তু তাই ব'লে সকলের ভাগ্যেই গৌরাঙ্গের ভাবে-বিভোর নৃত্য দর্শন করা ঘটে না। প্রেম হৃদয়ের মধুঝঙ্কার। ঐক্যতানের মতোই তা পরিপূর্ণ স্ফুরণের জন্য চাই অন্তর-ভাবের ঐক্য, একই-সুরে-বাঁধা হৃদয়বীণার তার। বিরুদ্ধ সুর একই সঙ্গে ধ্বনিত হ'লে তাল কাটে, রস ভঙ্গ হয়। নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্যের ঐক্যতানের ব্যাপারেও তেমনি। কীর্তনের সময় শ্রীবাসের গৃহে বহিরঙ্গ ব্যক্তির প্রবেশের অধিকার ছিল না। অন্যের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কেউ এলেও নিমাইয়ের মনোযন্ত্রে তা ধরা পড়তো।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন চলেছে। প্রাঙ্গণের দরজা যথাসময়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। অন্য দিনের মতোই ভক্তগণ উৎফুল্লচিত্তে কীর্তন সুরু করেছেন, নিমাই আনন্দে নৃত্য করতে উঠেছেন। কিন্তু কেমন যেন বেসুরো। তেমন আনন্দের প্রবাহ আসে না কেন! শ্রীবাসকে বলেন—পণ্ডিত, আজ আমার কী হ'ল! নৃত্যে আনন্দ পাইনে কেন? কোন বহিরঙ্গ লোক কি ভিতরে এসেছে?

শ্রীবাস ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কেমন ক'রে হবে? এখানে তো অন্য কারো আসার উপায় নাই! গৃহের অভ্যন্তরে যান তিনি; প্রতি ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখে আসেন, প্রাঙ্গণের এ-কোণ ও-কোণ দেখেন। নাঃ কোথাও তো অন্য লোক নাই। এসে নিমাইকে বলেন সে-কথা। নিমাই আবার নৃত্য সুরু করেন কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রীতে মধুর ঝঙ্কার ওঠে না। বলেন—আমারই কোন অপরাধ হয়েছে, নতুবা কৃষ্ণনামকীর্তনে মন আনন্দে সাড়া দেয় না কেন! কৃষ্ণের কৃপা নাই আমার ওপর।

এবার ভক্তগণ সচকিত হয়ে ওঠেন। তাঁদেরই কি কারো কোন অপরাধ হ'ল? শ্রীবাস ভাবেন তিনি নিজেই বুঝি অপরাধী। আবার অন্তঃপুরে যান ভাল ক'রে খোঁজ নিতে, সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে। এবার দেখেন

ঘরের এক কোণে ডোল-মুড়ি দিয়ে বসে আছেন তাঁর শাশুড়ী। কীর্তন শোনার আগ্রহে তিনি ঐভাবে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীবাসের অগোচরে। তখনি তাঁকে গৃহ থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল পিছনের দরজা দিয়ে। ভক্তদের কীর্তন সুরু হ'ল নূতন উদ্যমে; তার সঙ্গে শ্রীনিমাইয়ের আবেশ-বিহ্বল মধুর নৃত্য।

* * * *

মানুষ মনোময় জীব। মনের সম্পদে তার প্রকৃত মূল্য। সাধারণ মানুষ অপরের মনোজগতের খবর রাখতে পারে না; কিন্তু অসাধারণ যাঁরা, আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যাঁরা এগিয়ে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন তাঁদের কাছে অন্তরটি দর্পণের মতো প্রতিভাত। অন্তর দিয়ে মানুষের বিচার। ভক্ত শ্রীবাসের শাশুড়ী এই বিচারে উত্তীর্ণা হ'তে পারেননি। চুম্বক পাথর লোহাকে আকর্ষণ করে, মাটির ডেলাকে নয়। এই বিচারে নিমাই পুণ্ডরীককে আকর্ষণ করেছিলেন; তাঁর মনের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন। পুণ্ডরীক ভোগী, সংসারী, বিলাসী। জাগতিক অর্থ-সম্পদের রাজসিক চাকৃচিক্যের মধ্যে জীবন-যাপন করেন ব'লে সকলের ধারণা। বাহ্যতঃ দেখে তাই মনে হ'ত কিন্তু পদ্মের পাতার মতো; জলে ডুবে থাকলেও জল লাগে না, তুললেই জল ঝরে যায়; এমনিভাবে ঐশ্বর্য-সম্পদের মধ্যে বাস করতেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। বাইরে জাঁকজমক, অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের ফোয়ারা। চট্টগ্রামের ধনী ব্যবসায়ী তিনি। নবদ্বীপে আসার আগে থেকেই নিমাই 'পুণ্ডরীক, বাপ্‌রে আমার' ব'লে আকুল হয়ে তাঁকে আহ্বান করেন। সঙ্গীরা বুঝতে পারেন না কে এই পুণ্ডরীক, যার জন্য নিমাই হা-হুতাশ করেন। নিমাইয়ের আদেশে মুকুন্দ আর গদাধর যান পুণ্ডরীক-দর্শনে। পুণ্ডরীকের বিলাসিতা দেখে গদাধরের মনে বিরূপ ভাবের সঞ্চার হয় কিন্তু মুকুন্দ যেমন কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা ক'রে ভাগবতের এক শ্লোক আবৃত্তি করলেন, অমনি পুণ্ডরীকের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো। অন্তরে ভক্তি উথলিয়ে উঠলো; অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্ছা পুলক হুঙ্কার—সবই দেখা দিল এক সঙ্গে। পুণ্ডরীকের বিষয়ীর মুখোশ খুলে গেল; ভিতরের কৃষ্ণপ্রেমিক মানুষটিকেই নিমাই অন্তর দিয়ে আকর্ষণ করেছিলেন। দূরের অজানা মানুষকে কাছে টেনে এনেছিলেন।

* * * *

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী পুণ্ডরীকের ঠিক বিপরীত। অর্থ-সম্পদহীন। ভক্তির সম্পদে অন্তর পূর্ণ। বিনয়ী, শান্ত, সাত্ত্বিক গুণে ভূষিত। গঙ্গাতীরে কুটীরে বাস করেন। ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যে জীবন-ধারণ হয়, মনের সন্তোষে কৃষ্ণ-ভজনা করেন। একদিন ভক্তগণসহ নিমাই শুক্লাম্বরের কুটীরে এসে উপস্থিত। তাঁর প্রতি অসীম স্নেহ। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাঝুলির ভিতর হাত দিয়ে চা'ল তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে চিবাতে থাকেন আর বলেন—ভক্তের জিনিস বড় সুস্বাদু। শুক্লাম্বর বিব্রত হয়ে বলেন—করো কি, করো কি প্রভু! ওর মধ্যে যে কত ক্ষুদকুণ! নিমাই হাসেন আর সানন্দে চিবিয়ে খেতে থাকেন। বলেন—অভক্তের অমৃতের দিকে ফিরে চাইনে; ভক্তের ক্ষুদই আমার প্রিয়।

*　　　*　　　*　　　*

মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য; চিকিৎসা-বিদ্যা জাত-ব্যবসা। সাত্ত্বিক, ঈশ্বরভক্ত। তাঁর প্রতিও নিমাইয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ। একদিন রাত্রিতে খেতে বসে গুপ্ত ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে ঘৃতসিক্ত ভাত মুঠো মুঠো ক'রে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—কৃষ্ণ খাও, কৃষ্ণ খাও। গুপ্তের গৃহিণী স্বামীর স্বরূপ জানেন। তিনি হেসে আরো ভাত এনে দেন; অবশেষে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ ক'রে গুপ্তকে প্রকৃতিস্থ করান। পরদিন সকালে মুরারি নিজ গৃহে বসে আছেন এমন সময় নিমাই এসে হাজির। গুপ্ত বন্দনা ক'রে আসন দিলেন, বললেন—কি আদেশ। নিমাই বলেন—পেট ভার হয়ে আছে, ওষুধ দাও। মুরারি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন—অজীর্ণের কারণ কি? গত-রাত্রিতে কি ভোজন হয়েছে তা বলো, তবে ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারি। নিমাই বলেন—অজীর্ণের কারণ তোমার ঘি-মাখা রাশি রাশি ভাত। তুমি নিজে তো জান না; তোমার গৃহিণী জানেন, কি রকম আহার করিয়েছ গতরাত্রিতে। বৈদ্যের নৈবেদ্যে রোগ, বৈদ্যের জলই তার ওষুধ।—এই ব'লে নিমাই মুরারির জলপাত্র তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে জল খেয়ে ফেললেন। হতভম্ব মুরারির মুখে কথা ফোটে না, নিমাইয়ের প্রশান্ত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, চোখে নামে আনন্দের অশ্রু।

আর একদিন নিমাই মুরারির বাড়ী এসে বসেছেন। গুপ্ত একান্ত বিনীতভাবে জোড়হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান। নিমাই বলেন—গুপ্ত, তোমার কাছে আজ একটি ভিক্ষা চাই। মুরারি বলেন—তোমাকে অদেয় কি আছে, প্রভু? বলো কি দিতে পারি?

—তোমার ঘরে যে জিনিসটি লুকিয়ে রেখেছ, তাই এনে দাও।

—আমার ঘরে কী লুকানো আছে ?

—কাটারি।

—কাটারি ? বিস্ময়ের ভান করেন মুরারি।

—হ্যাঁ, যা তুমি আত্মহত্যা করার জন্য তৈরি ক'রে এনে রেখেছ।—ব'লে নিমাই নিজেই ঘরের মধ্যে গিয়ে কাটারিখানা বের ক'রে নিয়ে এলেন। নূতন, ধারালো। মুরারির গৃহিণী তা দেখে শিউরে উঠলেন।

মুরারি আপনমনে ভেবেছেন নিমাই যতদিন আছেন ততদিন আনন্দ-উৎসব। কিন্তু লীলাময় পুরুষকে বিশ্বাস কি! আজ আছেন, কাল নাই। তাঁর তিরোধান ঘটলে প্রাণধারণ নিরর্থক হবে, সহ্যই বা করবো কি ক'রে! তার চাইতে প্রভু থাকতে থাকতেই দেহ বিসর্জন দেব। মনে মনে এই সঙ্কল্প ক'রে গোপনে কাটারি তৈরি করিয়ে এনেছেন। কিন্তু নিমাই যখন সব প্রকাশ ক'রে দিলেন, মুরারি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলেন। নিমাই বললেন—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা, গুপ্ত, তুমি কখনো আর দেহনাশ করার চিন্তা মনে পোষণ করবে না। তোমার দেহ-মন আমার, ওতে তোমার কোন অধিকার নাই। মুরারিকে প্রভু তাঁর একান্ত নিজের ব'লে গ্রহণ করেছেন ভেবে মুরারি আশ্বস্ত হন। তাঁর চোখে নামে ভক্তি ও পুলকের অশ্রু।

* * * *

ভক্তগণ সদাই নিমাইয়ের কাছে কাছে থাকেন। তাঁরা জানেন নিমাইয়ের হৃদয় মহাসমুদ্রের মতো। সদাই তাতে তরঙ্গের হিল্লোল, কখনো মৃদু, কখনো প্রবল। কখনো ভক্তভাবে, দীনভাবে, স্বাভাবিক মানুষভাবে, কখনো ঐশ্বর্যময়, মহিমময়-ভাবে। নিমাই যখন ভক্তভাবে অবস্থান করেন তখন তিনি বিনয়নত, কৃষ্ণকে পাওয়ার আকুলতায় একান্ত কাতর। একদিন এমনি স্বাভাবিকভাবে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। সঙ্গে শিষ্যবৃন্দ। পথে অকস্মাৎ একজন প্রবীণা ব্রাহ্মণ-রমণী ভক্তিভরে নিমাইয়ের চরণে প্রণিপাত ক'রে চরণধূলি গ্রহণ করলেন। নিমাই সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন—করেন কি, করেন কি! আমি একজন দীনতম ব্যক্তি। কৃষ্ণের কৃপা নাই আমার ওপর, তাই তাঁকে না পেয়ে আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াই, আপনি আমার চরণধূলি নিলেন! আমি যে মহা-অপরাধী হলেম। এ দেহ আমি রাখব না, এ দেহ আমি

রাখব না—ব'লে অনুতপ্ত নিমাই ছুটে চলেন গঙ্গার দিকে। ঘাটে গিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জলে। শিষ্যগণ তীরে দাঁড়িয়ে। ভাবেন—এখুনি উঠবেন কিন্তু বহুক্ষণ গেল নিমাই জল থেকে উঠলেন না। ভক্তগণও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। শচীমায়ের কাছে খবর গেল। আলু-থালু হয়ে ছুটে এলেন তিনি। গঙ্গাতীরে এসে আকুলকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন—নিমাই, নিমাই রে, আয়রে বাবা!

নিত্যানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এসেই ঘটনা শুনে তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। ডুব দিয়ে নিমাইয়ের অচেতন দেহ তুলে নিয়ে এলেন; যেন সোনার প্রতিমা বিসর্জনের পর উদ্ধার করা হ'ল। দর্শকগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলো। সুস্থ হয়েও নিমাই ভুলতে পারেন না যে, বয়োজ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণ-রমণী তাঁর পদধূলি নেওয়ায় তিনি অপরাধী। তিনি নিজেই কৃষ্ণের কৃপার কাঙাল, অপরকে কৃপা করার তাঁর কী অধিকার! অথচ আবেশ-অবস্থায় নিমাইয়ের অন্য রূপ। দেহ জ্যোতির্ময়; তখন তিনি ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী। বৃদ্ধ ভক্ত অদ্বৈত আচার্যের মস্তকে পদস্থাপন ক'রে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন। নিজের জননী শচীদেবীর মস্তকেও শ্রীচরণ তুলে দেন। নিমাই তখন ভক্ত নন, ভক্তবৎসল।

* * * *

সাধারণ অবস্থায় নিমাই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে ভক্তদের বিস্মিত করার পক্ষপাতী নন। ঈশ্বরের কৃপা যাঁরা লাভ করেন তাঁরা বিভূতির অধিকারী। তাই ব'লে বিভূতি দেখানোই তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা ভেল্কি চান না, দর্শকজনের বাহবা কামনা করেন না; তাঁরা চান সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তির আধার, লীলাময় ভগবানকে। তথাপি মাঝে মাঝে একান্ত প্রসঙ্গক্রমে নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখা গেছে। একদিন শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে কীর্তনের জন্য সবাই সমবেত হয়েছেন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বর্ষণোন্মুখ মেঘের দিকে তাকিয়ে ভক্তগণ বিমর্ষমুখে বলেন—আজ আর কীর্তন হবে না; ঝড়-বৃষ্টি এলো ব'লে! ভক্তদের মনের ভাব বুঝে নিমাই মৃদু মৃদু হাসেন। একজোড়া মন্দিরা হাতে নিয়ে তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বাজাতে থাকেন আর মেঘপানে চেয়ে গাইতে থাকেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘ দূরে সরে যায়, ভক্তগণ মেতে ওঠেন কীর্তনের আনন্দ-উল্লাসে। প্রকৃতি

শক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে পারে না। তাঁর কাছে তাকে মাথা নোয়াতে হয়।

*　　　*　　　*　　　*

আর একটি অন্য ধরনের ঘটনা। চাপাল গোপাল নামে নবদ্বীপে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। অত্যন্ত দাম্ভিক। নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা আকাশপ্রমাণ উঁচু। নিমাইয়ের খ্যাতিতে গায়ে জ্বালা ধরে। তাঁকে ছোট করতে পারলেই আত্ম-প্রসাদ। কীর্তনীয়াদের ওপর যারপরনাই চটা। চাপাল গোপাল ভাবেন এই মূর্খ সাঙ্গপাঙ্গরাই নিমাইকে এমন মাথায় তুলেছে, অথচ ভজনের এরা কি জানে! এমন আকাশ-ফাটানো চীৎকার আর হুলাহুলি জড়াজড়ি ক'রে ঈশ্বরের সাধনা হয়! শ্রীবাসের গৃহে প্রতি রাত্রিতে কীর্তন জমে। চাপাল গোপালের সহ্য হয় না। অবশেষে এক রাত্রিতে শ্রীবাসের অঙ্গনে যখন কীর্তন চলেছে, বাইরে বন্ধ দরজার সামনে একটা ভাঁড়ে মদ আর তান্ত্রিক পূজার অন্যান্য উপকরণ তিনি গোপনে রেখে দেন বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ করার জন্যই। প্রভাতে দরজা খুলেই অপবিত্র জিনিসগুলি দেখতে পান সবাই। বুঝতে পারেন এ চাপালের অপকর্ম; অক্ষম দাম্ভিকের ঈর্ষার ফল। শ্রীবাস হাড়ি ডাকিয়ে এনে স্থান পরিষ্কার করিয়ে নেন। চাপাল মনে মনে হাসেন—কেমন মজা! কিন্তু মজা সত্যি দেখা গেল; এ ঘটনার দিন দুইয়ের মধ্যে চাপালের অঙ্গে কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পেল। হাতের আঙুলগুলি ফুলে উঠলো, ঘা হয়ে মাংস খসে পড়লো। আপনজনরাও তখন তাঁর বিষাক্ত সঙ্গ পরিহার ক'রে চলে। বাইরে একখানা ছোট ঘর ক'রে দেওয়া হয়েছে তাঁর জন্য। সেখানে তাঁর স্ত্রী এসে খাবার দিয়ে যান। ঘায়ের দুর্গন্ধে কেউ কাছে থাকতে পারে না। চাপাল এখন সঙ্গিহীন, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত। লাঠিতে ভর দিয়ে কোন রকমে গঙ্গার তীরে গিয়ে বেশীর ভাগ সময় একাকী বসে থাকেন। এক দয়ালু সাধু নিত্য গঙ্গাস্নানে এসে চাপালকে দেখেন। একদিন বললেন—তুমি নিমাইয়ের কৃপাপ্রার্থী হও, আরোগ্য লাভ করবে।

রোগ-যন্ত্রণায় ভুগলেও চাপালের মনের দম্ভ যায়নি; নিজের কাজের জন্য অনুতাপও আসেনি। একদিন নিমাইকে কাছে দেখতে পেয়ে বললেন—নিমাই পণ্ডিত, তুমি নাকি সাধু হয়েছ, রোগ সারাতে পার। আমি তোমার গ্রামবাসী, স্বজাতি। আমার রোগটা ভাল ক'রে দাও না।

দুর্বিনীত দম্ভপূর্ণ কথা শুনে নিমাইয়ের মনে অনুকম্পার উদয় হয় না। বলেন—তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হয়েছে; এ আর বেশী কি? তোমাকে আরো অনেক দুঃখ পেতে হবে। এর পর চাপাল অতিকষ্টে বারাণসীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে রোগ-মুক্তির কামনায় 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকেন। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পান—নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় ভিক্ষা করো। একমাত্র তিনিই তোমায় নিরাময় করতে পারেন। ফিরে আসেন চাপাল। এবার দুঃখ-তাপে অন্তর পূর্ণ হয়েছে, মনের কালিমা অনুতাপের আগুনে পুড়ে নির্মল হয়েছে। নিমাইয়ের চরণে শরণ নেবার জন্য মন আকুল। নিমাই তখন কুলিয়া গ্রামে। চাপাল সেখানে গিয়ে একান্ত দীনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বলেন—আমায় এ রোগ থেকে উদ্ধার করো, প্রভু। আমি অপরাধী। নিমাই বলেন—তুমি শ্রীবাসের কাছে অপরাধী। তাঁর পাদোদক পান করো, মুক্তি পাবে।

চাপাল যেন হাতে স্বর্গ ফিরে পান। শ্রীবাসের চরণ-ধোয়া জল পান করেন ভক্তিভরে। সর্বাঙ্গে পচা ঘা আর কীড়ার দংশন থেকে অব্যাহতি লাভ করেন তিনি। দুঃখদাহনের ভিতর দিয়ে দুর্বৃত্ত সুবুদ্ধি লাভ করে; ভক্তের গৌরব বাড়ে। নিমাই কঠোর এবং কোমল—যখন যেমন দরকার তখন তেমন।

* * * *

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি নিমাইয়ের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। শুক্লাম্বর খাঁটি সোনা; নিষ্ঠাবান, নীরব ভক্ত। প্রেমে ভরপুর তাঁর মন। তাঁর ভিক্ষার ঝুলি থেকে খুদ মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে খেয়েছিলেন নিমাই। প্রভুকে ভোজন করানোর বাসনা ছিল তাঁর মনে কিন্তু প্রকাশ করেননি। সামাজিক বিধি অনুসারে তাঁর অন্ন নিমাই গ্রহণ না-ও করতে পারেন এই ছিল তাঁর মনে শঙ্কা। একদিন নিমাই নিজেই শুক্লাম্বরের আতিথ্য স্বীকার করলেন। বললেন—ব্রহ্মচারী, খাবার যোগাড় কর। তোমার গৃহে আজ আমার ভোজন।...

শুক্লাম্বরের মনোবাসনা পূরণ ক'রে নিমাই আনন্দে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেন। ভক্তগণও প্রসাদলাভ থেকে বঞ্চিত হন না। মধ্যাহ্ন আহারের পর সবাই বিশ্রাম করছেন। বিজয় আখরিয়া-ও সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিজয়ের হাতের লেখা সুন্দর; দ্রুত লিখতেও পারতেন তিনি।

অনেক প্রাচীন পুঁথি তিনি নিমাইকে নকল ক'রে দিয়েছিলেন। বিজয় প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত। সেদিন শুক্লাম্বরের গৃহে বিজয় অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিদ্রিত, এমন সময় প্রভু কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর বুকের ওপর শ্রীহস্ত স্থাপন করলেন। স্পর্শে বিজয় জেগে চেয়ে দেখেন মণিরত্নময় অঙ্গুরী-খচিত অপূর্বসুন্দর জ্যোতির্ময় হস্ত তাঁর বক্ষের ওপর। দিব্য স্নিগ্ধ বিভায় গৃহ পরিপূর্ণ, যেন অমৃতবর্ষী জ্যোৎস্নার কিরণ। পুলকে আত্মহারা হয়ে বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর মনের আনন্দ-উল্লাস আর থামে না—কেবল নৃত্য আর হুঙ্কার করতে থাকেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করেন—ব্যাপার কী? বিজয় কোন কথার জবাব দিতে পারেন না, আনন্দে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ।

নিমাই বলেন—শুক্লাম্বরের পুণ্য গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। বিজয় বোধ হয় কোন বিভব দর্শন করেছে। গঙ্গার মহিমাও হ'তে পারে। বিজয় ভাগ্যবান।

স্নানাহার নাই, দেহবোধ নাই; সাতদিন বিজয় ভাবোন্মাদের মতো আনন্দে মত্ত হয়ে কাটালেন। সাতদিন পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি সব কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন। ভক্তগণ বুঝলেন নিমাই ঠিকই বলেছেন; তবে তিনিই যে এর মূল সে-কথাটি গোপন ক'রে গেছেন। কৃপা ক'রে তিনিই বিজয়কে কিছু বিভব দেখিয়েছেন কিন্তু কণামাত্র দর্শনেই ভক্ত বাক্‌শক্তিহীন, আনন্দে উন্মত্ত! ছোট্ট ঘটে আকাশের সমস্ত আলো কি ধরতে পারে? সসীম মানুষের পক্ষে অসীম আনন্দ-স্বরূপকে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করার সাধ্য কি? পিঁপড়ে চিনির পাহাড় পেয়ে গেলে যে অবস্থা, বিজয়ের-ও তাই।

* * * *

শ্রীবাসের গৃহে দুয়ার-বন্ধ-করা অঙ্গনে ভক্তদের সঙ্গে নিমাইয়ের কীর্তন আর আনন্দ-নৃত্য চলে। একান্ত ভক্তজন ভিন্ন অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই। এক তপস্বী ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গের নৃত্য-দর্শনের অভিলাষী হয়ে শ্রীবাসকে অনুরোধ করেন—তাঁকে একদিন ভিতরে থাকবার অনুমতি দিতে হবে। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। অন্ন গ্রহণ করেন না, কেবলমাত্র দুধ পান ক'রে জীবন-ধারণ করেন। প্রতিদিন তিনি শ্রীবাসের নিকট অনুনয় করেন। অবশেষে একদিন শ্রীবাস তাঁকে গোপনে গৃহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখেন; ভাবেন কীর্তন-উৎসব শেষ হয়ে গেলে গোপনে তিনি চলে যাবেন, কেউ টের পাবে না। তাঁর বাসনাও পূর্ণ হবে।

কীর্তন আরম্ভ হয়। নিমাই ভক্তদের সঙ্গে অঙ্গনে নৃত্য করতে থাকেন কিন্তু ভাবোল্লাস আসে না। শ্রীবাসকে বলেন—পণ্ডিত, আজ আমার কী হ'ল? নৃত্যে আনন্দ পাইনে কেন? আমার ওপর কি কৃষ্ণের কৃপা নাই, না বহিরঙ্গ কোন লোক এখানে রয়েছে?

শ্রীবাস পড়েন মহা ফাঁপরে। ভাবেন প্রভু অন্তর্যামী, কোন কিছু আড়াল ক'রে লুকাবার উপায় নাই। প্রকাশ্যে বলেন—এক সন্ন্যাসীকে আমি এখানে আসতে সম্মতি দিয়েছিলাম। তিনি ঈশ্বরপ্রেমিক সাধু ব্যক্তি, কেবল দুধ খেয়ে প্রাণধারণ করেন।

প্রভু হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—কেবল দুধ কি ফলমূল খেয়ে থাকলেই আমাকে পাওয়া যায় না। ভড়ং চাইনে, ভক্তি চাই। আড়ম্বর চাইনে, নীরব নিষ্ঠা চাই। তোমার সে সন্ন্যাসীপ্রবরকে এখুনি বেরিয়ে যেতে বলো।

আড়াল থেকে সন্ন্যাসী নিমাইয়ের তর্জন-গর্জন শোনেন। লজ্জিত হয়ে ভাবেন—আমি যেমন চুরি ক'রে দেখতে এসেছিলাম তেমনি উপযুক্ত শাস্তিই আমার হয়েছে; তবু প্রভুর কীর্তন-নৃত্য যে কিছুক্ষণ দেখতে পেয়ে নয়ন সার্থক করলেম, এই আমার পরম ভাগ্য। মাথা নীচু ক'রে সন্ন্যাসী শ্রীবাসের গৃহ থেকে বেরিয়ে যান। কিছুদূর যেতেই একজন ভক্ত গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। প্রভু আহ্বান করেছেন। সন্ন্যাসী ফেরেন। বুক তাঁর দুরু দুরু করে—আরো কিছু লাঞ্ছনা বুঝি আছে তাঁর অদৃষ্টে। তবু সব-কিছু মাথা পেতে নিতে তিনি প্রস্তুত।

সন্ন্যাসীর নম্র আচরণে প্রভু প্রসন্ন হয়েছেন। সন্ন্যাসী ফিরে নিমাইয়ের স্নিগ্ধ সুন্দর চোখের দিকে চেয়েই তা বুঝতে পারেন। তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। প্রভু সন্ন্যাসীর মস্তকে শ্রীচরণ তুলে দেন, বলেন—তপস্যা ক'রে বললাভ করেছ ব'লে গর্ব করো না; বিষ্ণুভক্তিই শ্রেষ্ঠ বল।

কৃপাধন্য সন্ন্যাসীর চোখে নামে আনন্দের অশ্রু। ভক্তগণ হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠেন।

*　　　*　　　*　　　*

শ্রীবাসের গৃহে আনন্দের মহোৎসব চলে কিন্তু সাধারণ লোক তার আস্বাদ পায় না। যাদের মনে আগ্রহ হয় প্রবল, যারা শ্রীনিমাইকে দর্শনের জন্য উৎসুক হয়, তারা প্রভাতে শ্রীবাসের বহির্দরজার পাশে সমবেত হয়। কীর্তন ও নৃত্যের অবসানে ভক্তগণসহ নিমাই চলেন গঙ্গাস্নানে। অনুরক্ত জন তখন

তাদের নয়ন সার্থক করে। কেউ বা ফলমূল, পুষ্পমাল্য, ভোজ্যদ্রব্যের ভক্তি-উপহার নিয়ে যায় তাঁর গৃহে। তিনি তাদের আশীর্বাদ ক'রে মধুরকণ্ঠে উপদেশ দেন—কৃষ্ণনাম করো। নামকীর্তনই ভজনা, নামকীর্তনই আরাধনা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

—এই হ'ল মহামন্ত্র। এই মন্ত্রজপ হ'ল সাধনা—এ থেকেই সর্বসিদ্ধি পাবে। দশ-পাঁচজনে মিলে নিজ দুয়ারে বসে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করো; পরিবারের সকলে মিলে ঘরে বসে কীর্তন করো—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

প্রভুর শ্রীমুখ থেকে মন্ত্রলাভ ক'রে দর্শনার্থীরা গৃহে ফেরে। সাধনার সহজ পদ্ধতি যেন খুঁজে পায়। নিমাই তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে উপদেশ দেননি। তারাই এসেছে গ্রহণ করার জন্য। এইটেই উপযুক্ত ব্যবস্থা। নদীতে জোয়ার না এলে স্রোতের বিরুদ্ধে উজানো কঠিন। দক্ষ মাঝি তার মাল-বোঝাই নৌকা নদীর উজানে নেবার জন্য জোয়ারের প্রতীক্ষা করে। দক্ষ চাষী অনাবাদী জমিতে বীজ বপন করে না; জমি সরস, কর্ষিত হওয়া চাই। নিমাই জন-সাধারণের মনের নদীতে ভক্তি-ভাবের জোয়ারের প্রতীক্ষা করছেন; চেয়েছেন তারা নিজ নিজ মন-জমিন আবাদ করার জন্য প্রস্তুত হোক,- তখন সময় বুঝে বিছন ছিটালে ফসল ধরবে। কাঁটা-জঙ্গলে শস্যের বীজ ছড়ালে কী লাভ? পাথুরে জমিও কোমল অঙ্কুর উদ্গমের পক্ষে অনুকূল নয়।

* * * *

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে আসে। সমতলভূমিতে এসে সে স্নিগ্ধশীতল পুণ্যপ্রবাহ শতধারায় বিভক্ত হয়ে যায়; ভূমিকে করে উর্বর শ্যামল শস্যসমৃদ্ধ। শ্রীবাসের বদ্ধ অঙ্গনে যে কীর্তনের গঙ্গোত্রী রচিত হয়েছিল, তা থেকে প্রবাহ ক্রমে নবদ্বীপময় ছড়িয়ে পড়লো। দ্বারে দ্বারে নামকীর্তনের ধ্বনি, খোল করতালের সঙ্গে হরিনামের ঝঙ্কার। সমগ্র সন্ধ্যায় যেন নব-চেতনার উদ্দীপনা, আনন্দের কল-কোলাহল। মুসলমান শাসকের কাছে এতখানি হিন্দুয়ানি অসহ্য বোধ হ'ল। আঘাত দিয়ে তিনি এই প্রবল জলতরঙ্গ থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু জোয়ার যখন উদ্দাম হয়ে নদীর মোহানায় প্রবেশ করে, তখন তাকে কে ঠেকাতে পারে?

একদিন সন্ধ্যায় নগর-ভ্রমণকালে কাজী দেখেন নগরবাসিগণ হরিনাম গানে মেতে উঠেছে। চতুর্দিকে মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খধ্বনি। কাজীর ক্রোধ জেগে ওঠে। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দু-প্রজার এত সাহস! যাকে হাতের কাছে পান তাকেই মারেন, মৃদঙ্গ ভেঙে চূর্ণ ক'রে দেন। তর্জন-গর্জন করেন—যে এমনি হৈ হুল্লোড় করবে তাকেই শাস্তি দেব; দেখি নিমাই আচার্য তোদের কেমন ক'রে রক্ষা করতে পারে! আজ ক্ষমা ক'রে গেলাম, কিন্তু সাবধান, আর একদিন ধরতে পারলেই জাত নেব।

এর পর থেকে কাজী প্রতিদিন লোকজন সঙ্গে নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়ান। সন্ধান নেন কে আবার কীর্তন করে। নিরীহ প্রজারা প্রকাশ্যে কীর্তন করতে সাহস পায় না। নৈরাশ্যে মন তাদের ভরে যায়। নিমাইয়ের বিরুদ্ধ সমালোচক যারা তাদের সন্তোষ দেখে কে। বলে—কেমন, এখন যোগ্য শাস্তি হয়েছে তো! হরিনাম করবে মনে মনে, এমন হুড়াহুড়ি করার কথা কোন্ পুরাণে বলেছে? বেদের বাক্য লঙ্ঘন করলে এমনি শাস্তিই হয়। এখন নিমাই পণ্ডিত এসে এদের পক্ষে দাঁড়ান। তাঁর এত যে অহঙ্কার এইবার কাজীর কাছে তা সব চূর্ণ হবে।

ম্রিয়মাণ ভক্তগণ নিমাইয়ের কাছে তাঁদের দুঃখের কথা নিবেদন করেন—কাজীর অত্যাচারে কি ধর্ম লোপ পাবে? তোমার আদেশে প্রজারা কীর্তন করতে উৎসুক কিন্তু লাঞ্ছনার ভয়ে সাহস পায় না। দুষ্টের দমন না করলে শিষ্ট যে বিপন্ন হয়, প্রভু।

কীর্তনে প্রতিবন্ধকের কথা শুনে ক্রোধে বিশ্বম্ভর রুদ্রমূর্তি হয়ে ওঠেন। হুঙ্কার দিয়ে বলেন—সকল নবদ্বীপে আজ কীর্তন করবো, দেখি কে আমার কি করতে পারে। পোড়াও কাজীর ঘরদোর। সাবধান নিত্যানন্দ, যাও সকল বৈষ্ণবকে সংবাদ দাও। সর্বত্র আমার আজ্ঞা প্রচার করো। একটি ক'রে মশাল নিয়ে আসবে সবাই। ভয়ের লেশমাত্র মনে রাখবে না। আমি থাকতেও ভয়? বিকালে আহার শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

ভক্তগণ উল্লসিত হয়ে হরিধ্বনি ক'রে ওঠেন। ছুটে চলেন নিজ নিজ গৃহের দিকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা নবদ্বীপে প্রচার হয়ে যায় যে, সন্ধ্যাবেলা নিমাই নগর-সংকীর্তনে বেরুবেন। পুরুষেরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে আয়োজন করতে থাকে। প্রত্যেকে একটি ক'রে মশাল তৈরি করে, কেউ বা তার বেশী করে। বড় বড় ভাঁড়ে ক'রে তেল নেয়। অনেকক্ষণ ধরে মশাল

জ্বালিয়ে রাখতে হবে যে। সন্ধ্যার আগেই কাতারে কাতারে লোক এসে নিমাইয়ের বাড়ীর কাছে জমা হয়। নিমাই সঙ্গে থাকবেন; তাই সবাই নির্ভয়। সকলের মনে আইন-অমান্য করার উন্মাদনা আর ধারণা যে, একটা বিস্ময়কর কিছু ঘট্‌বে, যেমন ঘটেছিল জগাই-মাধাইকে নিয়ে।

সংকীর্তনের দল প্রস্তুত হয়। কীর্তনীয়াদের চার দলে ভাগ ক'রে দীর্ঘ শোভাযাত্রার বিভিন্ন স্থানে তাদের স্থান ক'রে দেওয়া হয়। সকলের পুরোভাগে অদ্বৈত আচার্যের দল, তার পরে হরিদাসের দল, মাঝখানে শ্রীবাসের দল, সর্বশেষে নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই ও তাঁর সঙ্গী গায়কগণ।

গোধূলি সময়ে সবাই আনন্দে হরিধ্বনি ক'রে দীপ জেলে নিল। কীর্তনীয়াদের অঙ্গে আবীর চন্দন; কণ্ঠে ফুলের মালা, হাতে করতাল মন্দিরা। অভিনব অভিযানের জন্য উন্মুখ হয়ে সবাই সর্বাধিনায়ক শ্রীনিমাইয়ের আগমন অপেক্ষা করছে। এমন সময় মনোহর শোভায় শোভিত ঠাকুর গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।

জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ যেন; পরিধানে পরম নির্মল সূক্ষ্ম বসন, 'ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু সনে'; অঙ্গে দোলে আজানুলম্বিত মালা। অপূর্বসুন্দর সুঠাম দেহ। ক্ষীণ কটি; প্রশস্ত বক্ষ, তাতে শোভা পায় রজতশুভ্র অতি ক্ষীণ যজ্ঞসূত্র। সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর; যে যেখানে আছে সেখান থেকেই দেখতে পায় নিমাইয়ের চোখ-জুড়ানো রূপ, মালতীর মালায় শোভিত তাঁর চাঁচর কেশদাম।

কীর্তনের দল ক্রমে এগিয়ে চলে। হরিনামের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। নগরের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সবাই মেতে ওঠে অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতিতে। প্রতি গৃহের সম্মুখে নারিকেল আম্রসারসহ পূর্ণঘট; প্রভুকে অভ্যর্থনার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালা; মঙ্গলাচরণের উপকরণ দিয়ে প্রণতি-নিবেদন। নিমাইকে দর্শনমাত্র মহিলারা খই ফুল কড়ি ছিটিয়ে আনন্দে হুলুধ্বনি ক'রে ওঠেন। সমগ্র পথ হয়ে যায় পুষ্পময়।

সারা নবদ্বীপে সেদিন উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যায়। নিমাইয়ের অনুরাগী জন ভাবে—প্রভুর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখা যাবে; কীর্তনে বিঘ্ন করে যারা তারা আজ দলিত হবে; নামের মহিমা আর প্রভুর মহিমা নূতন ক'রে নদীয়ার লোক দেখতে পাবে। নিমাইয়ের শত্রুপক্ষ ভাবে, কাজীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে আজ নিমাইয়ের ঠাকুরালি দেখা যাবে! সাঙ্গপাঙ্গ যতই

লাফালাফি করুক, কাজীর দলবল যখন রুখে আসবে তখন এই হৈ হুল্লোড়েদের গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। উভয় পক্ষই উল্লসিত।

কীর্তনীয়াদের দীর্ঘ দল ক্রমে এগিয়ে চলে কাজীর বাসভবনের দিকে। মৃদঙ্গ করতাল মন্দিরার শব্দের সঙ্গে সমবেত বহুজনের উচ্চকণ্ঠ গগনভেদী হয়ে ওঠে। যেন বিজয় অভিযান। পথে কোন রকম বাধা-প্রতিবন্ধক আসে না; কাজীর লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। ভক্তরা ভাবে, কাজী ভয়ে কুণ্ঠিত হয়েছে। তাই তাদের উল্লাস দীপ্ত হয়ে ওঠে। কাজীর বাসগৃহের কাছে গিয়ে জনতা উন্মত্তের মতো আচরণ করতে থাকে। পুষ্পোদ্যান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; ফলবান বৃক্ষের ডালপালা ভেঙে লণ্ডভণ্ড করতে থাকে বিজয়ী অভিযাত্রীদল। কাজী গৃহের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন; নিরস্ত করার কোন চেষ্টা নাই। নিমাই নিজেই সঙ্গীদের শান্ত হ'তে উপদেশ দিয়ে কাজীকে আহ্বান করলেন। কাজী এলেন। ভীত চকিত। সে দম্ভ নাই; কীর্তনকারীদের খোল-ফাটানো, মারমুখী ঔদ্ধত্য নাই; হিন্দুয়ানি-ধ্বংসকারী উগ্র তেজ নাই। কাজী এখন সঙ্কুচিত, যেন একান্ত ভালো মানুষ।

নিমাই রসিকতা ক'রে বলেন: কাজীসাহেবের বাড়ীতে আমরা আজ অভ্যাগত কিন্তু আপনি বাসার ভিতরে চুপ ক'রে রয়েছেন; ব্যাপার কি?

কাজী আমতা আমতা করেন, বলেন: যে অবস্থা দেখছি, একটু শান্ত না হ লে কি ক'রে আসি বলো।

—তা বটে! কিন্তু এত হিন্দুয়ানি দেখেও খোল-করতাল ভাঙার জন্য ফৌজ হাঁকিয়ে দেন নাই কেন? আপনি তো এ-সব বারণ করেছিলেন; তবে আজ সহ্য করছেন কেমন ক'রে?

কাজী নতমস্তকে নীরব হয়ে থাকেন। পরে বলেন: তোমার নানা নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম-সম্পর্কে আমার চাচা। কাজেই আমি তোমার সম্পর্কে মামা। মামা-ভাগনে বিরোধ করা ঠিক না; তাই আর কোন গণ্ডগোল না হয় এই আমি চাই।

নিমাই বিদ্রূপের হাসি হাসেন। বলেন—কিন্তু মামু, হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি হ'ল কেন? সম্পর্ক তো আগে থেকেই ছিল? আসল কথাটি কি?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে, এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রে কাজী অবশেষে সত্য কথাটি বলেন। বলেন—তিনি কতকগুলো ব্যাপারে অলৌকিক শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করেছেন। কীর্তন বন্ধ করতে যারা গেছে তাদের মুখে চোখে

অকস্মাৎ এসে লেগেছে আগুনের ঝল্‌কা অথচ ধারে কাছে কোথাও আগুন নাই। একজন দুজনের নয়; যারা দমন করতে গেছে তাদের সকলেরই এমনি অবস্থা ঘট্‌তে স্বরু করেছিল। তা ছাড়া কাজী নিজেও শাস্তির ভয় পেয়েছেন। স্বপ্নঘোরে এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তি দেখেছেন তিনি। সে মূর্তি তাঁকে শাসিয়ে গেছে—বলেছে আর কখন অত্যাচার করলে খোলের চামড়ার মতো তাঁর বুক চিরে ফেলবে। কাজীর ধারণা হয়েছে, নিমাই পণ্ডিতের ক্ষমতাবলেই এ-সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে; কাজী তাই আর উৎপীড়ন করার সাহস পাননি। তিনি দেখেছেন হাজার হাজার লোক যাঁর ইঙ্গিতমাত্র পেয়ে প্রাণভয় তুচ্ছ ক'রে সমবেত হয়, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন। আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে যার কারণ তিনি নির্ণয় করতে পারেন নি। যে-সব মুসলমান কাজীর আদেশে কীর্তনীয়াদের শাসন করতে গেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ করেছে; বলেছে—কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস, সদাই বল 'হরি হরি' আর বুঝি মনে মনে ভাব কার ঘরে চুরি করবে! এর পর থেকে তার জিহ্বাও অবিরত 'হরি হরি' বলে, চেষ্টা ক'রেও ছাড়াতে পারে না। নিমাই শুনে মৃদু মৃদু হাসেন। কাজী বিগলিত-প্রায়। বলেন—হিন্দুর ঈশ্বর যাঁকে সবাই বলে 'নারায়ণ', আমার মন বলে তুমি সেই। প্রভু হাসতে হাসতে কাজীকে স্পর্শ ক'রে বলেন—তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শোনা গেল, এ বড় বিচিত্র! 'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' তিন নামই তুমি উচ্চারণ করলে, তুমি পবিত্র হয়ে গেলে; তুমি বড় ভাগ্যবান, বড় পুণ্যবান।

প্রেমের ছোঁয়ায় কাজীর ভাবান্তর ঘটে; দেহ পুলকিত হয়, দুই চোখে নামে আনন্দের অশ্রু। আত্মহারা হয়ে প্রভুর চরণ স্পর্শ ক'রে বলেন—তোমার প্রসাদে আমার কুমতি দূর হয়েছে। এই কৃপা কর যেন তোমাতে ভক্তি থাকে।

নিমাই বলেন—তোমার কাছে একটি দান চাই—নবদ্বীপে যেন সংকীর্তনে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটে।

কাজীর তখন অদেয় কিছু নাই। নিজের প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করতে পারেন, এমন অবস্থা। বলেন—আমার বংশের সন্তান-সন্ততি কোন দিন সংকীর্তনে বাধা দেবে না, এই আমার শপথ।

প্রফুল্লমনে নিমাই উঠে দাঁড়ান। সঙ্গী জন আনন্দে হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠেন। আবার কীর্তনের উল্লাসে উৎফুল্ল জনতা নিমাইয়ের গৃহের দিকে ফিরে চলে।

আনন্দধ্বনি গগনভেদী হয়ে ওঠে। তাদের বিজয়োল্লাস প্রকাশ পায় হুঙ্কারে গর্জনে নৃত্যে। যারা কীর্তনকারীদের লাঞ্ছনা কামনা করেছিল তারা হয় ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ। ভাবে—কাজী এত শক্তিমান কিন্তু আজ এমন ভয় পেয়ে গেল কেন।

* * * *

ভক্তি আর নিষ্ঠা সংসারী মানুষকেও কতখানি সহন-ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে, শ্রীবাসের মহৎ জীবনে তার পরিচয় মেলে। শ্রীবাস গৃহী, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতা-মিত্র প্রভৃতি পরিজন নিয়ে বাস করেন। শ্রীসম্পন্ন সংসার। কিন্তু অন্তর তাঁর সংসারমুখী নয়—ঈশ্বরমুখী। নিমাই তাঁর কাছে আরাধ্য দেবতা, তাঁর প্রাণের ঠাকুর। প্রভুর সেবা ক'রে তিনি জীবন সার্থক মনে করেন। এ ভক্তি খাঁটি সোনা, এতে স্বার্থবুদ্ধির খাদ নেই।

শ্রীবাসের গৃহে অন্যান্য দিনের মতো নামকীর্তন চলেছে। নিমাই আর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ গায়ক। নিমাই ভক্তিভরে মধুর নৃত্য করছেন, সঙ্গে আছেন শ্রীবাস; আনন্দরসে সবাই ডগমগ। গৃহের অভ্যন্তরে একবার অস্ফুট কলরোল উঠলো। শ্রীবাস গেলেন ভিতরে। সব নীরব। নৃত্য এবং কীর্তন চলেছে আগের মতোই।

শ্রীবাস ভিতরে গিয়ে দেখেন, তাঁর যে বালক-পুত্রটি অসুস্থ ছিল তার প্রাণ-বিয়োগ ঘটেছে। সন্তানের জননী ও অন্যান্য পরিজনদের শোকাকুল রোদন-ধ্বনি উঠেছে মৃত বালকের শয্যা ঘিরে। শ্রীবাসকে দেখে তাঁদের শোক প্রবল হয়ে উঠে কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। অবিচলিত শান্তকণ্ঠে সকলকে নীরব হ'তে বলেন এবং অনুযোগের স্বরে বলতে থাকেন—ছি ছি! তোমরা করছো কি! প্রাঙ্গণে স্বয়ং প্রভু নৃত্য করছেন; তোমরা কোলাহল ক'রে তাঁর কীর্তন-বিলাসের আনন্দ ভঙ্গ করবে? এতে যে আমার দুঃখের অন্ত থাকবে না।

ছেলের সময় পূর্ণ হয়েছে, সে চলে গেছে। অন্তিমকালে যার নাম একবার মুখে উচ্চারণ করলে মহাপাতকী-ও উদ্ধার পেয়ে যায়, সেই প্রভু আনন্দে বিরাজ করছে এই গৃহে। এমন সময়ে দেহত্যাগ করা তো পরম সৌভাগ্যের কথা। তোমরা শান্ত হয়ে থাক। শোক ভুলতে যদি না পার, পরে কান্নাকাটি ক'রো কিন্তু এখন আর বিঘ্ন ক'রো না। তবু তোমরা যদি কলরব ক'রে প্রভুর আবেশ ভঙ্গ করো, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেব।

শ্রীবাসের কণ্ঠস্বরে, আচরণে সবাই বুঝতে পারেন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ দমন ক'রে রাখতে হবে নতুবা আরো বিষম অনর্থ ঘট্‌বে। মৃত বালকের শয্যা ঘিরে পরিজনরা নীরবে মূক হয়ে বসে থাকেন ; সবাই যেন পাথর হয়ে গেছেন। বাইরে কীর্তন চলেছে পূর্বের মতোই। ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে নিমাই নৃত্য করছেন। শ্রীবাস ফিরে যান কীর্তনের উৎসবে ; তিনিও তাতে যোগ দেন। পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে কীর্তনের লীলা। একই গৃহের বহিরঙ্গনে সঙ্গীতমুখর আনন্দ, অন্তঃপুরে স্তব্ধ মৌন শোক। মৃত পুত্রকে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে রেখে এসে পিতা সেই আনন্দ-যজ্ঞে আত্মহারা হয়ে গেছেন !

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেছে। ভক্তগণ কেউ কেউ ভিতরের অবস্থা জানতে পেরেছেন। যিনিই শুনেছেন তিনিই নীরব হয়ে গেছেন, কীর্তনোল্লাসে যোগ দিতে পারেননি। অবশেষে নিমাই শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করেন—পণ্ডিত, আমার চিত্ত যেন কেমন ব্যাকুল হয়েছে ; তোমার গৃহে কোন অমঙ্গল হয়নি তো ?

ভক্তশিরোমণি শ্রীবাস বলেন—তুমি প্রসন্নমুখে আমার গৃহে বিরাজ করছো, আমার আর দুঃখ কি ! অমঙ্গলই বা কি ! অন্যান্য ভক্তগণ প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেন। শুনে নিমাই স্তম্ভিত ! জিজ্ঞাসা করেন—কতক্ষণ আগে এ ঘটনা ঘটেছে। শ্রীবাস বলেন—আড়াই প্রহর হ'ল। এখন অনুমতি দাও, সৎকারের ব্যবস্থা করি। এই অদ্ভুত কথা শুনে নিমাই 'গোবিন্দ গোবিন্দ' স্মরণ করেন। আত্ম-সম্বরণ করতে না পেরে তিনি বালকের ন্যায় আকুল হয়ে রোদন করতে থাকেন। বলেন—আমার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যে পুত্র-শোক গ্রাহ্য করে না, এমন লোকের সঙ্গ আমি কেমন ক'রে ছেড়ে যাব !

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নিমাইয়ের মনের গোপন একটি বাসনার ইঙ্গিত পায় ভক্তগণ। প্রভু কি তবে সংসার-ত্যাগের বাসনা মনে পোষণ করছেন ? তাই শ্রীবাসের মতন নিষ্ঠাবান পরম ভক্তকেও পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে ভেবে তিনি আকুল হয়েছেন। একে শ্রীবাসের পুত্রশোকের সমবেদনায় ভক্তদের অন্তর পূর্ণ, তার ওপর প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে তাঁরা নিতান্ত অসহায়বোধ করেন। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁরাও আকুল হয়ে রোদন করতে থাকেন। কেবল শ্রীবাস প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ, রাজর্ষি জনকের মতো স্থিতধী। পুত্রের মৃতদেহ বাইরে আনা হয়। শোকার্ত পরিজনদের সান্ত্বনার জন্য নিমাই এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখালেন। মৃত পুত্রকে

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে তুমি কেন চললে, বাছা? প্রশ্ন স্বাভাবিক কিন্তু প্রাণহীন দেহের কাছ থেকে উত্তর কামনা ক'রে এমন প্রশ্ন কে করতে পারে! পরমুহূর্তে সমবেত সকলের চমক লাগে। মৃত ব্যক্তির মুখে ভাসা ফোটে; স্বাভাবিক শিশুকণ্ঠে, পরম বিজ্ঞের মতো উত্তর। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে দর্শকজন বিস্মিত।

শিশু বলে—যতদিন নির্বন্ধ ছিল পুত্ররূপে পণ্ডিতের গৃহে ছিলাম। এ-দেহের নির্বন্ধ শেষ হ'ল আর তো এখানে থাকতে পারিনে। কে কার বাপ? কে কার ছেলে? সবাই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। আমার ভোগফল শেষ হয়েছে; তোমার ইচ্ছাতেই প্রভু, এখন চললেম অন্য পুরে। আমার অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর। সপার্ষদ্ তোমার চরণে নমস্কার ক'রে আমি বিদায় নিই।

বালক নীরব হ'ল। বালকের দেহ ঘিরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের চোখে নামল অশ্রুর বান; আনন্দ ও প্রেমের অশ্রু। আত্মীয়-স্বজন ভাবেন বালক চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল না; শিশুর এই যে দেহান্তর এ-ও ঈশ্বরেরই বিধান। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক লোক থেকে অন্য লোকে, এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তর। জীবন-লীলার বিচিত্র নাট্যে মানুষ অভিনয় ক'রে চলেছে। যার অংশ যখন শেষ হয়ে যায়, সে তখন নাট্যমঞ্চ থেকে চলে যায় নেপথ্যে, হয়ত নূতন রূপে আত্ম-প্রকাশের জন্য। এ-সবই অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এক মহাশিল্পীর নিগূঢ় ইঙ্গিতে। জীবন ও মৃত্যু একই ছন্দে বাঁধা।

ক্ষণিকের জন্য হ'লেও শ্রীবাসের পরিজন মৃত্যুশোক ভুলে যান। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে তাঁদের হৃদয় হয় পরিপূর্ণ। শ্রীবাস তাঁর তিন ভাইসহ নিমাইয়ের চরণে লুটিয়ে পড়েন; তাঁদের চোখের জলে প্রভুর চরণ ভেজে। কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ওঠে চতুর্দিকে; শ্রীবাসের গৃহ কৃষ্ণপ্রেমময় হয়ে যায়। নিমাই শ্রীবাসকে বলেন—পণ্ডিত, তুমি তো সংসার-চরিত সবই জান। এ-সব দুঃখ-শোকে তোমার কি দায়? এখন থেকে আমি আর নিত্যানন্দ হলেম তোমার দুই পুত্র; তুমি আর মনে কোন ব্যথা রেখো না। নিমাইয়ের এই মধুময় প্রবোধ-বাক্যে ভক্তগণ জয়ধ্বনি ক'রে ওঠেন। ধন্য শ্রীবাস, ধন্য তাঁর আরাধ্য প্রভু। ভক্তবৃন্দসহ নিমাই শিশুর মৃতদেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে যথারীতি সৎকার সম্পন্ন ক'রে এলেন; তারপর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন সবাই। শ্রীবাসের গৃহে শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল।

* * * *

দিন দিন নিমাইয়ের হৃদয়ে ভক্তির আবেগ বাড়তে থাকে। তিনি আর স্বাভাবিকভাবে নিত্যপূজা অর্চনাও করতে পারেন না। পূজা করতে বসলে চোখের জলে কাপড় ভিজে যায়; বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে আবার পূজা করতে বসেন; আবার সেই একই অবস্থা। কৃষ্ণপ্রেমে মন এমন পাগল যে, দেহবোধ থাকে না। অবশেষে গদাধরকে বলেন—ভাই, তুমিই পূজা করো, আমার ভাগ্যে নাই।

নিমাইয়ের ভাবাবেগ অসাধারণ। সাধারণ লোকে তার ধারণা করতে পারে না। নিজের মনোজগতে নিজে সম্পূর্ণরূপে ডুবে গিয়ে আত্মহারা হয়ে থাকেন, তাঁর মনে কী লীলা চলেছে তা অনেক সময় একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গীরাও বুঝতে পারেন না। প্রেমভক্তির এক অভিনব প্রকাশ দেখা দেয় তাঁর আচরণে। বাড়ীতে সঙ্গোপনে থাকেন, কারো সঙ্গে কথা বলেন না, নিজেই কেঁদে আকুল হন। সময় সময় এদিকে-ওদিকে চকিতভাবে দৃষ্টিপাত করেন। সঙ্গীদের বলেন—দেখতো বাইরে কে এসেছে। একজন উঠে গিয়ে বাড়ীর চারিদিক ঘুরে আসেন, বলেন—কই কেউ নাই তো! শুনে একটু আশ্বস্ত হন। ভাবেন—তবে আমার কৃষ্ণকে কেউ নিতে আসেনি।

কিন্তু এ আশ্বস্ত ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। একদিন ভক্তদের সঙ্গে বসে আছেন; হঠাৎ বললেন—অক্রূর তোমাকে মিনতি করি, তুমি আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে নিয়ে যেও না। কৃষ্ণ গেলে আমি বাঁচব কেমন ক'রে! এই ব'লে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গীরাও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের তিনি বললেন—তোমরা যে কিছু বলছো না? তোমরা সবাই চুপ ক'রে রইলে কেন? কৃষ্ণকে নিয়ে গেল তা কি তোমরা দেখছ না!

নিমাই নিবিড় প্রেমরসের যে নিকুঞ্জ তৈরি ক'রে নিয়েছেন নিজের অন্তরে, তা তাঁর কাছে একান্তই সত্য। সেখানে চলে কৃষ্ণপ্রেমের লীলা। সেখানে তিনি কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী রাধিকা, কৃষ্ণের বিরহ তাঁর কাছে অসহ। ভক্তবৃন্দ এই মানস-বৃন্দাবনের আভাসমাত্র পেয়ে আকুল হয়ে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন।

মনোলীলায় কৃষ্ণের সঙ্গচ্যুত হয়ে নিমাই অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ভাবেন—কৃষ্ণ বড় নিষ্ঠুর; তিনি সরলপ্রাণা প্রেমময়ী গোপীগণকে মোহিত ক'রে বিনা দোষে তাদের পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন! অভিমানে তিনি

কৃষ্ণের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণনামের পরিবর্তে গোপী-নাম জপ করতে থাকেন। নিঃস্বার্থ গভীর অনুরাগে গোপীদের সমকক্ষ আর কে! কৃষ্ণ যখন তাঁর মানসকুঞ্জ থেকে চলেই গেলেন তখন তিনি আর সেই নির্দয় প্রেমিককে আরাধনা করবেন কেন!

এমনি সময়ে একদিন নিমাইয়ের পূর্ব-সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন নিমাইয়ের বাড়ীতে। নিমাই তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত। কৃষ্ণবিরহে গোপী-নাম জপ করছেন। গোপী-নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে বিস্মিত হয়ে তিনি বলেন—একি নিমাই, কৃষ্ণনামের পরিবর্তে গোপী-নাম জপ কোন্ শাস্ত্রে লেখে? এ কী করছো তুমি!

—কৃষ্ণ বড় নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরকে ভজনা ক'রে কী লাভ? কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ ক'রে তাই গোপী-নাম গ্রহণ করেছি।

আগম-বাগীশ শাস্ত্রবিদ্যায় বাগীশ কিন্তু ভক্তিতত্ত্বে শুষ্ক মরু। নিমাইয়ের মানস-ভাবান্তর উপলব্ধি করতে পারেন না তিনি। জিভ কেটে বলেন—ছি, ছি! কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ; এতে মহা অপরাধ হয়। তুমি গোপী-নাম ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণনাম জপ কর। অকস্মাৎ নিমাই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন—তুমি বুঝি কৃষ্ণের দূত! বের হও আমার নিকুঞ্জ থেকে, এক্ষুনি বের হও—ব'লেই একখানা লাঠি নিয়ে তাড়া করেন আগম-বাগীশকে। আগম-বাগীশ ঠিক এই ধরনের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে তিনি নিমাইয়ের গৃহ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন। কিছুটা পিছু ধাওয়া ক'রেই নিমাই বাহ্যজ্ঞান ফিরে পান; লজ্জিত হয়ে বসে থাকেন গৃহকোণে। প্রাণ নিয়ে ফিরে গিয়ে আগম-বাগীশ তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফলাও ক'রে নিমাইয়ের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ ও আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেন। তাঁদের আত্ম-মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। নিমাইকে তাঁরা তাঁদের মতোই সাধারণ একজন মনে করেন। তিনি তো দেশের রাজা নন! তাঁর কাছ থেকে তাঁরা লাঞ্ছনা সহ্য করবেন কেন! পরামর্শ করা হয়—নিমাই আবার কখনো এরূপ করলে তাঁকেও প্রহার করা হবে। ভাবের মিলন না ঘট্‌লে, কিংবা ভাবের স্বরূপ জানা না থাকলে এমনি বিড়ম্বনা ঘটাই স্বাভাবিক।

বাগীশের দলের অভিপ্রায় নিমাইয়ের কাছে অবিদিত থাকে না। তিনি মনে মনে ব্যথা অনুভব করেন। যিনি চান সকলের হিত, সর্বসাধারণের জন্য সকল রকম দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত, তাঁকেই উল্টো বোঝেন শুষ্ক বিদ্যার

অভিমানী দল। একদিন গঙ্গাতীরে ভক্তদের সঙ্গে যখন নিমাই বসেছিলেন, তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন—কষ্ট নিবারণের জন্য পিপ্পলীখণ্ড করলেম, কিন্তু উপকার না হয়ে কফ বৃদ্ধি পেতে লাগল। অন্যান্য ভক্তগণ এ-কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না, শুধু হাসিতে যোগ দিলেন। নিতাই বুঝলেন এর নিগূঢ় অর্থ। তিনি স্বভাবচঞ্চল, হাস্যময় কিন্তু এখন নীরব হয়ে থাকলেন। তিনি বুঝলেন, প্রভু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবেন। এতদিন যেভাবে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে যথেষ্ট সুফল পাননি, বরং প্রতিকূলতা পেয়েছেন। এখন তিনি জীবনে নূতন এক অধ্যায়ে নূতন রূপে আত্ম-প্রকাশ করবেন। মাতা, পত্নী, ভক্তজন সকলের সঙ্গে প্রভুর বিচ্ছেদের কথা চিন্তা ক'রে নিতাইয়ের মন বিষাদে ভরে উঠলো। তিনি নীরব হয়ে রইলেন।

পরে নিমাই নিতাইয়ের কাছে একান্তে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। বললেন—শহরের লোকে আমায় প্রহার করতে সঙ্কল্প করেছে। আমি সংসারী মানুষ ব'লেই তাদের পক্ষে এরূপ চিন্তা করা সম্ভবপর হয়েছে। সন্ন্যাসীকে কেহ পীড়ন করে না, সকলেই সমাদর করে। আমি যদি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হই, তবে আমার ওপর তো আর কারো বিরূপভাব থাকবে না। আমার সংসারের সুখ-ভোগে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আমি যাব সকলের দ্বারে দ্বারে, বিলাব মধুর হরিনাম। গৃহী অপর সকল গৃহীর মতোই একজন। তার কাছে লোকে কিছু শিখতে চায় না ; তাকে বড় ব'লে মানতেও আত্ম-সম্মানে বাধে। জীব উদ্ধারের জন্যই আমাকে অধিকতর দুঃখ ও ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি তোমার উপদেশ ভিক্ষা করি।

নিতাই প্রভুর কথায় অধোবদনে রোদন করতে থাকেন। তাঁর অনুমানই সত্য হ'তে চলেছে। বলেন—প্রভু, তুমি ইচ্ছাময় ; তোমার যা ইচ্ছা তাই তোমার কর্তব্য। তোমার মনে যা উদিত হয়েছে তা একান্তই সত্য। তুমি যা কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করেছ, তাতে তোমাকে বাধা দেবে কে ? তেমন শক্তিই বা আছে কার ? তুমি মঙ্গলময়, কি করলে লোকের মঙ্গল হবে তা তুমিই জান। কিভাবে জগৎ উদ্ধার করবে তা-ও তুমিই জান। তবু তোমার কাছে এই অনুরোধ, তোমার অভিপ্রায় তোমার ভক্তবৃন্দের কাছে প্রকাশ ক'রো, তাদের বক্তব্য শোনো ; তারপর তাদের প্রবোধ দিয়ে শান্ত ক'রে

তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ ক'রো। তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে এমন কে আছে ?

নিত্যানন্দের কথায় প্রভু খুশি হন। বলেন—শ্রীপাদ, ব্যস্ত হয়ো না, আমি এখনই যাচ্ছিনে। প্রভুর অন্তরঙ্গবৃন্দ এতদিন প্রেমভক্তির আনন্দ-সাগরে মগ্ন ছিলেন; তাঁদের কাছে এই সঙ্কল্প বেদনাদায়ক ব'লে মনে হবে কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দুঃখ সহ্য করাতেই সত্যকারের অগ্নিপরীক্ষা। প্রভু নিত্যানন্দের কাছে সংসার-ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে তাঁর পার্ষদদের মানসিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত করলেন। নিমাইয়ের জীবন-নাট্যে যে নূতন বৈচিত্র্যময় অঙ্ক সুরু হবে তারই আভাস উঠলো ফুটে।

## গৃহত্যাগ

মুকুন্দ নিমাইয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক। ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নামকীর্তন করেন। নিমাই যখন সেই কীর্তনের আনন্দ আস্বাদন করেন, ভাববিহ্বল হয়ে উল্লাসধ্বনি করেন, হুহুঙ্কার ক'রে উৎসাহ দেন, তখন মুকুন্দ আত্মহারা হয়ে পড়েন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কাছে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করার পর প্রভু অন্যান্য ভক্তদের কাছেও পৃথক পৃথকভাবে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। একাকী মুকুন্দের বাড়ীতে গিয়ে প্রভু উপস্থিত হ'তেই মুকুন্দ সানন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। নিমাই বলেন—তোমার মুখে কৃষ্ণগীত শুনতে এসেছি ; তোমার মধুরকণ্ঠে গাও তো মুকুন্দ।

মুকুন্দের কণ্ঠে গান শুনে অপার আনন্দে প্রভু হুঙ্কার ক'রে 'বোল বোল' রব করতে থাকেন ; মুকুন্দের শক্তি যেন শতগুণে বেড়ে যায়। অবশেষে ভাব সম্বরণ ক'রে নিমাই তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ; বলেন—মুকুন্দ, আমি গৃহবাস পরিত্যাগ ক'রে, শিখাসূত্র বিসর্জন দিয়ে করঙ্গধারী হব আর দেশে দেশে ভ্রমণ করবো মনস্থ করেছি।

শুনে মুকুন্দ মুষড়ে পড়েন। তাঁর কীর্তন কে শুনবে? এমন প্রেমের বন্যা বহাবে কে, নিমাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে সবাইকে ছেড়ে যান? মুকুন্দ কাতর হয়ে অনুনয় করেন—প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়, তোমার সঙ্কল্পে বাধা দেবার সাধ্য কারো নাই। আমার মিনতি তুমি আমাদের মাঝে আরো কিছুকাল থাকো প্রভু, এমনি কীর্তনের আনন্দে আমাদের আরো কিছুদিন ডুবিয়ে রাখো। তারপর তোমার যেমন ইচ্ছা ক'রো।

মুকুন্দের আকুতিতে প্রভু নির্বিকার। কোন উত্তর দেন না। চলেন গদাধরের:গৃহে।

গদাধর কোমলপ্রাণ, গৌরাঙ্গ-প্রেমে ভরপুর। নিমাইকে না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখেন। নিমাই শুধু তাঁর নয়নের আলো নয়, অন্তরের আনন্দের উৎস। নিমাইকে দেখে পুলকে গদাধর প্রভুর চরণ-বন্দনা করেন।

প্রভু বলেন—গদাধর, আমি সংসার ত্যাগ করবো, শিখাসূত্র পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাপাত্র ধারণ ক'রে দেশে দেশে বিচরণ করবো স্থির করেছি।

অকস্মাৎ যেন গদাধর হৃদয়ে তীক্ষ্ণ তীরবিদ্ধ হন। গৌরাঙ্গের বিরহ কল্পনা ক'রে তিনি কাতরভাবে রোদন করতে লাগলেন। বললেন—তোমার এ অদ্ভুত কথা আমি বুঝি না প্রভু। মস্তক মুণ্ডন ক'রে সংসারত্যাগী হ'লেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়, গৃহবাসী হ'লে কি কৃষ্ণকে মেলে না? মস্তকমুণ্ডনে কি ফল হয় তা তুমিই জান, এ বেদের অগম্য। প্রভু, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তোমার অনাথিনী মাতার কি দশা হবে? সকল পুত্রকন্যার মধ্যে তুমিই এখন তাঁর একমাত্র সর্বস্ব। গৃহত্যাগ করলে তুমি তোমার জননী-বধের ভাগী হবে। এতেও যদি তোমার মন না মানে তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'রো।

আপনজন যখন জাহাজে ক'রে সাগর পাড়ি দিয়ে দূরদেশে যাত্রা করে, আত্মীয়-স্বজন বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার আগে রেশমের সুতা জাহাজের সঙ্গে বেঁধে এক প্রান্ত ধরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকে—প্রেমের ডোরে জাহাজ রাখবে ঠেকিয়ে! নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রার ইঙ্গিত আসে, চঞ্চল হয়ে ওঠে জলপোত। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। নোঙর তুলে, অবলীলায় প্রেমের রাখীবন্ধন ছিঁড়ে, লোকালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে মহাসাগরের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে অসীমের পথে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থানের উদ্দেশ্যে। প্রেমার্ত হৃদয়ের চিরন্তন কামনা—যেতে নাহি দিব। কিন্তু তবু যেতে দিতে হয়। নিমাই অনন্তপথের যাত্রী হ'তে চলেছেন। রেশম-সূত্রের প্রেম-বন্ধন তাঁকে কি আবদ্ধ রাখতে পারে!

একে একে প্রভু তাঁর ভক্তদের কাছে সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। কাতর হলেন সবাই। নিমাই তাঁর অমৃতবর্ষী বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিলেন। বললেন—তোমরা ভাবছ আমি সংসার ত্যাগ ক'রে তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাব। কিন্তু এটা ভুল। তোমাদের সঙ্গে আমার, আমার সঙ্গে তোমাদের বিরহ নাই। আমি সর্বকাল তোমাদের সঙ্গেই থাকব, তোমরাও আমার জন্ম-জন্মের সঙ্গী। সান্ত্বনা দিয়ে প্রভু ভক্তদের একে একে হৃদয়ে ধারণ ক'রে নিবিড় আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করেন। নিমাই সঙ্কল্পে হিমালয়ের মতো অটল; আবার হিমালয়ের মতোই মহিমময় ও আনন্দদায়ক।

লোকমুখে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা শচীমাতাও শুনলেন।

শুনেই তাঁর হৃদয় হাহাকার ক'রে উঠলো। বিশ্বরূপ এমনি একদিন তাঁকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন অবলম্বন ছিল নিমাই আর স্বামী। স্বামী স্বর্গবাসী হয়েছেন। নিমাই রূপে গুণে বিদ্যায় খ্যাতিতে অনন্যসাধারণ। এহেন পুত্রও তাঁকে নিরলম্ব ক'রে চলে গেলে তিনি জীবনধারণ করবেন কেমন ক'রে, কিসের জন্য! সংবাদ শুনেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর আকুল ক্রন্দনে আর চোখের জলে মাটি ভেজে। অনেক শোক পেয়েছেন তিনি। আবার এক নিদারুণ আঘাত উদ্যত হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি শোকে ভেঙে পড়েন।

একদিন নিমাইয়ের কাছে বসে বললেন: বাবা বিশ্বম্ভর, আমার সংসারে আর কে আছে! বিশ্বরূপ চলে গেছে, তোমার পিতৃদেব স্বর্গে গেছেন। তোমার এই সুন্দর মুখপদ্ম, সুরঞ্জিত অধর, মুক্তার মতো দাঁত, লাবণ্যময় অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মনোহর ভঙ্গীতে গমন—এ-সব না দেখলে আমি বাঁচব কেমন ক'রে? বাবা, তোমার প্রাণের প্রিয় নিত্যানন্দ আছে, পরম বান্ধব গদাধর আছে, অনুরক্ত ভক্তগণ আছে—এদের নিয়ে তুমি গৃহে থেকে আনন্দে কীর্তন করো। জগতে ধর্ম বুঝাতে তোমার অবতার। তুমি স্বয়ং ধর্মময় হয়েও যদি জননীকে ছেড়ে যাও, তবে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাবে কেমন ক'রে? সকলকে হারিয়ে এতদিন তোমার শ্রীমুখ দেখে আমার দুঃখ ভুলে ছিলাম; তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলে আমিও প্রাণত্যাগ করবো নিশ্চয়।

শচীমাতা এইভাবে বিলাপ করেন। নিমাই অধোবদনে নীরব হয়ে বসে থাকেন; মুখ তুলে একটি কথাও বলেন না। জননী শোকাকুল হয়ে অনাহারে থাকেন; শরীর শীর্ণ হ'তে থাকে। অবশেষে একদিন মাকে প্রবোধ দেবার জন্য নিমাই নিভৃতে তাঁর কাছে ব'সে বলেন—মা, তুমি কি শুধু আমার এই জন্মের মা? তুমি আমার জন্ম-জন্মের মা। কোন এককালে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি, আমি ছিলাম তোমার নন্দন। স্বর্গে তুমি ছিলে অদিতি, আমি হয়েছিলাম তোমার পুত্র বামন; তুমি একবার হ'লে দেবহূতি, আমি হলেম তোমার পুত্র কপিল; তুমি হয়েছিলে কৌশল্যা, আমি তোমার পুত্র রাম; কংসের ভগিনী দেবকী হয়ে তুমি অন্তঃপুরে বন্দিনী ছিলে, আমি হয়েছিলাম তোমার নন্দন। এই সংকীর্তন-আরম্ভে আরো দুই জন্ম আমি তোমার পুত্র-রূপে হব। কাজেই দেখ মা, তোমার সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ। তোমাকে ত্যাগ করবো, এ কখনই সম্ভবপর নয়।

পুত্রের সুমধুর বচনে জননী কিছুটা শান্ত হন। কিন্তু তাঁর অন্তরে ফল্গুর স্রোতের মতো ব্যথা ও বিরহ-শঙ্কার স্রোত বইতে থাকে।

প্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে যেমন ক্ষণিকের জন্য অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নিমাইয়ের সংকীর্তনে আনন্দও তেমনি উথলিয়ে উঠতে থাকে। ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনের রসে মগ্ন হয়ে নৃত্য করেন। শ্রীবাসের গৃহে ওঠে কীর্তন ও ভাবের ঢেউ। আনন্দে বাহু তুলে নৃত্য করেন গৌরাঙ্গ। অঙ্গের বসন খুলে পড়ে, সর্বাঙ্গে পুলক-রোমাঞ্চ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন, রোমকূপ দিয়ে রক্ত ঝরে। ভক্তবৃন্দ আনন্দ-সাগরে ডুবে প্রভুর গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা প্রায় বিস্মৃত হন।

একদিন প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে বললেন—শ্রীপাদ, আমি আগামী সংক্রান্তি দিবসে উত্তরায়ণকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করবো। ইন্দ্রাণীর নিকটে কাটোয়া নামক গ্রামে কেশব ভারতী নামে একজন নিষ্ঠ সন্ন্যাসী আছেন, আমি তাঁর কাছে সন্ন্যাস-মন্ত্র দীক্ষা নেব। তুমি শুধু পাঁচজনের কাছে এ-কথা গোপনে প্রকাশ করবে। এঁরা হলেন জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য আর মুকুন্দ। নিত্যানন্দ যথানির্দিষ্ট কার্য করেন এবং মনে মনে সেই মহাক্ষণের জন্য প্রস্তুত হন।

যেদিন প্রভু গৃহত্যাগ করবেন সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সংকীর্তনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করলেন। তারপর গঙ্গাতীরে গিয়ে গঙ্গাপ্রণাম ক'রে কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে ফিরে এলেন গৃহে। তাঁর বাল্য ও কৈশোরের সর্বংসহা ধাত্রীস্বরূপা গঙ্গা, যৌবনের আরাধ্য-জননী জাহ্নবীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন মনে মনে। গৃহে ফিরে ভক্তদের মধ্যে বসলেন যেন গগনে চন্দ্রসভা। সেদিন যেন কিসের আকর্ষণে দলে দলে লোক আসে প্রভুকে দর্শন করতে আর তাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে। তাঁর রাতুল পদযুগলে চন্দন লেপন ক'রে কণ্ঠে দুলিয়ে দেয় সুগন্ধি ফুলের মালা। স্মিতপ্রসন্ন হাসিতে সকলকে অনুগৃহীত করেন তিনি। সবাই দণ্ডবৎ প্রণাম করে; তিনি নিজের গলার মালা তাদের মধ্যে বিতরণ ক'রে উপদেশ দেন—কৃষ্ণ ভজন কর, কৃষ্ণনাম গান কর, কৃষ্ণনাম মুখে বল। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, জাগরণে দিবারাত্রি কৃষ্ণ চিন্তা কর।

বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥

প্রভুর প্রসাদ লাভ ক'রে পুলকিত অন্তরে নগরীয়াগণ গৃহে ফিরে চলেছেন, এমন সময় ভক্ত শ্রীধর এলেন গৌরাঙ্গ-দর্শনে ; হাতে তাঁর একটি লাউ। প্রভুর প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি। প্রভুর ভোগের জন্য এনেছেন লাউটি। ভক্তের দান তিনি উপেক্ষা করবেন কেমন ক'রে! অথচ সেই রজনীই গৃহে তাঁর শেষ রজনী। শচীমাতাকে সেই লাউ সেই রাত্রিতেই রাঁধতে বলেন। সেই সময় আর একজন ভক্ত এক ঘটি দুধ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। প্রভু হেসে বলেন—ভালোই হ'ল ; দুধ দিয়ে লাউ পাক করলে সুস্বাদু খাদ্য হবে।

রাত্রিতে জননীর শ্রীহস্তের রান্না আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে আহার ক'রে নিমাই গেলেন শয়ন-গৃহে। তাঁর নিকটে শয়ন করলেন হরিদাস আর গদাধর। অনুচর গোবিন্দদাসকে শেষরাত্রিতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি নিজস্থানে শুয়ে সারারাত্রি জেগে কাটালেন। শেষরাত্রিতে নিমাই এসে তাঁকে ডাক দিলেন। বললেন—এখানে প্রস্তুত হয়ে থাকো ; আমি মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

শোকাকুলা জননী আপন কক্ষে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তাঁর চোখের জল ব্যথার তাপে শুকিয়ে গেছে ; কণ্ঠেও শব্দ ফোটে না। পুত্রের মুণ্ডিতমস্তক, গেরুয়া-পরিহিত, করঙ্গধারী করুণ রূপ কেবল নয়ন সম্মুখে ভাসতে থাকে। সমস্ত জগৎ তাঁর অস্তিত্ব থেকে লোপ পেয়ে গেছে, কেবল সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে নিমাইয়ের মোহন মূরতি। নিমাইয়ের মৃদুকণ্ঠের আহ্বানে জননী চরম মুহূর্তটির জন্য বাইরে এসে দাঁড়ালেন ; কণ্ঠ রুদ্ধ, চোখে নামল অঝোর ধারা। জননীকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে নিমাই তাঁর হাত ধরে মধুরকণ্ঠে বলেন—মা, তোমার কাছে আমি জন্মে জন্মে ঋণী। তোমার দয়ায়, তোমারই প্রতিপালনে আমার শরীর-মন পুষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের অধীন সর্বজীব। তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম করার সাধ্য কারো নাই। সবই ঘটছে তাঁরই ইচ্ছায়। আজকে কিংবা দশদিন পরে যখনই যাই না কেন, তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। তোমার সকল ভার আমার ওপর রইলো।

বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার।
'তোমার সকল ভার আমার আমার' ॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝোর নয়নে ॥

বিজ্ঞানে বলে, অতি প্রচণ্ড শব্দ কর্ণগোচর হয় না; অতি তীব্র আলো চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বাইরে থেকে যায়। অতি তীব্র শোকদুঃখের আঘাতেও মানুষ মূক বিবশ হয়ে যায়। সুখদুঃখ অনুভূতির সীমা অতিক্রম ক'রে গেলে মানুষ হয়ে পড়ে কাঠের মূর্তির মতো। অনাথার সম্বল, নয়নের মণি পুত্রকে বিদায় দিতে দাঁড়িয়ে শচীমাতা এমনি 'কাঠের পুতুলীসম' হয়ে রইলেন, কেবল হৃদয়-গলা অশ্রুবারি ঝর ঝর পড়তে লাগল। জননীর পদধূলি প্রভু ভক্তিভরে শিরে তুলে নিলেন; তারপর পৃথিবী-স্বরূপা জননীকে প্রদক্ষিণ ক'রে দ্রুত গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গঙ্গার ঘাট অভিমুখে ছুটে চললেন। নগরবাসীরা সুপ্ত। পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া আপন কক্ষে নিদ্রিতা। নির্মল নির্মেঘ রাত্রির আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ আলোর বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে পূর্ব গগন থেকে পশ্চিম পানে। পৌষ মাস। বাতাস স্নিগ্ধ শিশির-সিক্ত।

*  *  *  *

প্রভাতে প্রভুর ভক্তগণ যথারীতি গঙ্গাস্নান ক'রে সাজিতে ফুল নিয়ে দর্শন প্রণাম করতে আসেন। খোলা দরজার সামনে শচীমাতাকে বিহ্বল উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হন সবাই। জননীর আকুল ক্রন্দনে তাঁরা বুঝতে পারেন নবদ্বীপের চাঁদের হাট ভেঙে গেছে, উৎসবের আলোক গেছে নিভে। সমগ্র শহরে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; সমগ্র শহরে ওঠে দুঃখ ও শোকের উচ্ছ্বাস। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন তারুণ্য, এমন স্নেহময়ী জননী, এমন প্রেমময়ী অনুরাগিণী ভার্যা, এমন একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ—এক কথায় এমন সুখের সংসার আর কুসুমাস্তীর্ণ পথ হেলায় তুচ্ছ ক'রে মহা অজানার আকর্ষণে নিমাই ত্যাগ ও সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন শত্রুমিত্র, ভক্ত অভক্ত সকলের চক্ষের সম্মুখেই গৌরাঙ্গের অপূর্বসুন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রেমপ্রীতির রঙে রঞ্জিত হয়ে বিরাজ করতে লাগল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেদিন মানুষের দুঃখশোক নিবারণের উপায় সন্ধান করতে ভোগবিলাস ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, সেদিনও তাঁর রাজধানীতে এমনি শোকের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। কেউ তাঁকে ভেবেছিলেন ভাববিলাসী খামখেয়ালী! নইলে যে সুখভোগ একান্ত হাতের মধ্যে তা ছেড়ে নিশ্চিত দুঃখের পথ কেউ বেছে নেয়! সাধারণ সংসারী মানুষের কাছে তাঁরা পাগল আখ্যা পান। কিন্তু যুগে যুগে এমনি

'পাগল' পৃথিবীতে এসেছেন ব'লেই তাঁদের সাধনায় মানুষের জীবন ও মানসিক আকাশ নির্মল উদার কলুষমুক্ত হয়েছে। কবির গানে এমনি পাগলের প্রশস্তিই ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস।
... ... ...
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস॥

* * * *

ধূলায় অবলুণ্ঠিতা শচীমাতার আকুল ক্রন্দনে দর্শকজন অশ্রু সম্বরণ করতে পারে না। নিত্যানন্দ মাতাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন—ক্ষান্ত হও, জননি, আমি যেখানে পাই, তোমার পুত্রকে সন্ধান ক'রে তোমার কাছে এনে দেব।

ভক্তদের সঙ্গে নিভৃতে পরামর্শ করেন। সবাই স্থির করেন—নিমাই চিরদিনের মতো সংসারবাস ত্যাগ করেছেন। তাঁকে পুনরায় গৃহস্থ করানো সম্ভবপর হবে না। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নেবেন ব'লে প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তগণ অবশেষে সিদ্ধান্ত করেন যে, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ নিত্যানন্দের সঙ্গে কাটোয়ায় যাবেন। সেই দিনই তাঁরা কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে শেষরাত্রিতে গঙ্গা পার হয়ে নিমাই দ্রুতপদে কাটোয়ার পথে ছুটতে লাগলেন। কাটোয়ায় গঙ্গার উপকূলে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে কেশব

বিজ্ঞানে বলে, অতি প্রচণ্ড শব্দ কর্ণগোচর হয় না; অতি তীব্র আলো চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বাইরে থেকে যায়। অতি তীব্র শোকদুঃখের আঘাতেও মানুষ মূক বিবশ হয়ে যায়। সুখদুঃখ অনুভূতির সীমা অতিক্রম ক'রে গেলে মানুষ হয়ে পড়ে কাঠের মূর্তির মতো। অনাথার সম্বল, নয়নের মণি পুত্রকে বিদায় দিতে দাঁড়িয়ে শচীমাতা এমনি 'কাঠের পুতুলীসম' হয়ে রইলেন, কেবল হৃদয়-গলা অশ্রুবারি ঝর ঝর পড়তে লাগল। জননীর পদধূলি প্রভু ভক্তিভরে শিরে তুলে নিলেন; তারপর পৃথিবী-স্বরূপা জননীকে প্রদক্ষিণ ক'রে দ্রুত গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গঙ্গার ঘাট অভিমুখে ছুটে চললেন। নগরবাসীরা সুপ্ত। পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া আপন কক্ষে নিদ্রিতা। নির্মল নির্মেঘ রাত্রির আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ আলোর বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে পূর্ব গগন থেকে পশ্চিম পানে। পৌষ মাস। বাতাস স্নিগ্ধ শিশির-সিক্ত।

* * * *

প্রভাতে প্রভুর ভক্তগণ যথারীতি গঙ্গাস্নান ক'রে সাজিতে ফুল নিয়ে দর্শন প্রণাম করতে আসেন। খোলা দরজার সামনে শচীমাতাকে বিহ্বল উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হন সবাই। জননীর আকুল ক্রন্দনে তাঁরা বুঝতে পারেন নবদ্বীপের চাঁদের হাট ভেঙে গেছে, উৎসবের আলোক গেছে নিভে। সমগ্র শহরে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; সমগ্র শহরে ওঠে দুঃখ ও শোকের উচ্ছ্বাস। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন তারুণ্য, এমন স্নেহময়ী জননী, এমন প্রেমময়ী অনুরাগিণী ভার্যা, এমন একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ—এক কথায় এমন সুখের সংসার আর কুসুমাস্তীর্ণ পথ হেলায় তুচ্ছ ক'রে মহা অজানার আকর্ষণে নিমাই ত্যাগ ও সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন শত্রুমিত্র, ভক্ত অভক্ত সকলের চক্ষের সম্মুখেই গৌরাঙ্গের অপূর্বসুন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রেমপ্রীতির রঙে রঞ্জিত হয়ে বিরাজ করতে লাগল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেদিন মানুষের দুঃখশোক নিবারণের উপায় সন্ধান করতে ভোগবিলাস ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, সেদিনও তাঁর রাজধানীতে এমনি শোকের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। কেউ তাঁকে ভেবেছিলেন ভাববিলাসী খামখেয়ালী! নইলে যে সুখভোগ একান্ত হাতের মধ্যে তা ছেড়ে নিশ্চিত দুঃখের পথ কেউ বেছে নেয়! সাধারণ সংসারী মানুষের কাছে তাঁরা পাগল আখ্যা পান। কিন্তু যুগে যুগে এমনি

'পাগল' পৃথিবীতে এসেছেন ব'লেই তাঁদের সাধনায় মানুষের জীবন ও মানসিক আকাশ নির্মল উদার কলুষমুক্ত হয়েছে। কবির গানে এমনি পাগলের প্রশস্তিই ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস।
... ... ...
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস॥

* * * *

ধূলায় অবলুণ্ঠিতা শচীমাতার আকুল ক্রন্দনে দর্শকজন অশ্রু সম্বরণ করতে পারে না। নিত্যানন্দ মাতাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন—ক্ষান্ত হও, জননি, আমি যেখানে পাই, তোমার পুত্রকে সন্ধান ক'রে তোমার কাছে এনে দেব।

ভক্তদের সঙ্গে নিভৃতে পরামর্শ করেন। সবাই স্থির করেন—নিমাই চিরদিনের মতো সংসারবাস ত্যাগ করেছেন। তাঁকে পুনরায় গৃহস্থ করানো সম্ভবপর হবে না। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নেবেন ব'লে প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তগণ অবশেষে সিদ্ধান্ত করেন যে, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ নিত্যানন্দের সঙ্গে কাটোয়ায় যাবেন। সেই দিনই তাঁরা কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে শেষরাত্রিতে গঙ্গা পার হয়ে নিমাই দ্রুতপদে কাটোয়ার পথে ছুটতে লাগলেন। কাটোয়ায় গঙ্গার উপকূলে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে কেশব

ভারতীর আশ্রম। সেখানে উপনীত হয়ে নিমাই ভারতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে জোড়হাতে সামনে দাঁড়ালেন। ভারতী সাধু উপবিষ্ট ছিলেন। নিমাই-য়ের দেহের অপূর্ব জ্যোতি এবং সুন্দর সুঠাম দেহশ্রী দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নিমাই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি দীনাতিদীন; আপনি কৃপাময় পতিতপাবন; আমি যাতে কৃষ্ণের সন্ধান পাই আপনি তাই করুন। আপনি আমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ভবসাগর থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। এই অদ্ভুত প্রেমোন্মাদকে দেখে ভারতী বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছেন। অশ্রুর উৎস তাঁর নীলোৎপল আঁখির দিকে সাধু অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন।

নিমাইয়ের সন্ধানে বের হয়ে নিত্যানন্দ চারজন সঙ্গী নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হন। কেশব ভারতীর আশ্রমে নিমাইকে দেখতে পেয়ে তাঁরা পুলকিত অন্তরে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়েন তাঁর পদপ্রান্তে। নিমাই বলেন—তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে।

কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ব'লে প্রভু হুহুঙ্কার দিয়ে নৃত্য সুরু করলেন; মুকুন্দ সুললিত কণ্ঠে গান ধরলেন; অন্যান্য ভক্তগণ-ও যোগ দিলেন তাতে। নিমাইয়ের ভাবাবেশে নৃত্যের সঙ্গে নয়নে যেন অশ্রুর ফোয়ারা ছুট্‌ল। পাক দিয়ে তিনি নাচেন; চোখের জলে দর্শকজন হয় সিঞ্চিত। দেখতে দেখতে উৎসুক নরনারী বালক বৃদ্ধের ভিড় জমে ওঠে। কীর্তনের আনন্দে মত্ত হয়ে গৌরাঙ্গ মধুর নৃত্য করতে থাকেন। কখনো কম্প, কখনো স্বেদ; কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়েন ধরাতলে।

ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্ছা হয়।
আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ভয়॥

এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে ভারতীর আশ্রমে এসেছেন এ-কথা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে দর্শনার্থী নরনারী এসে সমবেত হয়। আশ্রম হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র। দর্শনার্থিনী নারীদের মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মোছেন আর বলেন—হায়! এমন সোনার চাঁদ ছেলে যার সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্ছে তার না কী কষ্ট! কেমন ক'রে সে প্রাণধারণ করবে? কেউ বলে—এমন কন্দর্পতুল্য স্বামী পেয়ে যে হারাল, সে নারীর কষ্ট অনুভব ক'রে যে বুক কেটে যায়! কেউ বলে—এমন রূপবান গুণবান পুত্র যার সে ধন্য, এমন পতি যার সে-ও ধন্যা।

অনুচরবৃন্দসহ নিমাই রাত্রি সে আশ্রমেই অতিবাহিত করলেন। প্রভাতে কেশব ভারতী গৌরাঙ্গকে বললেন—তোমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিতে আমার অন্তর কাঁপছে। তোমার এমন সুন্দর তনুদেহ, এমন নবীন বয়স; তুমি কখনো দুঃখকষ্ট সহ্য করনি। তোমার যে অপূর্ব ভক্তির প্রকাশ আমি দেখতে পেলাম, তাতে এই ধারণাই আমার হয়েছে যে, ঈশ্বর বিনা অন্যে এমন শক্তি সম্ভবে না। তুমি যে জগৎ-গুরু তা আমি বুঝতে পেরেছি; তবে আমার মনে হয়, তুমি লোকশিক্ষার জন্যই আমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছ।



নিমাই বিনীত দাস্যভাবে বলেন—আমার প্রতি আর মায়া প্রকাশ না ক'রে এমন দীক্ষা দিন, যাতে আমি কৃষ্ণদাস হ'তে পারি। নিমাইয়ের অনুরাগ ও আন্তরিকতায় ভারতীর হৃদয় গলে যায়।

নিমাই চন্দ্রশেখর আচার্যকে সন্ন্যাসের আয়োজন করতে নির্দেশ দেন। বলেন—বিধি অনুসারে যাবতীয় কার্য তুমিই আমার হয়ে সম্পন্ন ক'রো, তোমাকে আমি প্রতিনিধি করলেম।

প্রভু মস্তক মুণ্ডন ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। দলে দলে লোকে দুধ, দই, ঘি, চা'ল, চন্দন, বস্ত্র, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি ভারে ভারে এনে স্তূপীকৃত করতে লাগল। কাটোয়াকে কেন্দ্র ক'রে যেন মহা-উৎসব পড়ে গেছে। দেবা নামে নাপিতকে ডেকে আনা হয়েছে; শিখা পরিত্যাগ করার জন্য নিমাই বসেছেন বিল্ববৃক্ষতলে। ভ্রমরপুঞ্জিত আস্কন্ধবিলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ চুলের রাশি, যেন চিকণ-কালো আঙুরের থোকা। ভারতীর নির্দেশে গৌরাঙ্গের শিরে ক্ষুর প্রয়োগ করতেই রমণীগণ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো আর কাতর-কণ্ঠে নাপিতকে অনুনয় করতে লাগল—এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না।

মস্তক মুণ্ডনশেষে নিমাই ভারতীর সম্মুখে এসে দণ্ড-কমণ্ডলুহস্তে দাঁড়ান। পরণে গেরুয়া বসন; তার ওপর অরুণবরণ কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত। দীর্ঘ নীলোৎপল আঁখি। সুন্দর সুঠাম দেহ। নিপুণ শিল্পীর হাতে-গড়া মনোহর কনকবিগ্রহ যেন। ভারতী অপলকনেত্রে চেয়ে থাকেন গৌরাঙ্গের দিকে; ভাবেন—কী অপূর্ব, কী তেজোময়! ইনি কি হবেন আমার শিষ্য!

নিমাই ভারতীকে বলেন—গোঁসাই, একদিন স্বপ্ন দেখেছি যে, একজন ব্রাহ্মণ এসে আমার কানে সন্ন্যাসের মন্ত্র দিলেন। দেখুন তো, সে মন্ত্র ঠিক

কিনা—এই ব'লে তিনি কেশব ভারতীর কানে কানে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বিস্মিত ভারতী বলেন—কৃষ্ণের প্রসাদে এই মহামন্ত্র কি তোমার অগোচর! আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।

আনন্দে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর অরুণলোচন দিয়ে অবিরত ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। ভারতীর আশ্রমে অগণিত লোক উৎসুক ব্যথিত নেত্রে চেয়ে আছে গৌরাঙ্গসুন্দরের দিকে। সূর্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে আসছে নিবিড় হয়ে; কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাই সোনার দীপশিখার মতো মধুর আবেশে নৃত্য ক'রে চলেছেন।

ভারতী গোঁসাই তাঁর অসামান্য শিষ্যকে সন্ন্যাসের পর কি নামে অভিহিত করবেন, তা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। মনে মনে অনেক বিচার-বিবেচনা ক'রে একটি উপযুক্ত নাম নির্বাচন ক'রে তিনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে নিমাই-প্রদত্ত মহামন্ত্র তাঁকে সন্ন্যাস-মন্ত্ররূপে প্রদান করলেন।

অপরাহ্ণকালে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। সমবেত জনতা নবীন সন্ন্যাসীর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল; নারীগণ হুলুধ্বনি ক'রে মুঠো মুঠো লাজবর্ষণ করতে লাগল। করজোড়ে নতমস্তকে প্রভু দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রভুর বক্ষে হস্ত স্থাপন ক'রে ভারতী বললেন—কৃষ্ণনাম শুনিয়ে, কীর্তন প্রচার ক'রে তুমি কৃষ্ণের চৈতন্য সঞ্চার করেছ; তোমার দ্বারা সকল লোক হয়েছে ধন্য। এখন থেকে তোমার নাম হ'ল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।

ভারতী সাধুর ঘোষণা শুনে সমবেত দর্শকজন আনন্দে হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠেন। প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে প্রণিপাত করেন তাঁর গুরুদেবকে। চারিদিক থেকে জয় জয় রব ও মহা-হর্ষধ্বনি উঠলো। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকল বৈষ্ণব ভারতীকে প্রণাম করলেন। নিমাই এবার নূতন নামে, নূতন বেশে, নূতন জীবন-পথে এসে দাঁড়ালেন। সর্ব-অঙ্গ ও শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত; পরিধানে অরুণ-বসন, স্বর্ণচাঁপার ন্যায় উজ্জ্বল কমনীয় দেহ পুষ্পমাল্য শোভিত। আয়ত চোখ দুটিতে জল টলমল করে। দর্শকবৃন্দ এই ভুবনমোহন রূপের দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

## সন্ন্যাস

সন্ন্যাস গ্রহণের পর সে রাত্রি ভারতীর আশ্রমে নিমাই ভারতী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কীর্তনে অতিবাহিত করলেন। সন্ন্যাসবেশী নিমাইকে দর্শনের জন্য প্রভাতে হাজার হাজার লোক আশ্রমে সমবেত হ'ল। এমন জগৎ-মনো-মোহন তরুণ সন্ন্যাসী পূর্বে কেহ দেখেনি; এমন ভাবোন্মাদ নৃত্য, এমন প্রাণ-মাতানো নামকীর্তন, এমন আনন্দের জোয়ার লোকের অগোচর ছিল। প্রভাতে নিমাই দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাঁর চরণ অন্বেষণে আমি যাত্রা করছি আমি যেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে পাই। আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন, আপনারা সকলে একমনে সর্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুন।

নিমাইয়ের করুণ বচন শুনে, তাঁর জল-ভরা আঁখির প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দর্শকজন সমস্বরে হরিধ্বনি ক'রে ওঠে। নিমাই তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যকে আলিঙ্গন ক'রে বলেন—আচার্য, তুমি নবদ্বীপে ফিরে যাও; সকল বৈষ্ণবকে ব'লো—আমি কৃষ্ণের সন্ধানে বনগমন করলেম। তুমি দুঃখ ক'রো না। তুমি যদি উতলা হও তবে আমার জননীকে প্রবোধ দেবে কেমন ক'রে? বাল্যে আমার পিতৃবিয়োগ হ'লে তুমিই আমার পিতার কার্য করেছিলে; এখন আমার সংসার-বন্ধন কাটতে তুমিই সুহৃদের মতো সহায়তা করেছ; আমি তোমার হৃদয়ে বন্দী হয়ে রইলেম।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে চন্দ্রশেখর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। নিমাই লোকসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল। কালবিলম্ব না ক'রে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পশ্চিমমুখে চলতে লাগলেন—সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ। আগে আগে চলেছেন কেশব ভারতী, পিছনে গোবিন্দ। আশ্রমে সমাগত দর্শকবৃন্দ কাঁদতে কাঁদতে নিমাইয়ের পিছনে চলতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে নিমাই তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—তোমরা ঘরে ফিরে যাও। ঘরে গিয়ে হরিনাম করো; তোমাদের অন্তরে ভক্তিরসের সঞ্চার হোক।

ভাবের আবেশে হরিনাম করতে করতে নিমাই মত্ত সিংহের মতো হুঙ্কার গর্জন ক'রে ছুটে চলেছেন। সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেন না,

পিছিয়ে পড়েন অনেক দূরে। কেবল নিত্যানন্দ আছেন তাঁর কাছে কাছে সারাদিন এইভাবে অনাহারে অবিরাম ছুটে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন কিন্তু নিমাইয়ের ক্লান্তি নাই। হা কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ ব'লে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি দৌড়িয়ে চলেছেন। সন্ধ্যায় এক বনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছে সঙ্গীরা এসে তাঁকে আর ধরতে পারলেন না। এক গাছের তলায় বসে তাঁরা রোদন করতে থাকেন, ভাবেন নিমাইয়ের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হ'ল না; তিনি চিরদিনের মতোই তাঁদের ছেড়ে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রবোধ দিয়ে বলেন—প্রভু দয়াময়। তিনি কি ভক্তদের ফেলে পালিয়ে যেতে পারবেন? তা ছাড়া, তিনি যেমন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়েছেন, কোথাও হয়ত লুটিয়ে পড়ে রোদন করছেন; সকলকে পরিত্যাগ ক'রে ছুটে চলার সাধ্য কি তাঁর!

ভক্তগণ তারপর নিমাইয়ের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছেই এক গ্রাম ছিল। সেখানে প্রতি গৃহে গিয়ে তাঁরা প্রভুর সন্ধান করলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না; সারারাত্রি অনশনে থেকে তাঁরা চারিদিকে প্রভুর অনুসন্ধান করলেন কিন্তু সবই বিফল হ'ল। অবশেষে শেষরাত্রিতে কিছুদূরে কাতর শব্দ শুনতে পেয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে চললেন এবং হারানিধির দর্শন পেলেন। এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মাটিতে বসে কপালে হাত রেখে নিমাই উচ্চস্বরে রোদন ক'রে বলছেন—বাপ্ কৃষ্ণরে আমার। তুমি কি আমাকে দেখা দেবে না? চোখের জলে মাটি ভিজে গেছে। তাঁর এই দশা দেখে ভক্তগণ-ও রোদন করতে থাকেন। নিমাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি কোথায় রয়েছেন, কাছে কে কে রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি যাত্রা করেছেন কৃষ্ণদর্শনে বৃন্দাবনে —সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে লোপ পেয়ে গেছে কেবল কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা জেগে আছে সারা অন্তর জুড়ে। ক্ষণপরে আবার উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক অভিমুখে ধেয়ে চললেন। অর্ধনিমীলিত নেত্র; অশ্রুধারায় বুক ভেসে যায়, কণ্ঠে কেবল 'হে কৃষ্ণ দেখা দাও' বুলি।

এদিকে চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে ফিরে এসে নিমাইয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও বনগমনের সংবাদ প্রচার করতেই শচীমাতা আছাড় খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আলুথালুবেশা আলুলায়িতকুন্তলা বিষ্ণুপ্রিয়ার নীরব অশ্রুতে গৃহকোণ ভেজে। ভক্তগণ ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করতে থাকেন, ভাবেন নির্দয় প্রভু তাঁদের চিরদিনের মতো পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। নিমাই বিনা নবদ্বীপ অন্ধকার। সকলের মনে বিরহ-শোক উথলিয়ে ওঠে।

নিমাই ছুটে চলেছেন বৃন্দাবন অভিমুখে। প্রেমাবেশে চক্ষু মুদ্রিত। কেবল নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে সমানভাবে চলতে পারেননি। নিত্যানন্দ রয়েছেন পিছে পিছে; চিন্তা করেন কী উপায়ে প্রভুকে ফিরাবেন। নিজের ভ্রমবশতঃই হোক কিংবা নবদ্বীপের প্রিয়জন ও ভক্তবৃন্দের মানস-আকর্ষণেই হোক নিমাই অকস্মাৎ পূর্বদিকে ফিরে চলতে লাগলেন। তিনদিন অনাহারে; কোথাও একবিন্দু জলও গ্রহণ করেননি। তন্ময় হয়ে চলেছেন। প্রভুকে ঐরূপে ভাবাবেশে চলতে দেখে রাখাল-ছেলেরা আনন্দে হরিনাম ক'রে উঠলো। মধুর হরিধ্বনি শুনেই তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং অদূরে রাখাল-বালকদের দেখে তাদের দিকে ছুটে গেলেন। বললেন—তোমরা মধুর হরিনাম ক'রে আমাকে আকর্ষণ করেছ। আজ তিনদিন হ'ল এমন সুমধুর হরিনাম আমি শুনিনি। আমি নামে তৃষ্ণার্ত। হরিনাম শ্রবণ করিয়ে তোমরা আমার প্রাণ শীতল করো।

কৃষ্ণনাম-পিয়াসী তরুণ সন্ন্যাসীকে ঘিরে রাখাল-বালকগণ হরিনামে মত্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে নিমাই রাখালদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলেন—তোমাদের হরিনামে আমার প্রাণ শীতল হয়েছে। এখন তোমরা আমাকে বৃন্দাবনে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে আমাকে কিনে রাখ।

নিমাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বালকদের প্রতি ইঙ্গিত করেন; তারা বৃন্দাবনের পথ না দেখিযে গঙ্গার দিকে শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিল। নিমাই সানন্দে সেই দিকেই অগ্রসর হলেন। নিতাইয়ের মনও প্রফুল্ল। তাঁর আশা হয়েছে প্রভুকে শান্তিপুরে নিয়ে যেতে পারবেন। কিছুদূর গিয়ে অর্ধনিমীলিতনেত্রে নিমাই জিজ্ঞাসা করেন—বৃন্দাবন আর কতদূর ?

—আর অধিক দূর নয়, পিছন থেকে নিত্যানন্দ উত্তর দেন। নিমাই নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে চিনতে পারেন না। তিনি রয়েছেন অন্য জগতে; ভেবেছেন একাকী চলেছেন বৃন্দাবনের পথে। পথে বৃন্দাবনের সন্নিকটে রাখাল-বালকগণ তাঁর পথের নির্দেশ দিয়েছে। বৃন্দাবন আর বেশী দূরে নয় জেনে মন তাঁর আনন্দে মগ্ন হয়েছে।

এদিকে নিমাইয়ের ভ্রম যখন দূর হবে, যখন তিনি বুঝতে পারবেন বৃন্দাবনে নয়, তিনি এসে পড়েছেন গঙ্গার তীরে, তখন কি অবস্থা হবে তা ভেবে নিতাই কিছুটা চিন্তিত। তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের কাছে একজন ভক্তকে পাঠিয়ে

তাঁকে নৌকা নিয়ে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হ'তে খবর দিয়েছেন। যতক্ষণ নিমাইয়ের বৃন্দাবন-আবেশ না কাটে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত।

নিতাই কাছে এগিয়ে এলে তাঁকে চোখ মেলে নিরীক্ষণ ক'রে নিমাই বলেন—শ্রীপাদ না ?

—আজ্ঞে আমি আপনার অধম ভ্রাতা নিত্যানন্দ।

—তুমি বৃন্দাবনে এলে কি ক'রে ?

—আমি তো বরাবর তোমার সঙ্গেই রয়েছি। যখন রাখাল-বালকগণ বৃন্দাবনের পথ দেখিয়ে দিল, তখনও তো আমি পিছনেই ছিলাম।

—তা বেশ ভালই হয়েছে। আমরা দুজনে কৃষ্ণ-ভজনা করবো। বৃন্দাবন আর কতদূরে ?

—ঐ তো বংশীবট দেখা যাচ্ছে। ওর কাছেই যমুনা। চল ওখানে বংশীবটতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।

—যমুনা যখন পেয়েছি তখন আগে গিয়ে অবগাহন করি, এই ব'লে নিমাই গঙ্গার দিকে দৌড়িয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। নিতাই তীরে দাঁড়িয়ে অদ্বৈতের নৌকার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পুলকিত মনে নিমাই স্নান ক'রে তীরে এসে দাঁড়ালেন, এমন সময় অদ্বৈত নৌকা নিয়ে সেখানে এসে উপনীত হলেন। এবার নিমাইয়ের আবেশ-ঘোর যেন কাট্‌তে সুরু করেছে। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বললেন—অদ্বৈত এলেন না ?

নিতাই বলেন—হাঁ তিনিই।

অদ্বৈত তীরে উঠে এলে তাঁকে সানন্দে আলিঙ্গন ক'রে নিমাই বলেন—ভালই হ'ল, আমরা তিনজনে সুখে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবো।

পরমুহূর্তেই মনে খট্‌কা লাগে। জিজ্ঞাসা করেন—আমি বৃন্দাবনে এসেছি, তা তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

একবার নিতাইয়ের ও একবার অদ্বৈতের মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাইতে লাগলেন আর বললেন—তাই ত! বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কিছুদূর এসে দেখা পেলাম শ্রীপাদের ; এখন আবার দেখি অদ্বৈতও উপস্থিত। এর অর্থ কি ?

কাউকে কোন উত্তর দিতে হ'ল না। নিমাই পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়েছেন ; তিনি বুঝতে পেরেছেন বৃন্দাবনে আসেননি, এসেছেন শান্তিপুরে গঙ্গার ঘাটে ; যেটি বংশীবট ব'লে মনে হয়েছিল সেটি অদ্বৈতের গৃহের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষ। নিমাই ক্ষুব্ধ হলেন। অনুযোগের সুরে নিত্যানন্দকে বললেন—

তুমি আমার দাদা ; আমি ছোট ভাই। আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করলে! বললে এইটি যমুনা, ঐটি বংশীবট!

নিত্যানন্দ নিরুত্তর।

অদ্বৈত বলেন—প্রভু, শ্রীপাদ কি তোমাকে প্রতারণা করতে পারেন! তুমি বুঝে দেখ, শ্রীপাদ ঠিকই বলেছেন। প্রয়াগে যমুনা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিম ধার দিয়ে বয়ে চলেছেন। কাজেই গঙ্গার এ-পারে তো যমুনাই।

নিমাই নিরুত্তর কিন্তু ক্ষোভ দূর হয়নি।

অদ্বৈত শুক্‌নো কৌপীন নিয়ে এসেছেন। তা প্রভুর হাতে দিয়ে বললেন—প্রভু, কয়েক দিন থেকে উপবাসী থেকে শরীর অবসন্ন হয়েছে ; এখন এ দাসের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে জীবন রক্ষা করো, নৌকা প্রস্তুত।

নিত্যানন্দের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রে নিমাই বলেন—এইজন্যই বুঝি শ্রীপাদ আমাকে ভুলিয়ে এখানে এনেছেন! আমি হয়েছি কাঠের পুতুল ; উনি সুতা ধরে আমাকে নাচাচ্ছেন!

অদ্বৈত করজোড়ে অনুনয় করেন—প্রভু, তোমার অদর্শনে আমরা মৃতপ্রায় হয়েছিলাম ; প্রাণ রয়েছে কেবল তোমারই করুণার গুণে। আমাদের প্রতি সদয় হও। চলো এ দাসের গৃহে ; দুটো অন্নগ্রহণ ক'রে জীবন বাঁচাও।

নিমাই অদ্বৈতের অনুরোধ উপেক্ষা করেন না। নীরবে নৌকায় উঠে শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘাটে এসে নামেন। সমবেত জনতা হরিধ্বনি ক'রে তাঁদের অভ্যর্থনা করে। অদ্বৈত-ভবনে মহোৎসব পড়ে যায়। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে শান্তিপুরে এসেছেন এ সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে নরনারী আসতে থাকে নিমাইয়ের দর্শন অভিলাষে। অদ্বৈতের গৃহের বহির্দ্বারে প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। গৃহের সম্মুখে ভিড় জমে ওঠে।

* * * *

শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাসগৃহ। প্রভুকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন ব'লে নিত্যানন্দের মন প্রফুল্ল। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে ; নিমাই অনাহারে অনিদ্রায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ভ্রমণ করেছেন। আজ তাঁকে নিজগৃহে ভোজন করিয়ে অদ্বৈত নিজেকে কৃতার্থ মনে করছেন। হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ অদ্বৈতের নির্দেশে বিদ্যাপতির পদ গাইছেন :

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

নিত্যানন্দ অনুযোগ ক'রে নিমাইকে বলেন—তুমি কি নবদ্বীপের কথা একেবারে ভুলে গেলে? এ কয়দিন অনাহারে জননী বেঁচে আছেন কিনা জানি না, শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের কী দশা হয়েছে তাই বা কে বলবে! তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি গিয়ে আগামী কাল তাঁদের সবাইকে নিয়ে আসি।

—আমি যে সন্ন্যাস করেছি সে খবর নবদ্বীপে গেল কেমন ক'রে?

—ভারতীর আশ্রমে চন্দ্রশেখর আচার্যকে আলিঙ্গন দিয়ে তুমিই তো নবদ্বীপে ফেরৎ পাঠিয়েছিলে সকলকে সংবাদ দেবার জন্য।

প্রভাতে পাহাড়ের সানুদেশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে। সূর্যোদয়ের পর ক্রমে কুয়াশা অপসারিত হ'লে যেমন উপত্যকার গাছপালা বাড়ী-ঘর চোখে পড়ে, তেমন কৃষ্ণ-উন্মাদনার আতিশয্য কিছুটা কম হ'লে ক্রমে নিমাইয়ের নবদ্বীপের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো জননীর কথা, শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গীদের কথা। নিত্যানন্দকে বললেন—বেশ, তাই হোক। তুমি গিয়ে খবর দিয়ে নিয়ে এস।

—সকলকেই আনব? নিত্যানন্দ প্রশ্ন করেন। তাঁর চোখের সামনে রয়েছে শোকাকুলা জননী শচীর মূর্তি আর সেই সঙ্গে চির-ব্যথিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার ম্লান বিষণ্ণ মূর্তিখানি। তাঁর প্রশ্নের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার আবেদনও ধ্বনিত হয়েছে।

—হাঁ, যাঁরা যাঁরা আসতে চান তাঁদের সকলকেই আনবে, শুধু একজনকে বাদে।

সেই একজন কে তা নিত্যানন্দের বুঝতে দেরী হ'ল না। যে হবে সবচেয়ে বেশী উৎসুক সেই বাদ পড়বে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর স্ত্রীর মুখদর্শন করা নিষেধ। নিমাই কুসুমের চেয়ে কোমল, আবার বজ্রের চেয়েও কঠিন। নিত্যানন্দ বুঝলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য নিদারুণ আঘাত তিনি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে প্রভুর গৃহের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন গৃহ নীরব, শোকাচ্ছন্ন। ভিতরে লোক আছে কিনা বোঝা যায় না। কেঁদে কেঁদে জননী ও পত্নী উভয়েই রুদ্ধবাক্, মৃতপ্রায় হয়েছেন। দরজায় আঘাত ক'রে 'মা মা' ব'লে ডাকতেই জননী শচীদেবী ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছেন; বিষ্ণুপ্রিয়াও নিজের কুঠুরীর দরজা খুলে আড়ালে দাঁড়ান সংবাদের জন্য।

—মা, তোমার নিমাই এসেছে শান্তিপুরে, অদ্বৈতের গৃহে। তোমাদের সেখানে যেতে বলেছে; আমি নিতে এসেছি। প্রস্তুত হয়ে চলো, মা।

নিমাইয়ের কথা শুনেই জননী 'নিমাইরে আমার' ব'লে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে বলেন—নিমাই আমাকে নিতে পাঠিয়েছে, চলো যাই।

আবার বলেন—না, না। আমি যাব না। নিমাইয়ের কাঙাল বেশ আমি দেখতে পারব না। আমি বরং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবো।

শ্রীবাস-পত্নী মালিনী, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ সকলে মিলে জননীকে সান্ত্বনা দেন। নিমাইয়ের ওপর কি অভিমান করা চলে! চলো সবাই এক সঙ্গে গিয়ে তাঁকে নবদ্বীপে ধরে আনি।

নিমাই-সন্দর্শনে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়। শচীমাতা উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সঙ্গী হবার জন্য সমবেত হয়েছে আরো কত লোক! বস্ত্রভূষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াও শিঞ্জিনী পায়ে ধীর পদক্ষেপে এসে শচীমাতার আঁচল ধরে দাঁড়ালেন। বিরহকাতরা, সরলা বালিকাবধূ স্বামীকে দর্শনের জন্য আকুল হয়েছেন। তাঁর হৃদয়-দেবতাকে দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক ব্যাকুল হয়ে ছুটেছে, তিনিই বা যাবেন না কেন! সমবেত নারীপুরুষ এই শোককাতরা লক্ষ্মীপ্রতিমার ব্যথায় অন্তরে ব্যথা অনুভব করে। নিত্যানন্দের বুকের ভিতরে ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে। রামায়ণে লক্ষ্মণকে যেমন সীতার বনবাসের নির্মম আদেশ শোনাতে হয়েছিল, নিমাইয়ের পত্নী বিসর্জনের কঠোর আদেশ নিত্যানন্দকেই জানাতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া যখন শাশুড়ীর গা ঘেঁষে আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছেন, বুক দুরু দুরু কাঁপছে এত লোকের সামনে আর স্বামী-দর্শনের সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণে। নিত্যানন্দ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলেন—মা, আর সকলকেই তো নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে কিন্তু একজনকে নিতে বারণ।

নীরবে বজ্রপাত হয়। বোঝে সবাই। সবাই ক্ষণকাল হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া হয়েছেন সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো। শচীমাতার আঁচল ছেড়ে দিয়ে যেমন ধীর পদক্ষেপে তিনি এসেছিলেন, তেমনি ধীরপদে নিজের ঘরে ফিরে যান। স্থিরবিদ্যুতের মতো সুশ্রী পদযুগল, তাতে রৌপ্য মলগুচ্ছ প্রতি পদক্ষেপে রিনিঝিনি বাজে। এই মধুর শিঞ্জিনী-শব্দ বুক-ফাটা নীরব আর্তনাদের সঙ্গে মিশে দর্শকজনকে ব্যথায় অভিভূত করে।

শচীমাতাও পুত্রবধূর পিছে পিছে ঘরে ফিরে যান, বলেন—বৌমার যদি যাওয়া না হয়, আমিও যাব না। ঘরে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে তিনি বলেন—বৌমা, তোমার যাওয়ায় নিষেধ আছে জানলে আমি কখনও নিমাইকে দেখতে যেতে রাজী হতেম না।

মালিনীদেবীও নানাভাবে প্রবোধ দেন। অবশেষে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেই শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্তিপুরে যেতে রাজী করান। তাঁর দুঃখ তিনি একাই বহন করবেন। তাঁর দুঃখ অনন্যসাধারণ। তিনি তাঁর জীবনসর্বস্বকে সর্বলোকের জন্য দান করেছেন। তিনি স্থূলচক্ষুতে দেখতে না পেলেও গৌরাঙ্গ তাঁর অন্তরে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নদীয়াবাসীদের সঙ্গে শচীমাতা নিমাই-দর্শনে শান্তিপুরে যাত্রা করেন। শ্রীবাস তাঁর জন্য দোলার ব্যবস্থা করেছেন। পুত্রের মুখ চিন্তা করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন।

* * * *

অদ্বৈতের বাসভবন। ছাদের উপর নিমাই ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বসে ছিলেন। নীচে লোকে লোকারণ্য! অগণিত লোক দর্শন করতে এসেছে। উচ্চ হরিধ্বনি শুনে একজন উঠে দেখে বললো—নদীয়ার অধিবাসীরা এসে পৌছাল!

নিমাই নীচে নেমে এলেন। দোলা ততক্ষণে অদ্বৈতের বাইরের অঙ্গনে এসে উপনীত হয়েছে। নিমাই সন্ন্যাসী। কাউকে প্রণাম করা সন্ন্যাসীর পক্ষে বারণ কিন্তু নিমাই মায়ের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে স্তবপাঠ ক'রে আবার প্রণত হলেন ভূমিতে। দর্শকজন হরিধ্বনি ক'রে মাতাপুত্রের মিলনকে অভিনন্দিত করলেন।

শচীমাতা মানসিক আলোড়ন ও উদ্বেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তিনি অদ্বৈতের আঙিনার মাঝেই বসে পড়লেন। তাঁর সম্মুখে সন্ন্যাসীবেশী কৌপীন-পরা নিমাই; মুখশ্রী অম্লান কিন্তু বিষণ্ণ। পুত্রের মুখ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে মাতার দুঃখবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলেন—নিমাই, তোমার এ রূপ দেখে যে আমি স্থির থাকতে পারছিনে। শৈশবে তোমার পিতৃ-বিয়োগ হ'লে যত্ন ক'রে তোমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করলেম। আশা করেছিলাম তুমি হবে আমার আশ্রয়। বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল হেনে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তুমিই হ'লে আমার অন্ধের যষ্ঠি। বড়লোকের

ঘরের পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলাম। এখন তার ভরণ-পোষণ কে করবে? এই বৃদ্ধা মায়ের গলায় তাকে বেঁধে দিলে? সংসার ত্যাগ করার অভিপ্রায়ই যদি তোমার ছিল, তবে বিবাহ করার কী প্রয়োজন ছিল? আমাকে তো তুমি অকূলসাগরে ভাসিয়েছ কিন্তু পরের কন্যাকে কী অপরাধে ত্যাগ করলে, বল দেখি?

নিমাই অপরাধীর মতো মাথা নীচু ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। অগণিত দর্শকমণ্ডলীর প্রকাশ্য সভায় তাঁর যেন বিচার সুরু হয়েছে! নিমাইকে ম্রিয়মাণ ও নিরুত্তর দেখে জননী মনে করেন পুত্র অনুতপ্ত হয়েছে; নিমাইকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করতে উৎসাহ-বোধ করেন তিনি। বলেন—বাবা নিমাই, তুমি আমার নয়নের মণি। তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে তা আমি কেমন ক'রে সহ্য করবো? তোমার সোনার দেহে মানায় মিহিসুতার কাপড়; তোমার কৌপীন বাস দেখে যে আমার বুক ফেটে যায়। তুমি বিনে আমার ঘর হয়েছে আঁধার। তোমার অনুরাগী ভক্তজনও কাতর হয়ে পড়েছে তোমার বিরহে। তাদের সঙ্গে তুমি কীর্তন-ভজন করো, সবাই সুখী হোক। ঘরের ধন তুমি ঘরে ফিরে চলো।

শচীমাতা ঠিক সমবেত দর্শকদের মনের কথাই বলেছেন। তাঁরা সমর্থন জানান এ-কথায়।

স্নেহময়ী জননীর করুণ কথা শুনে নিমাইয়ের হৃদয় আর্দ্র হ'ল। তিনি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললেন—মা, তুমি ধরিত্রী-স্বরূপা, স্বর্গাদপি গরীয়সী। তুমি দয়া-ভক্তিদায়িনী। আমার দেহ তোমার; তোমা হ'তেই এ দেহ উৎপন্ন, তোমারই এতে অধিকার, আমার কোন অধিকার নাই। আমি জেনে বা না জেনে যে ভাবেই সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে থাকি না কেন, তোমার প্রতি আমি কখনই উদাসীন হ'তে পারি না। আমি তোমাদের ছেড়ে বৃন্দাবন-যাত্রা করেছিলাম কিন্তু কি বিঘ্ন হ'ল, আমার যাওয়া হ'ল না। আমি স্বেচ্ছায় কিছু করবো না; তুমি যেমন আদেশ করবে তেমনি করবো। তুমি এখন বিশ্রাম করো। তুমি শান্তমনে যদি আমাকে আবার গৃহী হ'তে বলো, আমি সেই আদেশই পালন করবো—সর্বসমক্ষে এই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

জননী কিছুটা শান্ত হন। ভক্তদের মনে আশার আলো জলে ওঠে; ভাবেন শচীমাতা এখন আদেশ করলেই নিমাই পূর্বের মতো গৃহবাসী হবেন। এমন সুযোগ কি শোকাকুলা শচীমাতা ত্যাগ করতে পারেন! অদ্বৈত-

গৃহিণী শচীদেবীকে গৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে যান হাত ধরে। শচীমাতা বলেন, তিনি নিজে রান্না ক'রে নিমাইকে খাওয়াবেন। নিমাই কি কি খেতে ভালবাসেন তা তিনিই জানেন। সন্তানের প্রতি স্নেহ তার তৃপ্তি সম্পাদনের ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করে।

ভক্তগণ মনে করেন নিমাই মাতৃদুঃখে বিগলিত হয়েছেন ; সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য তিনি এখন অনুতপ্ত ; মায়ের আদেশ পেলেই তিনি নবদ্বীপে ফিরে পূর্বের মতোই থাকতে প্রস্তুত। শচীমাতার ওপরই সব নির্ভর। তাঁকে দিয়েই অভীষ্ট কার্যটি সম্পন্ন করাতে হবে। শচীমাতাকে দিয়ে আদেশটি দেওয়াতে পারলেই হ'ল।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত শচীদেবীর কাছে গেছেন। মন প্রফুল্ল। নিত্যানন্দ বলেন—মা, তোমার দুর্দশা দেখে প্রভুর মন গলেছে। দয়াময় তিনি জননীর দুঃখ সহ্য করবেন কেমন ক'রে। তুমি যদি সংসারী হ'তে আদেশ করো, তবে তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করবেন না। ভক্তবৃন্দেরও সেই অভিলাষ তিনি নবদ্বীপে বাস ক'রে প্রেমভক্তি বিতরণ করুন।

অদ্বৈত বলেন—ঠাকুরাণি, প্রভু আপনার অবস্থা দেখে বড় দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর বিরহে যে আপনার এ দশা হবে তিনি তা আগে বুঝতে পারেননি। এখন তিনি আপনার আদেশ শিরোধার্য করতে প্রস্তুত। আপনি মুখে 'গৃহে চলো' এই কথাটি বললেই হয়।

শচীদেবী কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন। তিনি শুধু স্নেহাতুরা জননী নন ; পুত্রের কল্যাণ-কামনা তাঁর মন অধিকার ক'রে আছে ; পুত্রের গৌরবে তাঁর আনন্দ, পুত্রের অকীর্তি তাঁর কাছে বেদনাদায়ক। তিনি বলেন—পুত্র গৃহ পরিত্যাগ ক'রে বৃক্ষতলে আশ্রয় নেবে, গৃহের অন্ন পরিত্যাগ ক'রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে--কোন্ জননী এ অবস্থা দেখতে পারে? নিমাই গৃহে ফিরলে আমাদের সকলের মঙ্গল, আমি খুশি হব, বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হবে, তোমরা সবাই আনন্দিত হবে কিন্তু এতে নিমাইয়ের মঙ্গল হবে কিনা তাও তো দেখতে হবে। সন্ন্যাসী হয়ে আবার গৃহে ফিরে গেলে তার ধর্ম নষ্ট হবে, লোকে উপহাস করবে, বলবে—সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ নয় ; এখন মায়ের ওজর দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। পুত্রের অখ্যাতি হবে, তার ধর্ম নষ্ট হবে তা আমি কেমন ক'রে সহ্য করবো? এর চেয়ে আমার মৃত্যুও বরং ভালো। বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ ক'রে গেলে তার বাবা ভগবানের কাছে প্রার্থনা

করতেন--বিশ্বরূপের যেন ধর্ম নষ্ট না হয়। আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি নিমাইয়ের ধর্ম নষ্ট করতে পারব না। অন্তরের তাগিদে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে; তাতেই তার কল্যাণ হোক। সে যদি নীলাচলে গিয়ে অবস্থান করে তা হ'লেই আমার সন্তোষ। মাঝে মাঝে তার খবর জানতে পারব; তোমরাও সংবাদ আনতে পারবে আবার গঙ্গাস্নানে এলে সাক্ষাৎ-ও হয়ত পাব।

তিনি বললেন:

তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যবে দুই কার্য হয়॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥

ভক্তগণ হতাশ হন। বৃদ্ধা জননীর মনের বল ও অভাবনীয় স্বার্থত্যাগ দেখে বিস্ময় অনুভব করেন, ভাবেন—এমন জননী না হ'লে কি এমন পুত্র হয়। শচীমাতা স্বেচ্ছায় যে দুঃখবরণের দৃষ্টান্ত দেখালেন তা কেবল মহাপ্রভুর জননীর পক্ষেই সম্ভব, অন্য কোন মাতার পক্ষে নয়। মহান ত্যাগের মহিমায় তিনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি হয়েছেন জগজ্জননী।

নিমাই জননীর অভিপ্রায় ভক্তদের মুখে শুনে সন্তুষ্ট হলেন, বললেন—ভালই হয়েছে। নীলাচল-চন্দ্রকে দেখবার বড়ই সাধ ছিল; জননীর আদেশে সে বাসনা আমার পূর্ণ হবে।

ভক্তদের অনুনয়ে, অদ্বৈতের অনুরোধে প্রভু অদ্বৈত-ভবনে দশদিন কীর্তন-আনন্দে অতিবাহিত করলেন। প্রতিদিন শচীমাতা নিমাইয়ের মনোমত প্রিয় খাদ্য রান্না করেন; নিমাই অমৃতজ্ঞানে তা গ্রহণ করেন। অবশেষে বিদায়ের দিন এল। শোককাতরা জননীকে প্রবোধ দিয়ে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে, ক্রন্দনরত ভক্তজনকে ফেলে নিমাই নীলাচল অভিমুখে প্রস্থান করলেন; সঙ্গে চললেন নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ ও গোবিন্দ। জগন্নাথ-দর্শনের কামনায় প্রভুর চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সকলের আগে আগে ধেয়ে চলেছেন তিনি, মুখে একই ধ্বনি—হে কৃষ্ণ কোথা তুমি, দেখা দাও, দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

# নীলাচলের পথে

নীলাচল-যাত্রী দল চলেছে বর্ধমানের পথে। গৌরাঙ্গ কৌপীনধারী। সোনার অঙ্গে রাঙা বসন। আলো ঠিক্‌রে পড়ে যেন। ভৃত্য গোবিন্দও কৌপীন পরিধান করেছে। নিমাই এমন বেগে ছুটেছেন যে, গোবিন্দ ভিন্ন আর সবাই পিছনে পড়ে যায়।

—চল গোবিন্দ, তোমাদের বাড়ীতে যাই। বর্ধমানের কাছে গিয়ে সঙ্গী গোবিন্দের পিঠে স্নেহে চাপড় দিয়ে বলেন নিমাই। চোখে তাঁর কৌতুকের হাসি।

সঙ্কুচিত হয় গোবিন্দ। গোবিন্দের বাড়ী কাঞ্চননগরে। জাতিতে কামার ; লোহার ছুরিকাঁচি, হাতাবেড়ি নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। সংসারে ছিল স্ত্রী শশিমুখী। শশিমুখী মধুমুখী নয়, মুখরা। স্বামীকে 'নির্গুণ মূর্খ' ব'লে গালি দিয়েছিল সংসারের দাম্পত্য-কলহের তপ্ত আবহাওয়ায়। এমন কত স্বামীই তো পত্নীর কাছ থেকে নানা বিশেষণে ভূষিত হয়ে থাকেন ; এগুলি ক্রমে গা-সহা হয়ে মনের ভূষণ হয়ে যায়। কিন্তু গোবিন্দ কামারের অভিমান লোহা-গরম-করা হাপরের মতোই ফোঁস্ ক'রে উঠলো। 'পচা গৃহস্থ' হয়ে আর থাকবো না—স্থির সঙ্কল্প ক'রে সংসার ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়লো। কোথায় গিয়ে মনের জ্বালা মিটাই? কোথায় পাই শান্তির আশ্রয় যেখানে নাই শশিমুখীর বিষ-মাখানো বাক্যবাণ আর মন-ভুলানো ছলাকলা? সে সময়ে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম তীরেও। গোবিন্দ শুনেছে, নিমাই প্রেমের ঠাকুর, সকলকে কোল দেন তিনি। তাঁর দানের আশায় গোবিন্দ ছুটলো নবদ্বীপ অভিমুখে। সাধারণের পথ দিয়ে না এসে মাঠে মাঠে চলে। একদিন প্রাতে গঙ্গা পার হয়ে মিশ্রঘাটে এসে গোরাচাঁদের দর্শন মিললো। নিমাই তখন নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সঙ্গী নিয়ে গঙ্গাস্নানের লীলায় মত্ত।

প্রভুর ভুবন-বিজয়ী রূপ। রূপের ছটায় গোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে গেছে।

শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥

... ... ... ...

আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন ॥

সেদিন গোবিন্দ সংসারের প্রতি বিরাগী ; শান্তিময় আশ্রয়ের প্রার্থী। ঘাটে বসে নিমাইকে নিরীক্ষণ করতে করতে মনে এল ভক্তিভাবের জোয়ার। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, থর থর ক'রে সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, ঘাম ছুটলো দেহ দিয়ে, ঘামে কাপড় ভিজে গেল। নিজেই পরে প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখেছেন :

ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥
কদম্বকুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন
ইচ্ছা অশ্রুজলে মুছি পাখালি চরণ ॥

গোবিন্দের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। গৌরাঙ্গ স্নানশেষে উঠে এলেন তাঁরই কাছে, বার বার তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। নদীতে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভেলা দেখতে পেলে প্রাণপণে তা আঁকড়ে ধরে, গোবিন্দ তেমনি নিমাইয়ের চরণ জড়িয়ে ধরে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, মনে মনে প্রার্থনা—প্রভু, আমি আর্ত, নিরাশ্রয় ; আমায় আশ্রয় দিয়ে উদ্ধার করো।

গোবিন্দের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল। প্রভুর গৃহে আপনজন-রূপে আশ্রয় পেলেন তিনি। তিনি হলেন গৌরাঙ্গের নিত্য অনুচর। গৃহত্যাগ ক'রে আসার পর থেকে তিনি আর কাঞ্চননগরে যাননি। শশিমুখী হয়ত ভেবেছে —কতদিন থাকবে, থাকুক না ; আবার এখানে ফিরতেই হবে।

কাঞ্চননগরের কাছাকাছি যেতেই প্রভু গোবিন্দকে পরীক্ষায় ফেললেন —চলো গোবিন্দ, তোমাদের বাড়ী যাই।

গোবিন্দের অগ্নিপরীক্ষা। নিমাইয়ের সঙ্গে তিনিও কৌপীন ধারণ করেছেন ; সংসারের মোহ মন থেকে দূর করেছেন। যে আশ্রয় পেয়েছেন ভাগ্যগুণে তা থেকে বিচ্যুত হবার ইচ্ছা নাই। জোড়হাত ক'রে বলেন— কাঞ্চননগরে তো আর যাব না প্রভু। জঘন্য সংসার আমি ত্যাগ করেছি চিরদিনের জন্য।

গোবিন্দ ত্যাগ করলেও শশিমুখী ছাড়বে কেন? সে ছুটে এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। কাতর অনুনয় করতে লাগল গোবিন্দের কাছে : সামান্য

কথায় তুমি সংসার ত্যাগ ক'রে গেলে, দাসীর তবে উপায় কী বলো? কার দ্বারে ভিক্ষা করবো? কে দেবে আশ্রয়?

গোবিন্দ নিরুত্তর। মাথা নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে কেবল মনে মনে শ্রীহরি স্মরণ করেন। এ-সঙ্কট থেকে উদ্ধার চান তিনি।

শশিমুখীর কাতর ক্রন্দনে প্রভু বিচলিত হন। বলেন—গোবিন্দ, তুমি না হয় গৃহেই ফিরে যাও; আমি অন্য ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে পুরী যাব।

গোবিন্দের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাঁর মনে হয়, তাঁকে বুঝি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অশ্রুজলে ভিজিয়ে দেন রাঙা চরণ। প্রার্থনা—আমায় আশ্রয়হীন ক'রো না প্রভু, আমাকে সংসারের নরক-যন্ত্রণার মধ্যে আর নিক্ষেপ ক'রো না।

গোবিন্দ সঙ্কল্পে অটুট। প্রভুর সঙ্গ থেকে কেউ তাঁকে ফিরাতে পারে না। শশিমুখীর বেড়াজালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোবিন্দ হরষিত মনে গৌরাঙ্গের অনুসরণ করেন। দূরদেশে যাবার সময় নিমাই বুঝি গোবিন্দের নিষ্ঠা-শক্তি পরখ ক'রে নিলেন।

*     *     *     *

মহাপ্রভু গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে আবার যাত্রা স্বরু করেন। দামোদর নদ পার হয়ে তাঁরা এসে উঠলেন কাশী মিত্রের বাড়ীতে। কাশী মিত্র নিষ্ঠাবান ভক্ত, সম্পন্ন গৃহী। পরম সমাদরে প্রভুকে আপ্যায়ন করেন। গৃহে তাঁর ভগবান উপনীত হয়েছেন—এই জ্ঞানে তিনি ভোগের আয়োজন করেন। সে-অঞ্চলের সেরা চা'ল এনে জুগিয়ে দেন রান্নার জন্য, স্থচিকণ, স্থগন্ধি।

—কি নামে পরিচিত এ চা'ল? প্রশ্ন করেন মহাপ্রভু।

—জগন্নাথ-ভোগ। এ দিয়ে ভোগ দিলে মনস্কাম পূর্ণ হয়—উত্তর দেন কাশী মিত্র।

'জগন্নাথ' নাম উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে প্রভু ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন। রোদন করতে করতে বলেন—হা প্রভু জগন্নাথ, আমায় শীঘ্র নাও তোমার কাছে।

মিত্র মহাশয় ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে এনেছেন প্রচুর। বেতো শাক, স্থক্তা, করলা ভাজা, গুড় দিয়ে চুকাপালঙের টক।

গোবিন্দ কিঞ্চিৎ ভোজনপ্রিয়। বেতো শাকের গন্ধে মন আকুল হয়। চোখে মুখে হয়ত অধীরতা ফুটে ওঠে।

—গোবিন্দের বড় ক্ষুধা পেয়েছে বুঝতে পারছি। বারে বারে এদিক-ওদিক চাইছ। শীঘ্র তুলসী আন ; ভোগ লাগিয়ে তোমায় প্রসাদ দেব।

প্রভুর কথায় গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে হেঁটমুখে থাকেন, ভাবেন প্রভু অন্তর্যামী। অমৃতসম সুস্বাদ প্রসাদে উদরপূর্তি ক'রে ভোজন ক'রে গোবিন্দ তৃপ্ত হন।

মিত্র-গৃহ ছেড়ে এবার মহাপ্রভু দক্ষিণ-দিক অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর, কণ্ঠে মধুর হরিনাম।

* * * *

এর পর হাজিপুর গ্রাম। গ্রামের বহিঃপ্রান্তে একটি বিশাল বটবৃক্ষ। তার নীচে গিয়ে উপবেশন করেন মহাপ্রভু ও গোবিন্দ। সন্ধ্যাকালে প্রভু কীর্তন আরম্ভ করলেন ; মধুরকণ্ঠে হরেকৃষ্ণ নাম তার সঙ্গে মন-মাতানো নৃত্য। আবেশে আত্মহারা হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন মাটিতে, সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যায়, মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। সে অপূর্ব কীর্তন আর ভাবাবেশ দেখতে গ্রামের নরনারী এসে সমবেত হয়। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সবাই যোগ দেয় সে কীর্তনে ; করতালি দিয়ে নাচে আর গায়। গ্রামে যেন হরিনামের মহোৎসব পড়ে যায়। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত চলে অভিনব উৎসব।

কয়েকজন ভক্ত সন্ন্যাসীর ভোগের আয়োজন ক'রে দেয়। 'নিম্বসুক্তা ঘৃত আর করলা ভাজা।' গোবিন্দের ভোজনে পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় হাসফাস সুরু হয়, উদর ফুলে ওঠে। গোবিন্দ গিয়ে প্রভুর শরণ নেন। স্মিতমুখে ভৃত্যের স্ফীতোদরে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দেন প্রভু ; উদ্বেগ শান্ত হয়।

প্রত্যূষে হাজিপুর ত্যাগ ক'রে চৈতন্যদেব মেদিনীপুরের কাছে এসে উপনীত হলেন। নবীন সন্ন্যাসীর কথা লোকমুখে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে দেখবার জন্য বহুলোকের সমাগম। তাঁর সুশ্রী সুঠাম দেহ, ভাববিহ্বল নৃত্য, উন্মাদনাময় নামকীর্তন দর্শককে মুগ্ধ করে। কৌতূহলী দর্শকদের সবাই যে হরিনামে আকৃষ্ট হয় তা নয়। অপর সকলের সঙ্গে এক ধনশালী ব্যক্তিও এসেছে সন্ন্যাসী-দর্শনে ; নাম কেশব সামন্ত। নিজে ভোগ-বিষয়াসক্ত। সুস্থ সবল দেহে মানুষ যে ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে পারে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাতে তার মনে জাগে সন্দেহ।

কথায় তুমি সংসার ত্যাগ ক'রে গেলে, দাসীর তবে উপায় কী বলো ? কার দ্বারে ভিক্ষা করবো ? কে দেবে আশ্রয় ?

গোবিন্দ নিরুত্তর। মাথা নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে কেবল মনে মনে শ্রীহরি স্মরণ করেন। এ-সঙ্কট থেকে উদ্ধার চান তিনি।

শশিমুখীর কাতর ক্রন্দনে প্রভু বিচলিত হন। বলেন—গোবিন্দ, তুমি না হয় গৃহেই ফিরে যাও ; আমি অন্য ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে পুরী যাব।

গোবিন্দের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাঁর মনে হয়, তাঁকে বুঝি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অশ্রুজলে ভিজিয়ে দেন রাঙা চরণ। প্রার্থনা—আমায় আশ্রয়হীন ক'রো না প্রভু, আমাকে সংসারের নরক-যন্ত্রণার মধ্যে আর নিক্ষেপ ক'রো না।

গোবিন্দ সঙ্কল্পে অটুট। প্রভুর সঙ্গ থেকে কেউ তাঁকে ফিরাতে পারে না। শশিমুখীর বেড়াজালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোবিন্দ হরষিত মনে গৌরাঙ্গের অনুসরণ করেন। দূরদেশে যাবার সময় নিমাই বুঝি গোবিন্দের নিষ্ঠা-শক্তি পরখ ক'রে নিলেন।

* * * *

মহাপ্রভু গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে আবার যাত্রা স্থরু করেন। দামোদর নদ পার হয়ে তাঁরা এসে উঠলেন কাশী মিত্রের বাড়ীতে। কাশী মিত্র নিষ্ঠাবান ভক্ত, সম্পন্ন গৃহী। পরম সমাদরে প্রভুকে আপ্যায়ন করেন। গৃহে তাঁর ভগবান উপনীত হয়েছেন—এই জ্ঞানে তিনি ভোগের আয়োজন করেন। সে-অঞ্চলের সেরা চা'ল এনে জুগিয়ে দেন রান্নার জন্য, স্থচিকণ, স্থগন্ধি।

—কি নামে পরিচিত এ চা'ল ? প্রশ্ন করেন মহাপ্রভু।

—জগন্নাথ-ভোগ। এ দিয়ে ভোগ দিলে মনস্কাম পূর্ণ হয়—উত্তর দেন কাশী মিত্র।

'জগন্নাথ' নাম উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে প্রভু ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন। রোদন করতে করতে বলেন—হা প্রভু জগন্নাথ, আমায় শীঘ্র নাও তোমার কাছে।

মিত্র মহাশয় ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে এনেছেন প্রচুর। বেতো শাক, স্থক্তা, করলা ভাজা, গুড় দিয়ে চুকাপালঙের টক।

গোবিন্দ কিঞ্চিৎ ভোজনপ্রিয়। বেতো শাকের গন্ধে মন আকুল হয়। চোখে মুখে হয়ত অধীরতা ফুটে ওঠে।

—গোবিন্দের বড় ক্ষুধা পেয়েছে বুঝতে পারছি। বারে বারে এদিক-ওদিক চাইছ। শীঘ্র তুলসী আন ; ভোগ লাগিয়ে তোমায় প্রসাদ দেব।

প্রভুর কথায় গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে হেঁটমুখে থাকেন, ভাবেন প্রভু অন্তর্যামী। অমৃতসম সুস্বাদ প্রসাদে উদরপূর্তি ক'রে ভোজন ক'রে গোবিন্দ তৃপ্ত হন।

মিত্র-গৃহ ছেড়ে এবার মহাপ্রভু দক্ষিণ-দিক অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর, কণ্ঠে মধুর হরিনাম।

* * * *

এর পর হাজিপুর গ্রাম। গ্রামের বহিঃপ্রান্তে একটি বিশাল বটবৃক্ষ। তার নীচে গিয়ে উপবেশন করেন মহাপ্রভু ও গোবিন্দ। সন্ধ্যাকালে প্রভু কীর্তন আরম্ভ করলেন ; মধুরকণ্ঠে হরেকৃষ্ণ নাম তার সঙ্গে মন-মাতানো নৃত্য। আবেশে আত্মহারা হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন মাটিতে, সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যায়, মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। সে অপূর্ব কীর্তন আর ভাবাবেশ দেখতে গ্রামের নরনারী এসে সমবেত হয়। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সবাই যোগ দেয় সে কীর্তনে ; করতালি দিয়ে নাচে আর গায়। গ্রামে যেন হরিনামের মহোৎসব পড়ে যায়। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত চলে অভিনব উৎসব।

কয়েকজন ভক্ত সন্ন্যাসীর ভোগের আয়োজন ক'রে দেয়। 'নিম্বসুক্তা ঘৃত আর করলা ভাজা।' গোবিন্দের ভোজনে পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় হাসফাস সুরু হয়, উদর ফুলে ওঠে। গোবিন্দ গিয়ে প্রভুর শরণ নেন। স্মিতমুখে ভৃত্যের স্ফীতোদরে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দেন প্রভু ; উদ্বেগ-শান্ত হয়।

প্রত্যূষে হাজিপুর ত্যাগ ক'রে চৈতন্যদেব মেদিনীপুরের কাছে এসে উপনীত হলেন। নবীন সন্ন্যাসীর কথা লোকমুখে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে দেখবার জন্য বহুলোকের সমাগম। তাঁর সুশ্রী সুঠাম দেহ, ভাববিহ্বল নৃত্য, উন্মাদনাময় নামকীর্তন দর্শককে মুগ্ধ করে। কৌতূহলী দর্শকদের সবাই যে হরিনামে আকৃষ্ট হয় তা নয়। অপর সকলের সঙ্গে এক ধনশালী ব্যক্তিও এসেছে সন্ন্যাসী-দর্শনে ; নাম কেশব সামন্ত। নিজে ভোগ-বিষয়াসক্ত। সুস্থ সবল দেহে মানুষ যে ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে পারে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাতে তার মনে জাগে সন্দেহ।

—সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার তরুণ যৌবন ; এখন কি কৌপীন ও-দেহে সাজে ? কৌপীন ফেলে দিয়ে বসন গ্রহণ করো, জীবন উপভোগ করার জন্য টাকাকড়ি যা লাগে নাও। বৈরাগ্য ক'রে নিজেকে কষ্ট দাও কেন ?

মৃদু হাসেন মহাপ্রভু। বিষয়-বাসনার মোহে কেশব সামন্ত অন্ধ। জাগতিক স্থূল ভোগকেই মনে করে জীবনের পরম কাম্য ; অর্থের অহমিকায় মন তার ভরা। অর্থই তার কাছে পরমার্থ।

প্রভু বলেন : অর্থের কথা বলছো, টাকাকড়ি সোনা মরকত সবই মাটির বিকার ; পরিণামে এ-সবই হবে মাটি। এই যে দেহের এত যত্ন পরিপাটি, এর পরিণাম কি ? এই আদরের দেহ পুড়ে ছাই হবে, আর যদি না পোড়ে তবে শৃগালে খাবে। ধন জন যৌবন—এ-সব অনিত্য বিষয় নিয়ে কিসের গৌরব ? ওহে ধনিবর, তুমি কি হীরাপান্না মণিমুক্তা আহার করো ? ক্ষুধা নিবারণের জন্য একমুষ্টি অন্নই তো যথেষ্ট !

ধনমদে মত্ত ব্যক্তির মন হাঁসের পিঠের মতো। তাতে তত্ত্বকথার জল ধরে না। জমি কোমল না হ'লে তাতে বীজ অঙ্কুরিত হবে কেমন ক'রে ? ধনী ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের চেয়ে বরং সূচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ সহজতর। অর্থ ও দেহসর্বস্ব যারা তাদের পক্ষে ভগবান যীশুর এ-কথা একান্তই সত্য। সকল দেশে এবং সকল যুগে মানুষের প্রকৃতি একই রূপ।

কেশব সামন্তের কথার উত্তরে কিছু উপদেশ দিয়ে নিমাই যাত্রা করলেন নারায়ণগড়ের দিকে ; রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করবেন। সেখানে ধলেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই শিব-দর্শনের আশায় উল্লসিত মনে ছুটে চললেন এবং সন্ধ্যাকালে নারায়ণগড়ে গিয়ে পৌঁছলেন।

নারায়ণগড়ের গ্রাম্যদেব ধলেশ্বর শিব-বিগ্রহের সম্মুখে গিয়ে গৌরাঙ্গদেব 'হর হর' ব'লে উচ্চধ্বনি ক'রে কাঁদতে থাকেন। প্রেমে গদগদ হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন ধরণীতে, গড়াগড়ি যান ধূলায়। বহির্বাস কৌপীন কোথায় খুলে পড়ে ; মহাসাত্ত্বিকের ভাব উপস্থিত হয়, পুলক রোমাঞ্চে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে, রোমকূপ দিয়ে রক্তবিন্দু ক্ষরিত হ'তে থাকে। অদ্ভুত প্রেমভক্তির প্রকাশ দেখে দর্শকজন বিস্মিত হয়, দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করে শ্রীচৈতন্যকে। প্রেমাবেশে প্রভু হরিধ্বনি ক'রে নৃত্য করতে থাকেন। দলে দলে নরনারী সমবেত হয় অসাধারণ তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে। কতক লোক ভোগের জন্য আটা চূনা লাড্ডু এনে নিবেদন করে।

নারায়ণগড়ের বৃক্ষতল মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পুণ্যস্থানে পরিণত হয়। সাধারণ লোক আসে দলে দলে, ধনী ব্যক্তিরাও আসেন জাঁকজমকের সঙ্গে। বীরেশ্বর সেন আর ভবানীশঙ্কর ধনবান প্রতাপশালী ব্যক্তি। শত শত অনুচর-সহচর সঙ্গে নিয়ে হাতীঘোড়া চতুর্দোলা সাজিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে তাঁরা আসেন গৌরাঙ্গ-দর্শনে ; হাতীর পিঠে ডঙ্কা আর বিচিত্র নিশান, আগে আগে চলে রূপোর আসাসোটা। অর্থসম্পদের অহঙ্কার এঁদের মনে প্রবল, ঐশ্বর্যের দম্ভ গগনস্পর্শী।

এদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে প্রভু প্রেমভক্তি শিক্ষা দেন। চতুর্দিকে হাজার হাজার লোক নীরবে দাঁড়িয়েছে জ্যোতির্ময় নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে। দন্তে তৃণ ধরি' জোড়হাতে প্রভু সকলকে বলেন ঃ আমার সামান্য কথা সবাই শোন। দেখ, ধনীমহাশয়গণ, এই জগৎ যেন বেদের ভেল্কীবাজি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যখন সিংহাসনে চড়ো তখন নিজেকে রাজা ব'লে মনে হয়, চারিদিকে পাত্রমিত্র ; লক্ষ লক্ষ প্রজা এসে উপহার দেয় ; চারিদিকে জাঁকজমক ঐশ্বর্যের ঝক্‌মকি। কিন্তু স্বপ্ন তো প্রতিচ্ছায়ার ছায়া মাত্র। কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া হ'ল এই জড়জগৎ, জড়জগতের প্রতিবিম্ব হ'ল স্বপ্ন। ভেবে দেখো, স্বপ্ন ও জাগরণ দুইটিই স্বপ্ন—একটি নিদ্রায়, অপরটি জাগরণে। 'রাজার রাজত্ব সব জাগিয়া স্বপন।' সোনারূপা মণিমুক্তা সবই মাটির বিকার। এই অনিত্য সংসারে কেবল ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু, আর যা-কিছু দেখো সবই মিথ্যা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণময় কিন্তু কি ভাবে তা দেখতে পাবে ? জলের ভিতরে যে ডুবে থাকে ডাঙার বস্তু সে কেমন ক'রে দেখবে ? তাকে যদি জল থেকে ডাঙায় তোল তবেই সে দেখতে পাবে। তেমনি সংসারের বিষয়ে যে ডুবে আছে সে রাধা কৃষ্ণদর্শন করবে কেমন ক'রে ? মায়ার ঠুলি যার চোখে বাঁধা সে কেবল ঘানির বলদের মতো সংসারের সঙ্কীর্ণ পথে ঘুরে ঘুরে মরে। জড়জগতের সূক্ষ্মভাব স্থূলভাবে অনুভব করা সম্ভবপর নয়। জড়ভাব ছেড়ে যখন চৈতন্যময় হবে তখনই কৃষ্ণের মূর্তি দেখতে পাবে। কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা, জড়ের মধ্যেও দিয়েছেন শক্তি ; জড়ে আর চৈতন্যে যেন গাঁইট লাগিয়েছেন ; যার ভক্তি আছে সেই দেখতে পায়, যার রজস্তম গুণ নাশ হয়েছে সেই সে গাঁইট খুলতে পারে। "মায়াময় ঠুলি পরি' জীব ঘুরে মরে, এ কারণ সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিতে না পারে।"

নারায়ণগড় ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু জলেশ্বর গ্রামে এসে উপস্থিত হন।

সেখানে এক মন্দিরে বিশ্বেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রভু ভক্তিপূর্ণ অন্তরে প্রবেশ করেন সেখানে। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক সন্ন্যাসী থাকেন একক, ধ্যানস্থ। প্রভু তাঁর সম্মুখে প্রণাম করতেই তিনি চম্‌কে উঠে বলেন—কে তুমি সন্ন্যাসী? তুমি তো সামান্য নহ; আমার সম্মুখে প্রণাম করছো কেন? কোন্ পুণ্যফলে আজ তোমার দর্শন পেলাম, তোমাকে দেখে আমার বন্ধন কাট্‌লো, সকল পাপ ক্ষয় হ'ল।

বলতে বলতে সন্ন্যাসী গদগদ হয়ে কেঁদে আকুল। মহাপ্রভু তখন তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণনামে মেতে উঠলেন। কখনো কৃষ্ণ ব'লে ঝাঁপ দিয়ে দৌড় দেন, কখনো ভূমিতে গড়াগড়ি। বহুলোক মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয় নবীন প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসীকে দেখতে। তারাও কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে যোগ দেয়; আনন্দোৎসব পড়ে যায়। সারারাত্রি ধরে চলে মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস।

পরদিন স্বর্ণরেখা পার হয়ে হরিহরপুর গ্রামে উপনীত হন নিমাই। সেখানে নামকীর্তন ও ভাবাবেশ-নৃত্যে সমস্ত দিন কেটে গেল। ভাবে বিহ্বল হয়ে নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে আবার সুরু হয় নৃত্য; কীর্তনের আনন্দে প্রভু কেঁদে আকুল।

তার পরদিন বালেশ্বরে গিয়ে অবস্থান। সেখানে গোপাল বিগ্রহ দেখে প্রভু পুলকিত অন্তরে দিন যাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড়ে গিয়ে পৌঁছেন; সেখানে সমাগত দর্শক ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সারাটি দিন হরিনাম কীর্তন ও ভাবাবেশ-নৃত্যে অতিবাহিত হ'ল।

প্রভু নীলাচলের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেন। নীলগড় ছেড়ে উপস্থিত হলেন বৈতরণী নদীতীরে। প্রেমভাবে মাতোয়ারা নিমাই 'কৃষ্ণ পার কর' ব'লে কেঁদে আকুল হন। বৈতরণী পার হয়ে ধেয়ে চলতে থাকেন, প্রেমে তবু গদগদ; হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলতে বলতে পথ চলেন, বাহ্যজ্ঞান নাই, কোন দিকে চেয়েও দেখেন না। পরদিন মহানদী পার হয়ে যান; পথে গোপীনাথের মন্দির। বিগ্রহ দর্শন ক'রে আনন্দিত মনে নিমাই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

তারপর সাক্ষীগোপাল দর্শনের জন্য অধীর হয়ে গৌরাঙ্গ ধেয়ে চলতে থাকেন, দুই বাহু তুলে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করেন, অশ্রুধারা বুক বেয়ে মাটিতে পড়ে। দূর থেকে সাক্ষীগোপাল দেখে প্রেমে বিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে

পড়েন। গোপালের মুখপানে চেয়ে 'গোপাল গোপাল' ব'লে সে কী অঝোরে কান্না!

সাক্ষীগোপাল ছেড়ে নিংরাজের মন্দির। সেখানে গিয়ে প্রভু প্রেমভরে রোদন করতে থাকেন। নিংরাজ ত্যাগ ক'রে উপস্থিত হলেন আঠারনালায়। এখান থেকে শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হ'ল। অমনি 'হা হা প্রভু জগন্নাথ' ব'লে গৌরাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েন; চোখের জলে মাটি ভিজে কাদা হয়ে যায়। আবার ক্ষণপরে ভূমি থেকে উঠে ছুটে চলেন, যাকে সম্মুখে পান জড়িয়ে ধরে বলেন—ঐ দেখ কৃষ্ণ আমার গোপালবেশে নাচছে; মরি মরি! চুলের কি শোভা!

ক্ষণপরে ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়েন, গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদেন চীৎকার ক'রে। এমনি প্রেমানন্দে উচ্ছ্বাসে টলমল করতে করতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েই মহাপ্রভু আত্মহারা হয়ে পড়েন। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে গরুড়স্তম্ভ জাপ্‌টে ধরেন, কপাল কেটে রক্তধারা বইতে থাকে। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল; দেহবোধ নাই; অশ্রুর বান নামে দীঘল অরুণ নয়নে। ঝাপসা চোখে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পান না। 'হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ' ব'লে আকুলভাবে রোদন করতে থাকেন, কপাল থেকে রক্তের ধারা বুক বেয়ে পড়ে অশ্রুধারার সঙ্গে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখে সবাই এই প্রেমে-পাগল দেবকান্তি নবীন সন্ন্যাসীকে। ধ্যানপুরী নামে এক সাধু উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়ে শোণিত-ধারা মুছিয়ে দেন। প্রভু নির্বিকার। প্রেমাবেগে তনুদেহ থর থর ক'রে কাঁপে।

## বাসুদেব সার্বভৌম

শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের দ্বার-পণ্ডিত। যশস্বী মহাপণ্ডিত তিনি। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ সেকালে কেউ ছিল না। রাজদরবারে তাঁর বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তি। পাণ্ডিত্যে, নিষ্ঠাযুক্ত আচরণে, অধ্যাপনায় তিনি সর্বজনপূজ্য। বিদ্যার গৌরবে তিনি ভূষিত। আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। প্রৌঢ় বয়স ; শ্রী এবং সম্পদশালী সংসার।

গৌরাঙ্গ যখন প্রথম জগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে এসে বিগ্রহ দর্শন ক'রে আত্মহারা হয়ে পড়েন, তখন দৈবক্রমে বাসুদেব সার্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রেমবিহ্বল-তনু নিমাই ভাবে উন্মাদ হয়ে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করতে ছুটে চললেন মন্দির-অভ্যন্তরে। এই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ব্যাপারে সন্ত্রস্ত হয়ে জগন্নাথ-সেবকগণ তাঁর গতিরোধ করার জন্য প্রহার করতে উদ্যত হ'ল।

সার্বভৌম চীৎকার ক'রে উঠলেন: এই থামো, থামো। সাবধান! কিছু ব'লো না।

সেবকগণ নিবৃত্ত হ'ল। নিমাই-ও বেশীদূর যেতে পারলেন না। কিছুটা গিয়েই অজ্ঞান হয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন পাষাণের মেঝের ওপর। দেহ নিথর, নিস্পন্দ, জ্যোতির্ময়। গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার দেখে সার্বভৌমের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। বহুক্ষণ চলে যায়, সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফিরে আসে না। মহাপ্রভুকে ঐরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে সার্বভৌম মনে মনে বিচার করেন ; এই সুন্দরতনু তরুণ-সন্ন্যাসীর দেহে দেখছি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার লক্ষণ। সাত্ত্বিক ভাবসকল বিশেষরূপে উজ্জ্বল হয়ে মহাভাব-রূপে পরম উৎকর্ষ লাভ ক'রে সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কী নিবিড় প্রেমানুরাগ, কী নিবিড় মূর্ছা! মানুষের দেহে এমন দেখা যাবে তা তো ধারণার অতীত ছিল।

এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।

নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত-ভাব হয়॥
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি—বড় চমৎকার॥ —চৈতন্য চরিতামৃত

সার্বভৌম গুণী ব্যক্তি; শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভাবলক্ষণ দেখে তিনি বুঝতে পারেন নবীন সন্ন্যাসী ঈশ্বরপ্রেমিক পুরুষরতন। তিনি যত্ন-পরিচর্যার জন্য মূর্ছিত গৌরাঙ্গকে নিজগৃহে এনে উত্তম পবিত্র স্থানে রাখার বন্দোবস্ত করেন।

শিষ্য-পরিছা দ্বারা আনিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥

*　　*　　*　　*

অপরিচিত প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসীকে গৃহে এনে সার্বভৌম তাঁর কাছে বসে পুলকবিস্ময়ে অপরূপ সৌন্দর্য ও ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করছিলেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বোঝা যায় না, উদর পর্যন্ত নড়ে না। চিন্তিত হয়ে তিনি একটু সূক্ষ্ম তূলা হাতে নিয়ে সন্ন্যাসীর নাকের সামনে ধরলেন। তূলা সামান্য একটু নড়লো। বুঝতে পারলেন ক্ষীণভাবে শ্বাস প্রবাহিত রয়েছে। মনের উদ্বেগ তাঁর প্রশমিত হ'ল।

সঙ্গিগণকে পিছনে ফেলে নিমাই আগে মন্দির-দ্বারে এসে উপনীত হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ পরে এসে শুনলেন মূর্ছিত এক সন্ন্যাসীকে সার্বভৌম যত্নসহকারে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। তখন তাঁদের বুঝতে বাকি রইলো না যে, তিনি প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য ভিন্ন আর কেউ নন। শ্রীমন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেব-দর্শনের আগেই তাঁরা সার্বভৌমের গৃহ অভিমুখে চললেন। পথে দৈবাৎ সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি নদীয়া-নিবাসী; মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত। মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় আছে। হঠাৎ পথে দেখা পেয়ে তিনি আনন্দিত হলেন এবং মুকুন্দকে আলিঙ্গন ক'রে প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন।

মুকুন্দ বলেন : যখন আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই আপনার দর্শন মিললো। বড়ই ভালো হ'ল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে আমাদের সঙ্গে নীলাচলে এসেছেন। আমাদের পিছনে ফেলে আগে ছুটে এসেছেন দর্শন করতে। এখন শুনছি তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন;

সেই অবস্থায় সার্বভৌম নিয়ে গেছেন তাঁর আলয়ে। চলুন, সেখানে আগে প্রভুকে দর্শন করি, পরে ঈশ্বর-দর্শন করবো।

গোপীনাথ আচার্য পুলকিত হন। প্রভুকে এত শীঘ্র দর্শন করতে পারবেন, তা কল্পনা করেননি। উল্লসিত হয়ে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে তিনি বাসুদেব ভট্টাচার্য সার্বভৌমের বাসগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। প্রভু তখনও অচেতন। ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন আরম্ভ করলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা ফিরে এল।

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি হরি' বলি।
আনন্দে সার্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রভু সমুদ্র-স্নান ক'রে এলেন সঙ্গীদের নিয়ে। সার্বভৌম নিজে পরিবেশন ক'রে সকলকে ভোজন করালেন। তারপর প্রভুর অনুমতি নিয়ে গোপীনাথ আচার্যকে তাঁর সামনে নিয়ে এলেন।

গোপীনাথ ভক্তিভরে নমস্কার করেন : নমো নারায়ণায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ আশীর্বাদ করেন : কৃষ্ণে মতিরস্তু।

সার্বভৌম মনে মনে সিদ্ধান্ত করেন সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। এ পর্যন্ত তিনি প্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় পাননি। গোপীনাথের নিকট সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোপীনাথ বলেন : ইনি নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।

সার্বভৌম : চক্রবর্তী আমার পিতৃদেবের সমাধ্যায়ী। মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য। পিতার সম্বন্ধে দুজনকেই পূজ্য ব'লে মনে করি। নিমাইকে বলেন :

সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ও সন্ন্যাস।
অতএব হভ আমি তোমার নিজ-দাস॥

মহাপ্রভু কুণ্ঠিত হয়ে বলেন :

শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু! এ কী কথা বল সার্বভৌম! তুমি সর্বজনপূজ্য মহাপণ্ডিত। তুমি সর্বলোকের হিতকারী, বেদান্তের অধ্যাপক, সন্ন্যাসীর উপকারী। আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল-মন্দ কিছু বুঝি না। গুরু মনে ক'রে তোমার আশ্রয় নিয়েছি; তোমার সঙ্গলাভ করার জন্যেই এখানে এসেছি। সকল প্রকারে তুমি আমার মঙ্গল বিধান করবে, আমায় পালন করবে, এই আমার নিবেদন।

তুমি জগৎ-গুরু সর্বলোক-হিতকর্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তা ॥
আমি বালক সন্ন্যাসী—ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল 'গুরু করি' মানি ॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্বপ্রকারে আমারে করিবে পালন ॥

মহাপ্রভুর সুবিনীত ভাষণে সার্বভৌম খুশি হন। বিদ্যা ও বিদ্যার গৌরবে উৎকলে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে তিনি উন্নতশির, যশের অভিমানী। নিমাই ছাত্রজনোচিত বিনয় প্রদর্শন করায় সার্বভৌমের মনে তাঁর প্রতি কৃপামিশ্রিত স্নেহের ভাব জেগে উঠলো। জগন্নাথ-মন্দিরে অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসীর দেহে সাত্ত্বিক মহাভাবের লক্ষণগুলি দেখে তাঁর মনে যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখা দিয়েছিল, মহাপ্রভুর নবদ্বীপের পরিচয় পাওয়ার পর তা কিছুটা ক্ষীণ হয়। মানুষের স্বভাবই এমনি ; পরিচিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিতে সে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত। তদুপরি সে ব্যক্তি যদি বয়োকনিষ্ঠ হয় তবে অভিমানে আরো বেশী বাধে। সার্বভৌমের হ'ল এই অবস্থা। তাঁর মনে চলছিল নীরব দ্বন্দ্ব। নীলাচলে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ স্থান তিনি অধিকার ক'রে আছেন, তা কি তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে স্বস্থান-নিবাসী এই তরুণ সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠ ব'লে মেনে নেবেন ? তিনি বরং সন্ন্যাসীকে পাণ্ডিত্যের প্রভায় মুগ্ধ ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর বিদ্যা, যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারে সন্ন্যাসী যেন প্রতিদ্বন্দ্বী ! সার্বভৌম মনে ভাবেন তাঁর বিদ্যাবলে তিনি মহাভাবের অধিকারী সন্ন্যাসীকে পরাস্ত করবেন এবং তাঁর নিজের বশ্যতা স্বীকার করাবেন।

*  *  *  *

মহাপ্রভুর বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন সার্বভৌম। সেখানে তাঁর সুবন্দোবস্ত ক'রে গোপীনাথ মুকুন্দকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছেন সার্বভৌমের গৃহে। সার্বভৌম গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই সুদর্শন সন্ন্যাসীর স্বভাব অতি নম্র ; এঁর ওপর আমার বিশেষ প্রীতি হয়েছে। কোন্ সম্প্রদায়ে ইনি সন্ন্যাস করেছেন, এঁর নাম কি—এ-সব জানতে ইচ্ছা করি।

প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বর্ধে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা ইহার নাম— শুনিতে হয় মন॥

গোপীনাথঃ এঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মহাধন্য·কেশব ভারতী এঁর গুরু।

—এঁর নাম সর্বোত্তম। কিন্তু ভারতী সম্প্রদায় তো উচ্চ নয়।

গোপীনাথঃ কোন্ সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করলে কে কি বলবে না বলবে, সেদিকে এঁর দৃক্‌পাত নাই; ইনি হয়ত বড় সম্প্রদায় উপেক্ষাই করেছেন।

সার্বভৌম মনে মনে মহাপ্রভুর অভিভাবক সেজেছেন। বলেন—এঁর ভরা যৌবন, সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষা হবে কেমন ক'রে? আমি এঁকে বেদান্ত শুনিয়ে বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাবো। আর যদি তেমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে যোগপট্ট দিয়ে কোন উত্তম সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এনে এঁকে সংস্কার করিয়ে নেব।

সার্বভৌমের ধারণা শঙ্করাচার্য-প্রদর্শিত অদ্বৈতমার্গই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থনযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য পথ; তরুণ সন্ন্যাসী বেদান্ত উপলব্ধি না ক'রে অজ্ঞতাবশতঃ হীন সম্প্রদায়ের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বেদান্ত ভাষ্য বুঝিয়ে তাঁকে স্বমতে বিশ্বাসী করানো কঠিন হবে না। সার্বভৌম ভেবেছেন —নিমাই বিদ্যায় তাঁর চেয়ে কম, বুদ্ধিতে কাঁচা।

ভট্টাচার্য কহে—ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাকে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরায় যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥

—চৈতন্য চরিতামৃত

সার্বভৌমের দম্ভপূর্ণ কথায় মুকুন্দ ও গোপীনাথ ব্যথিত হন। গোপীনাথ কিছুটা উষ্মার সঙ্গে শ্যালককে বলেন—ভট্টাচার্য, তুমি এঁর মহিমা কিছুই জান না। ভগবানের পূর্ণ লক্ষণ সমস্তই এঁতে প্রকাশিত। অজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না কিন্তু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখে পণ্ডিতগণ এঁকে ঈশ্বর ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারেন।

ভট্টাচার্য ! তুমি ইহার জান না মহিমা ।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥

সার্বভৌমের শিষ্যগণ কলরব ক'রে ওঠে : ঈশ্বর বলছেন, কিন্তু তার প্রমাণ কী ?

গোপীনাথ উত্তর করেন :

মুনিঋষি প্রভৃতি মহাসাধক ও শাস্ত্রকর্তা মহাজ্ঞানীজন ঈশ্বরের যে সকল লক্ষণের কথা বলেছেন, সে সমস্তই এঁতে বিদ্যমান। কাজেই এঁকে ঈশ্বর ব'লে বোঝা যায়।

শিষ্য : বলুন অনুমান-সাপেক্ষ।

গোপীনাথ বলেন :

অনুমান নয়। অনুমান সত্য না-ও হ'তে পারে। তর্ক দিয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না, এর জন্য চাই ঈশ্বরের কৃপা। যাঁর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় কেবল তিনিই তাঁকে বুঝতে পারেন, অন্যে নয়। ঈশ্বরের কৃপাতে হয় ভক্তি ; ঈশ্বর ভক্তির বশ। কেবল ভক্তি দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, তর্ক দিয়ে নয়।

সার্বভৌমকে বলেন—তুমি জগৎ-গুরু, শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নাই। তাই তুমি ঈশ্বর-তত্ত্ব জানতে পার না। প্রভুর মহাপ্রেমাবেশের সময় এঁর শরীরে শাস্ত্রে উল্লিখিত ঈশ্বর-লক্ষণ তুমি দেখতে পেয়েছ কিন্তু কৃপা নাই তোমার ওপর, ঈশ্বরের মায়ায় তুমি অন্ধ, দেখে-ও দেখতে পাও না।

তার্কিক সার্বভৌম মৃদু হাসেন অবিশ্বাসের হাসি। শাস্ত্রের নজির উল্লেখ ক'রে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, কলিতে বিষ্ণুর অবতার নাই, তাই তিনি ত্রিযুগ নামে অভিহিত। গোপীনাথ গীতার শ্লোক উল্লেখ করেন যেখানে কৃষ্ণ বলেছেন—ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

সার্বভৌমকে বলেন—তোমার হৃদয় তর্কনিষ্ঠ ; উষর মরুভূমির মতো। তাঁর কৃপা যখন হবে তখন তুমি-ও এই সিদ্ধান্ত করবে।

শ্যালক-ভগিনীপতির দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না। ভগিনীপতি ভক্তিমান বিশ্বাসী ; শ্যালক শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্তিবিহীন। মুকুন্দ গোপীনাথ আচার্যের বাক্য-প্রয়োগে সন্তোষলাভ করেন কিন্তু সার্বভৌমের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় না দেখে ক্ষোভ পোষণ করতে থাকেন। মহাপ্রভুর নিকটে ফিরে তাঁরা

সার্বভৌমের সঙ্গে আলোচনা বিবরণ দিয়ে তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

মহাপ্রভু তাঁর অনুরাগীদের সার্বভৌমের নিন্দা করা থেকে নিবৃত্ত করেন, বলেন : ছি ছি, তোমরা ও-কথা বলো না। আমার প্রতি ভট্টাচার্যের বিশেষ স্নেহ, তিনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা করেন। তিনি আমার সন্ন্যাসধর্ম বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন ; এতে দোষ কি ?

মহাপ্রভু কহে—ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥

বিজয়ের অবতার মহাপ্রভু নম্রতা প্রকাশ ক'রে ভক্তদের সামনে উদাহরণ স্থাপন করেন। মুকুন্দ ও গোপীনাথের মনের ক্ষোভ দূর হয় না। তাঁরা মনে মনে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

* * * *

একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌমের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন ক'রে সার্বভৌমের গৃহে এসেছেন। তাঁর আত্ম-বিশ্বাস ও বিদ্যা বিষয়ে অহমিকা রীতিমত উগ্র হয়ে উঠেছে ; মনে মনে তিনি মহাপ্রভুর গুরু সেজে বসেছেন। তাঁকে বসার আসন দিয়ে সার্বভৌম বললেন—বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম। তুমি আমার নিকট বেদান্ত শ্রবণ কর।

প্রভু শিশুর মতো সরলভাবে বিনীতকণ্ঠে উত্তর দেন : আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ। তুমি যা বল, তাই ত আমার কর্তব্য।

সার্বভৌম হৃষ্টমনে সন্ন্যাসীকে বেদান্ত-ভাষ্য শোনাতে সুরু করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, প্রভু নীরবে শোনেন—কোন কথাই বলেন না। এইভাবে পর পর সাতদিন অতিবাহিত হ'ল। নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সচেতন সার্বভৌমের মনে মনে অহমিকা—আমার মতো ব্যাখ্যা আর কে করতে পারে ? আমার মতের খণ্ডনই বা কে করতে পারে ? আশা করেছিলেন, মহাপ্রভু তাঁর বিদ্যার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত, মুগ্ধ হবেন কিন্তু তাঁকে মৌন দেখে কিছুটা বিরক্ত হন। অষ্টম দিনে তিনি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন : সাতদিন ধরে বেদান্ত শুনলে ; ভাল-মন্দ কিছুই তো বল না। আমার ভাষ্য বুঝতে পার কিনা তা-ও বুঝতে পারছিনে।

প্রভু বলেন ঃ আমার অধ্যয়ন নাই, আমি তো মূর্খ। তোমার আদেশে কেবল শ্রবণ করছি। তুমি বলেছ—বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম। সেই ধর্ম রক্ষার জন্য কেবল শুনছি। তুমি যে অর্থ কর, তা বুঝতে পারিনে।

সার্বভৌমের মনে উষ্মা জেগে ওঠে—তবে কি তাঁর বাক্‌কুশলতা কম আছে, না পাণ্ডিত্য কম ? এমন প্রাঞ্জল ভাষ্য তা-ও বোঝা যায় না ?

প্রভুকে বলেন ঃ যে বুঝতে পারে না, সে তো প্রশ্ন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে। তুমি তো শুনে চুপ ক'রেই আছ কিছু জিজ্ঞাসা করো না, তোমার মনে কি আছে কেমন ক'রে জানব ?

মহাপ্রভুর মুখে এবার ভাষা ফুটে। সাতদিন তিনি নীরবে সূত্রের ব্যাখ্যা শুনেছেন, এখন পণ্ডিতের দম্ভখর্বকারীরূপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ বেদান্ত সূত্রের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারি কিন্তু তোমার ভাষ্য শুনে মন বিকল হয়। ভাষ্য সূত্রের অর্থ পরিস্ফুট করবে কিন্তু তুমি যে ভাষ্য করছো তাতে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হয়। মুখ্য অর্থ বাদ দিয়ে গৌণ অর্থ কল্পনা কর ; মন-গড়া ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকৃত অর্থ ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছো। ব্যাসের মূল সূত্রের অর্থ সূর্যকিরণের মতো ঝলমল করে, তাতে দুর্বোধ্য কিছু নাই ; কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য কল্পিত অপ্রাকৃত অর্থযুক্ত ভাষ্যরূপ মেঘ দিয়ে প্রকৃত অর্থ ঢেকে ফেলেছেন।

ব্যাসের সূত্রের অর্থ—সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন ॥
... ... ...
সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥

পাহাড়ের চূড়ায় পুঞ্জীভূত তুষার অকস্মাৎ গলে পর্বতের গা বেয়ে পড়তে সুরু করলে যেমন নির্মল স্বচ্ছজলের প্রবাহ গর্জনশীল হয়ে ওঠে এবং জল-প্রপাতের সৃষ্টি করে, মহাপ্রভু-ও তেমনি মৌনতা ভঙ্গ ক'রে অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও যুক্তির প্রবাহ বইয়ে দিলেন। স্বপ্নভঙ্গের পর নির্ঝর যেন যত-কিছু বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন ক'রে প্রবলবেগে সব-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চললো। শঙ্কর-ভাষ্যে ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হয়েছে। মহাপ্রভু শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে এই মত খণ্ডন করেন, বলেন ঃ

অপাদান করণাধিকরণ—কারণ তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিন ॥

—যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে, যাঁর দ্বারা জগৎ প্রতিপালিত হচ্ছে এবং যাতে জগৎ লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তিনিই হলেন ব্রহ্ম। অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটি কারক ব্রহ্মের সাকারত্ব প্রমাণ করছে। কিন্তু এ সকল উপেক্ষা ক'রে তুমি ভগবানকে বল নিরাকার!

ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার'॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

বিবিধ শাস্ত্রপুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে প্রভু সার্বভৌমের ব্যাখ্যা ধূনকরের ধূননযন্ত্রের মুখে তূলার মতো ছিন্নভিন্ন ক'রে উড়িয়ে দেন। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত মননশক্তি কালবৈশাখীর অন্ধকার আকাশে তীব্র বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো ঝক্‌মক্ ক'রে ওঠে।

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস॥

ঈশ্বরের যে চিৎ-শক্তি থেকে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য প্রকটিত হয়েছে, এমন শক্তিকে তুমি স্বীকার কর না, তোমার তো খুব সাহস দেখছি!

সার্বভৌম নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য নানা বিতণ্ডা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন কিন্তু—

সব খণ্ডি প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল।

মহাপ্রভুর শাস্ত্রতর্কের স্রোতের মুখে সার্বভৌমের যুক্তি তৃণের মতো ভেসে গেল। তিনি বললেন: বেদে তিনটি বস্তুর বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সম্বন্ধ হলেন—ভগবান, অভিধেয় হ'ল—সাধন-ভক্তি এবং প্রয়োজন হ'ল—ভগবৎ-প্রেম।

ভগবান 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেম 'প্রয়োজন'—বেদে তিন বস্তু কয়॥

সার্বভৌমের বিদ্যার গর্ব খর্ব হয়েছে; বিস্ময়ে তাঁর মুখে আর কথা জোটে না, পুরুষকার স্তম্ভিত। হতবাক্ পণ্ডিতপ্রবরকে আশ্বস্ত করার জন্য—

প্রভু কহে ভট্টাচার্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয়॥

মহাপ্রভুর কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরের মতো উৎসারিত হয়ে উঠতে থাকে। তিনি বলেন: ঈশ্বরের শক্তি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। এই অচিন্ত্য শক্তির এমনি আকর্ষণ যে যাঁদের বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, দেহভোগ্য কোন বিষয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই, যাঁরা কেবল পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে সর্বাকর্ষণ-বিমুক্ত হয়েছেন, তাঁরাও ঈশ্বর-ভজন ক'রে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ॥

—ভগবান শ্রীহরির এমনি চিত্তাকর্ষণকারী গুণ যে, মায়াবন্ধনশূন্য আত্মারাম মুনিগণ পর্যন্ত এই অমিতবিক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি ক'রে থাকেন।

সার্বভৌমের মনের আকাশ থেকে শুষ্ক তর্কের ধূলিজাল অপসারিত হয়েছে। আত্ম-প্রাধান্য ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যে গর্ববোধ ছিল তা-ও দূর হয়েছে। গুরুর আসন ছেড়ে তিনি শিষ্যের স্থান গ্রহণ করেছেন। মহাপ্রভুর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শুনে বলেন: এই শ্লোকের অর্থ শুনতে বাঞ্ছা হয়।

প্রভু বলেন: আগে তুমি এর অর্থ কর; পাছে আমি যা জানি সেভাবে ব্যাখ্যা করবো।

সার্বভৌম পণ্ডিত। প্রভু তাঁর মান রেখেছেন, তিনি মনে মনে খুশি হন। নিজের শাস্ত্রবুদ্ধি ও সামর্থ্যানুসারে তিনি এই শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করেন।

মহাপ্রভু মৃদু হাসিতে সার্বভৌমকে অভিনন্দিত করেন, বলেন: বিদ্যায় তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এমন শাস্ত্রব্যাখ্যা আর কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় তুমি যে অর্থ করেছ এ ছাড়া এ শ্লোকের আরো গূঢ় অর্থ আছে।

তারপর তিনি শ্লোকের এগারটি পদের পৃথক পৃথক অর্থ ক'রে 'আত্মারাম' শব্দের সঙ্গে যোগ ক'রে ঐ শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করলেন; সার্বভৌম যে নয় রকম অর্থ করেছিলেন তার একটি-ও স্পর্শ করলেন না। নূতন, প্রাণস্পর্শী, অপূর্ব ভাবময় ব্যাখ্যা। এর ভিতর দিয়ে মহাপ্রভুর অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠলো যা মানুষে সম্ভবে না। সার্বভৌম এবার পরিপূর্ণ মাত্রায় দ্রব হয়েছেন। মনের গর্বিত ভাবের জন্য তাঁর অনুশোচনা জেগেছে। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তিনি হন মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী।

শুনি·ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥
ইহা ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া ।
মহা অপরাধ কৈনু গর্বিত হইয়া ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত

সার্বভৌম আত্ম-নিন্দা ক'রে প্রভুর শরণ নিলেন এবং তিনি-ও কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে স্বকীয় রূপ দেখালেন।

দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি ॥

সার্বভৌম এখন আর শুষ্ক জ্ঞানমার্গের তার্কিক নন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে তিনি শ্লোক রচনা ক'রে মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সার্ব-ভৌমের পরিবর্তনে আনন্দিত হয়ে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করেন; সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমাবেশে ভট্টাচার্য অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর দেহে দেখা দেয় সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ।

অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ-ধরি ॥

সার্বভৌমের রূপান্তর দেখে ভক্তগণ হর্ষোৎফুল্ল। যিনি জ্ঞান ও শাস্ত্রতর্কের শক্তিতে মহাপ্রভুকে সংশোধিত ক'রে নিজের মতে আনার কল্পনা করেছিলেন, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ যিনি ধ্রুব সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠায় যিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, তিনি আজ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী, ভক্তিতে বিগলিত; ঈশ্বরের ঐশ্বর্যময় স্বরূপ-প্রকাশ দেখেন নবীন সন্ন্যাসীর মধ্যে। ভাবের ও আচরণের দিক দিয়ে সার্বভৌমের হয়েছে নবজন্ম। মহাপ্রভুকে স্তুতি ক'রে বলেন:

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলা তুমি—এ শক্তি প্রচণ্ড ॥

* * * *

আর একদিনের ঘটনা। প্রভাতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শনে গিয়েছেন। জগন্নাথের শয্যোত্থান হওয়ার পর পূজারী মালা এবং প্রসাদান্ন এনে দিলেন মহাপ্রভুর হাতে। তিনি তা বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে সার্বভৌমের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। সার্বভৌম 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরে এসেই মহাপ্রভুকে

দেখে আস্তেব্যস্তে এসে তাঁর চরণ-বন্দনা করলেন। তারপর উভয়ে যখন আসন গ্রহণ করলেন, মহাপ্রভু প্রসাদান্ন আঁচল থেকে খুলে সার্বভৌমের হাতে দিলেন। সার্বভৌম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন কিছুই করেননি, এ অবস্থায় কোন কিছু ভক্ষণ করার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর অন্তরের ভক্তিভাব এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছে যে, বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে আনন্দিত মনে তিনি সেই প্রসাদান্ন তখনই ভক্ষণ করলেন।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুইজনে ধরি দোঁহে করেন নর্তন।
প্রভুভৃত্য দোঁহাস্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥

ভক্তিবিহীন তার্কিক-চূড়ামণি সার্বভৌমের ভক্তিবিগলিত ভাব ও প্রেমাবেশে নৃত্য দেখে তাঁর শিষ্যদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। গৌরাঙ্গ-অনুরাগী-জন আনন্দিত হন যেমন সবাই হয়েছিলেন জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের সময়। সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য আনন্দে 'হরি হরি' ব'লে হাততালি দিয়ে নাচেন। সার্বভৌমের মনে বৈষ্ণব ভাবের সঞ্চার হয়েছে, গৌরাঙ্গ-ভক্তি জন্মেছে—এতেই তাঁর আনন্দ।

আর একদিন জগন্নাথ-দর্শনের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে মন্দিরে না গিয়ে উপস্থিত হলেন মহাপ্রভুর সকাশে। প্রভুকে দণ্ডবৎ ক'রে ভক্তি-লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ সাধন কি, তা জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

প্রভু উপদেশ দিলেনঃ নাম-সংকীর্তন করো। কলিকালে হরিনাম-ই একমাত্র গতি।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

মহাপ্রভুর উপদেশ ও আলিঙ্গন লাভে ধন্য হয়ে সার্বভৌম জগন্নাথ দর্শন ক'রে জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের বিদায় দেবার সময় তালপত্রে দুইটি শ্লোক লিখে 'প্রভুকে দিও' ব'লে প্রেমিক ভক্ত জগদানন্দের হাতে দিলেন। মহাপ্রভুর আবাসস্থলে এলে মুকুন্দ তালপত্রখানা নিয়ে শ্লোক দুটি দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখলেন। মহাপ্রভুকে শ্লোকসমেত পত্রখানা দেওয়া হ'লে তিনি পাঠ ক'রে তখনি ছিঁড়ে ফেললেন। শ্লোক

দুটিতে সার্বভৌম তাঁর অন্তরের আকুতি প্রকাশ করেছেন; শ্লোক দুটি ভক্তকণ্ঠে মণিহার।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ-পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

—যে কৃপাময় আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জগতে বৈরাগ্যাচরণ ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণাগত হই।

—কালপ্রভাবে ধ্বংসোন্মুখ নিজভক্তিযোগ জগতে প্রচার করার জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর পাদপদ্মে আমার চিত্তরূপ ভ্রমর গাঢ়রূপে আসক্ত হোক্।

সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সার্বভৌম প্রথমে মহাপ্রভুকে সাধারণ একজন মানুষ-জ্ঞানে তাঁর প্রতি যে ভাব পোষণ করেছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই তা তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেল। তিনি মহাপ্রভুকে 'পুরুষ-পুরাণ' ব'লে স্তুতি জানালেন এবং তাঁকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা ব'লে গ্রহণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥ —চৈতন্য চরিতামৃত

সার্বভৌম-বিজয়ের খবর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলে এই সিদ্ধান্ত করে যে, মহাপ্রভু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। লোহাকে স্পর্শ ক'রে যখন সোনায় পরিণত করে তখনই স্পর্শমণি চেনা যায়; তার আগে তাকে সাধারণ পাথরখণ্ড ব'লেই মনে হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্য এমনি স্পর্শমণি।

## রামানন্দ মিলন

মাঘ মাসের শুক্লা তিথিতে নিমাই গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন। ফাল্গুন মাসে আসেন নীলাচলে, সেখানে শ্রীজগন্নাথের দোল-উৎসব দর্শন করেন। চৈত্র মাস অতিবাহিত হয় সার্বভৌমের সাহচর্যে; অদ্বৈতবাদী তার্কিক পণ্ডিত হন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর আত্মসমর্পণকারী ভক্ত। চৈতন্য হন তাঁর নিত্যপূজ্য উপাস্য দেবতা, তাঁর প্রিয় প্রাণের ঠাকুর।

বৈশাখের প্রথমদিকে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভক্তগণ তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হ'বেন এই ভেবে হন শোকাকুল। সার্বভৌমের কাছে প্রভুর বিচ্ছেদ দুর্বহ। তিনি বলেন:

বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমা-সঙ্গ।<br>
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥<br>
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।<br>
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥

নবীন প্রেমের উন্মাদনা সার্বভৌমের মনে। গৌরাঙ্গের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁর অনুগামী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু প্রবোধ বাক্যে তিনি সকলকে নিরস্ত করেন। নিত্যানন্দ দক্ষিণের তীর্থপথ সব চেনেন। তিনি সঙ্গী হ'তে চান কিন্তু প্রভু সঙ্গী নিতে নারাজ।

অবশেষে নিত্যানন্দ বলেন: দক্ষিণ-যাত্রায় তুমি অনেক দূর যাবে। কৌপীন, বহির্বাস. জলপাত্র—এ-সব কে বহন করবে? তোমার দুই হাত তো নাম গণনায় বদ্ধ থাকবে। আমাদের প্রার্থনা—ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস সঙ্গে যাক্; যখন যা বলবে পবিত্র হয়ে বিপ্র তাই করবে।

ঈষৎ হেসে প্রভু বলেন: কোন প্রয়োজন হবে না।

সবাই অনুনয় করতে থাকেন: প্রভু অনুমতি করো, অন্ততঃ একজন সঙ্গে থাকুক; গোবিন্দকে সঙ্গে যাবার অনুমতি দাও।

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।<br>
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি॥

যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য তাহা গোবিন্দ করিবে॥

—গোবিন্দদাসের করচা

বৈশাখের সপ্তম দিবসে প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাত্রা করলেন, সঙ্গে চললেন অনুরাগী ভক্তগণ। সেদিন তাঁরা আলালনাথের শ্রীমন্দির দর্শন ক'রে সেখানেই অবস্থান করেন। বহুলোক সমবেত হয় প্রভুর দর্শনের জন্য ; 'হরি হরি' ব'লে কোলাহল করে ; আনন্দে নাচে গায়। সারারাত্রি মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে যাপন করলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রার সময়। প্রভু স্নান ক'রে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। ভক্তদের একে একে আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় দিলেন, তাঁরা মূর্ছিত হয়ে পড়েন ভূমিতে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে প্রেমাবেশে নাম-সংকীর্তন করতে করতে মত্ত সিংহের মতো ধেয়ে চললেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে মধুর কৃষ্ণনাম :

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণে চলেছেন ; ভাবে বিভোর। কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন। মুখে অবিরত কৃষ্ণনাম, চোখে বয় পুলকাশ্রুধারা। পথে যে দেখে প্রভুর প্রেমবিহ্বল অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, সেই মুগ্ধ হয়। লোক দেখে প্রভু বলেন : বল 'হরি হরি'। প্রেমে মত্ত হয়ে তারা হরি কৃষ্ণ ব'লে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। প্রভুকে দর্শন ক'রে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়। পরে প্রভু তাদের আলিঙ্গন দিয়ে তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে বিদায় দেন। তারা গ্রামে গিয়ে 'কৃষ্ণ' ব'লে নাচে কাঁদে হাসে গায় অনুক্ষণ। এমনি চলে কৃষ্ণভক্তি ও প্রেম বিতরণের পালা।

বিদায়ের পূর্বে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে গোদাবরী-তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হ'তে অনুরোধ করেছেন। রামানন্দ রসজ্ঞ ভক্ত। কৃষ্ণনামে তাঁর নয়ন হয় অশ্রুসিক্ত।

বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রাম রায় করে।
হরিনামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে॥

কৃষ্ণপ্রেমিক রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলনের জন্য মহাপ্রভু ব্যাকুল হয়ে চলতে থাকেন। কণ্ঠে সর্বদা কৃষ্ণকেশব শ্লোক।

আলালনাথ ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু কূর্মক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে কূর্মাবতার শ্রীবরাহদেবের বিগ্রহ আছে। সেখানে প্রভু আনন্দে নৃত্যগীত ক'রে পরদিন দক্ষিণদিক অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন, দর্শকজন তাঁর নামগানে আকৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। প্রবোধ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে প্রভু আবার বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণকেশব শ্লোক গাইতে গাইতে চলেন। ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করার পর তিনি ফিরে দাঁড়ান, কে যেন তাঁকে পিছন পানে আকর্ষণ করে। দাঁড়িয়ে কী যেন শুনলেন তিনি, তারপর বললেন : এই যে আমি আসছি। ব'লেই ফিরে চললেন কূর্মক্ষেত্রের দিকে। কার আহ্বানে প্রভু সাড়া দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন?

বাসুদেব নামে একজন কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ। পরম ভক্ত বৈষ্ণব। লোকমুখে প্রভুর অসাধারণ রূপ আর অলৌকিক প্রেম-বিহ্বলতার কথা শুনে তিনি অতি কষ্টে কূর্মস্থানে এসে পৌঁছেন। সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো এক জানুতে ভর দিয়ে প্রাণের আবেগে তিনি চলতে থাকেন ঠাকুরকে দর্শনের উদ্দেশ্যে। অপর লোকে তাঁর সঙ্গ পরিহার ক'রে চলে, অঙ্গে তাঁর দুর্গন্ধ। কিন্তু পরমবিনয়ী, কৃষ্ণপ্রেমিক বাসুদেব। গায়ের পচা ঘা থেকে পোকা বেরিয়ে গেলে তিনি সেটি যত্ন ক'রে তুলে আবার গলিত ঘায়ের মধ্যে রেখে দেন। ঐগুলিই তাঁর সঙ্গী। মানুষ যখন তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে, কীড়াগুলি তো করেনি!

বাসুদেব অতিকষ্টে কূর্মক্ষেত্রে পৌঁছে শুনলেন, প্রভু সে-স্থান ছেড়ে চলে গেছেন। তখন তাঁর বুক-ভাঙা আকুল ক্রন্দন—হায় প্রভুর দেখা পেলাম না। হায় হতভাগ্য আমি।

নিরাশায় বাসুদেব অচেতন হয়ে পড়েন।

ভক্তের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরে আসেন ভক্তবৎসল প্রভু। ধূলায় লুণ্ঠিত অচেতন বাসুদেবকে তুলে প্রেমভরে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার ঘটে ; বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠব্যাধি অন্তর্হিত হয় ; তিনি ফিরে পান কান্তিপুষ্ট দেহ।

কৃপাধন্য বাসুদেব আনন্দে ক্রন্দন করতে থাকেন : দয়াময়, তোমার কাছে ধনী-নির্ধন, পবিত্র-অপবিত্র সবাই সমান। আমার এই দুর্গন্ধময় ক্লেদযুক্ত অস্পৃশ্য অপবিত্র শরীর তুমি কেমন ক'রে আলিঙ্গন করলে!

পরমুহূর্তে তাঁর মনে দুঃখ জেগে ওঠে, বলেন : ভগবান, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে সকলের কাছে অস্পৃশ্য হীন হয়ে ছিলাম, তাই তোমার কৃপা পেয়েছি; এখন দেহ সুন্দর হ'ল তাই যদি অভিমানপূর্ণ হয়ে তোমাকে হারাই তবে আমার কুষ্ঠই ভালো।

মহাপ্রভু বাসুদেবকে আশ্বাস দেন : তুমি পরম ভক্ত, তুমি যদি অভিমানে মত্ত হও, তবে কৃষ্ণ-ভজন করবে কে? কোন দ্বিধা ক'রো না; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ক'রো আর লোককে ভক্তি-ধর্ম শিখাও।

ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রে প্রভু আবার যাত্রা সুরু করেন।

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে পথ চ'লে মহাপ্রভু গোদাবরী-তীরে এসে উপনীত হলেন। প্রসন্নসলিলা গোদাবরী বিপুল জলরাশি নিয়ে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। নদী পার হয়ে প্রভু স্নান সমাপন করলেন, তারপর জপমালা হাতে নিয়ে নদীতীরে বসে জপ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাদ্যভাণ্ডসহকারে হাতীঘোড়া অনুচরবৃন্দ নিয়ে দোলায় চ'ড়ে রামানন্দ রায় এলেন গোদাবরীতে স্নান তর্পণ করতে। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীন বিদ্যানগরীর অধিকারী তিনি। রাজকার্যে নিযুক্ত; রাজোচিত মর্যাদা। বিলাসের জীবন। সেবার জন্য বহু ভৃত্য সদা প্রস্তুত, চতুর্দোলা কিংবা হাতীঘোড়া ভিন্ন পথ চলেন না, শয়নের জন্য দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা। কিন্তু রামানন্দ রাজর্ষি জনকের মতো স্থিতধী যোগী। পদ্মপত্রের মতো বিলাস-সায়রে থাকলেও তাতে মগ্ন নন। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মন তাঁর সর্বদা পরিপূর্ণ, বিষয়-পঙ্কে কলুষিত নয়।

স্নান-তর্পণ-পূজা সমাপন ক'রে রামানন্দ উঠে এলেন তীরে প্রভুর দিকে। সন্ন্যাসীর অপূর্বসুন্দর জ্যোতির্ময় আকৃতি দেখে রামানন্দ আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর শিরে আপিঙ্গল জটাভার, বদনমণ্ডল প্রশান্ত দ্যুতিতে উদ্ভাসিত।

রামানন্দ নিকটে এসে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু উপবিষ্ট ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল।

—তুমি কি রামানন্দ? প্রভু প্রশ্ন করেন।

—হাঁ প্রভু, আমি সেই পাপাধম শূদ্রজাতীয় রামানন্দ।

দুই বাহু প্রসারিত ক'রে সাগ্রহে প্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রেমাবেশে উভয়েই অচেতন হয়ে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়লেন। রামানন্দের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা বিস্মিত হয়ে আলোচনা করেন—এই ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন সন্ন্যাসী শূদ্রকে আলিঙ্গন ক'রে এমন আকুল হন কেন? পরমবিজ্ঞ গম্ভীর রামানন্দ রায়-ই বা সন্ন্যাসীকে স্পর্শ ক'রে এমন মত্ত হলেন কেন?

কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ ক'রে উভয়েই উঠে বসেন। উভয়ের দেহ প্রেমপুলক-কণ্টকিত।

মহাপ্রভু বলেন: রায়, তুমি কৃষ্ণপ্রেমের রসসাগর। তোমার দর্শনেই ভক্তিলাভ হয়। সার্বভৌম তোমার কথা আমায় বলেছেন। তাঁর নির্দেশে তোমার সঙ্গলাভের জন্যই আমার হেথা আগমন।

রামানন্দ বিনয় ক'রে বলেন: আমার ওপর সার্বভৌমের কৃপা অপরিসীম, তাই আমার উদ্ধারের জন্য তোমায় এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন।

এমনিভাবে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময় এক ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ ক'রে নিয়ে যান। গৌরাঙ্গ ও রামানন্দ উভয়ে উভয়ের অন্তর চিনেছেন, তাঁরা যেন কতকালের অন্তরঙ্গ। ক্ষণেকের জন্য সঙ্গচ্যুত হ'তেও উভয়ের মন ব্যথায় ভরে যায়।

ঈষৎ হেসে প্রভু রামানন্দকে বলেন: তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনতে বাসনা। আবার যেন দর্শন পাই।

রায় বলেন: প্রভু, এই পামরকে শোধন করতে এসেছ; দর্শনমাত্রে আমার দুষ্ট-চিত্ত তো শুদ্ধ হ'ল না। দিন পাঁচ-সাত এখানে থেকে মার্জন ক'রে আমার কলুষিত মন পরিশুদ্ধ ক'রে দাও এই প্রার্থনা।

রামানন্দ দণ্ডবৎ ক'রে নিজের কর্মস্থানে ফিরে যান, প্রভু যান নিমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণের গৃহে। কিন্তু উভয়ে উভয়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত। সন্ধ্যাকালে স্নানকৃত্য ক'রে প্রভু বসে আছেন ব্রাহ্মণের গৃহে, এমন সময়ে ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে রামানন্দ এসে প্রভুকে নমস্কার করলেন; আনন্দে গৌরাঙ্গ তাঁকে দিলেন আলিঙ্গন। তারপর দুজনে নির্জনে বসে কৃষ্ণকথায় নিমগ্ন হলেন।

রামানন্দ রায় রসজ্ঞ ভক্ত। যেমন গভীর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি নিবিড় প্রেম-ভক্তি; তাঁর অন্তর যেন জ্ঞানভক্তির মধুচক্র। সানুরাগ প্রশ্ন ও আলোচনার ভিতর দিয়ে মহাপ্রভু এই মধু নিংড়ে পান করেন। গৌরাঙ্গ-রামানন্দের ভক্তিরস বিশ্লেষণ মধুর অমৃতোপম। দামোদর-স্বরূপের করচা অবলম্বনে চৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী এই তত্ত্ব-সমৃদ্ধ আলোচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

* * * *

মহাপ্রভু রায়কে প্রশ্ন করেন : জীবের সাধনার বস্তু কি সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণসহ বল।

রায় বলেন : স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য।

বিষ্ণুভক্তিই জীবের সাধনার বস্তু। বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালন দ্বারা বিষ্ণুভক্তিরূপ সাধ্যবস্তু লাভ হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ ব্যতীত বিষ্ণু অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

এখানে রামানন্দ যে ধরনের বিষ্ণুভক্তির কথা বলেছেন তা সামান্যতঃ বিষ্ণুপ্রীতি-বিষয়ক ভক্তি, বিষ্ণুর চরণ-লাভোপযোগী ভক্তি নয়। এ অতি সাধারণ স্তরের ভক্তির কথা। মহাপ্রভু এতে সন্তুষ্ট নন।

প্রভু বলেন : এহ বাহ্য, আগে কহ আর। এ তো বাইরের কথা, এর চেয়ে ভালো কি তাই বল।

রামানন্দ : কৃষ্ণে কর্মার্পণ শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন, তুমি যা কিছু করবে—ভোজন কর, হোম কর, দান কর, তপস্যা কর—যে-কোন কর্মই কর না কেন সমস্তই আমাতে অর্পণ ক'রো।

দৈহিক কর্ম, লৌকিক কর্ম—কি সৎ কি অসৎ সব রকম কর্মই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণের কথা বলা হয়েছে। সৎ কর্মের ফল কৃষ্ণে সমর্পণ করতে সঙ্কোচ আসবে না কিন্তু অসৎ কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করতে গেলেই মনে হবে—একি ভগবানকে দেওয়ার যোগ্য! যাবতীয় কর্মের ফলই যখন কৃষ্ণে সমর্পণ করা হয় তখন অসৎ কর্ম যাতে না হয় সেদিকে আগ্রহ জন্মে, অসৎ কর্মের প্রবৃত্তি লোপ পায় ধীরে ধীরে।

কৃষ্ণে কর্মার্পণ হ'ল নিষ্কাম ধর্ম, আর বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণ সকাম কর্ম। তাই বর্ণাশ্রমধর্মের চেয়ে এ শ্রেষ্ঠ কিন্তু কৃষ্ণে কর্মার্পণ দ্বারা কর্ম-

বন্ধন-রহিত হয়ে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হ'লেও কৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ হয় না। তাই মহাপ্রভু এর চেয়ে উচ্চস্তরের সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাপ্রভু: এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

রামানন্দ: স্বধর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব, বেদাদিশাস্ত্রে যা যা আদিষ্ট হয়েছে সে সকলের দোষগুণ অবগত হয়ে স্বীয় বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে যে আমার ভজন করে, সে ব্যক্তি উত্তম সাধু-মধ্যে গণ্য হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন, বেদধর্ম, দেহধর্ম, লোকধর্ম, কুলধর্ম প্রভৃতি সর্ববিধ ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে উদ্ধার করবো; তুমি কোনরূপে শোক ক'রো না।

কিন্তু কেবল স্বধর্ম ত্যাগ করলেই কৃষ্ণপ্রেম সহজসাধ্য হয় না। তাই মহাপ্রভু এতেই খুশি নন। আরো উচ্চস্তরের কথা জানতে ইচ্ছুক হলেন।

মহাপ্রভু বললেন: এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

রামানন্দ: জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—হে অর্জুন, ব্রহ্মে অবস্থিত, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব'লে প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না বা কোন বস্তু-প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এরূপ ব্যক্তি সর্বজীবে সমদৃষ্ট হয়ে আমাতে পরম ভক্তিলাভ ক'রে থাকেন।

কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিজ্ঞান অনুশীলনের ফলস্বরূপ, কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক বা অহৈতুকী প্রীতিজনিত নয়। তাই মহাপ্রভু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না, এর চেয়েও ভালো কথা কি তাই জানতে উৎসুক হলেন।

মহাপ্রভু: এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

রামানন্দ বলেন: জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।

ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে ভগবান, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস না ক'রে স্বস্থানে বা সাধুস্থানে অবস্থানপূর্বক তাঁদের মুখ-নিঃসৃত এবং স্বতঃই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার কথা কায়মনো-বাক্যে সমাদর ক'রে জীবনধারণ করেন, অন্যের পক্ষে অজিত হ'লেও তুমি তাঁদের কাছে বশীভূত হয়ে থাক।

জ্ঞানশূন্যা কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তনাদির অনুষ্ঠানময়। এতে প্রেম গাঢ়

নয়, শিথিল। এর দ্বারা মন কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ব্রজপ্রেম-সেবা-লাভের উপযোগী হয় না। এরূপ ভক্তি মহাপ্রভু অনুমোদন করলেন বটে কিন্তু পূর্ণরূপে তুষ্ট হ'তে পারলেন না। এর চেয়েও ভালো কি জানতে চাইলেন।

মহাপ্রভু : এহ হয়, আগে কহ আর।

রামানন্দ : প্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু; সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রেমভক্তি দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।

রামানন্দ রায় নিজের এক শ্লোকে বলেছেন—হে ভক্ত, বিবিধ উপচার দিয়ে পূজা না করলেও কেবল প্রেমেই দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হয়ে যায়। যেমন প্রবল ক্ষুধা না থাকলে অন্নজল উদরের পক্ষে সুখের হয় না, তেমনি প্রেম না থাকলে পূজা-উপচার শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুখের হয় না ব'লে তিনি বিগলিত হন না।

আর একটি শ্লোকে রামানন্দ বলেছেন :

কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

অর্থাৎ সৎসঙ্গাদির ফলে কৃষ্ণপ্রেমময় মতি যদি কোথাও কিনতে পাওয়া যায়, তবে তা ক্রয় ক'রো। এই ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে লালসাই একমাত্র; লালসা না হ'লে ভক্তিরসময় মতি লাভ করা যায় না। ইহাও নিশ্চয় যে, কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও এই লালসা লাভ করা যায় না।

* * * *

যাগ, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি সকলবিধ কর্ম এবং সর্ববিধ বাসনা পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে নিরতিশয় মমতাপন্ন হয়ে নিষ্কামভাবে ভজনে যে সুনির্মল প্রবল অনুরাগ, তাই হ'ল প্রেমভক্তি। শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এ হ'ল ভক্তিভাবের শান্তরতিময় সর্বনিম্ন স্তর। এরূপ অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানে না, আর কিছু চায় না।

প্রেমভক্তি দ্বারাই কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভবপর এ-কথা মহাপ্রভু স্বীকার করলেন। কিন্তু এই প্রেমভক্তি ও সেবার মধ্যে-ও তারতম্য আছে।

তাই প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তর জানার জন্য মহাপ্রভু রামানন্দকে অনুরোধ জানালেন।

মহাপ্রভু বললেন : এহ হয়, আগে কহ আর।

রামানন্দ বলেন : দাস্যপ্রেমের সাধনা দ্বারাই সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হয়ে থাকে।

ভাগবতে দুর্বাসা ঋষি মহারাজ অম্বরীষকে বলছেন—হে মহারাজ, যাঁর নাম শ্রবণমাত্র জীব মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসগণের অলভ্য কী থাকতে পারে? অর্থাৎ তাঁরা সবই পেতে পারেন।

দাস্যপ্রেম দ্বারা ব্রজসেবা লাভ হয় ব'লে মহাপ্রভু তা সাদরে গ্রহণ করলেন কিন্তু দাস্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের কেবল প্রভু-ভৃত্য-ভাবই বিদ্যমান; এতে তাঁকে নিজের সঙ্গে সমান বোধ করতে বা তাঁর প্রতি সমানভাবে ব্যবহার করতে সঙ্কোচ হয়। এর চেয়ে অধিক প্রীতির সম্বন্ধ কী জানার জন্য মহাপ্রভু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মহাপ্রভু বললেন : এহ হয়, আগে কহ আর।

রামানন্দ বলেন : সখ্যপ্রেমের দ্বারাই সাধনার শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করা যায়।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলছেন—হে মহারাজ, যিনি জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভব-রূপে, দাস্যপ্রেমময় ভক্তগণের নিকট পরমারাধ্যদেব-রূপে এবং মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট সামান্য মানবশিশু-রূপে প্রতীয়মান হন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালকগণ বহু সুকৃতির ফলে সখ্যভাবে বিহার করেছিলেন।

সখ্যপ্রেম দাস্যপ্রেম অপেক্ষা অধিক প্রীতিময়; এতে কৃষ্ণের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহারের অধিকার হয় যা দাস্যপ্রেমে হয় না। সখ্যপ্রেম মহাপ্রভু সমাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু এর চেয়েও উত্তম কী জানার জন্য প্রশ্ন করলেন।

মহাপ্রভু বলেন : এহোত্তম, আগে কহ আর।

রামানন্দ বলেন : বাৎসল্যপ্রেম দ্বারা সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হয়।

ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মণ, আপনি বলুন, মহারাজ নন্দ এমন কী পুণ্য কাজ করেছিলেন যার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কী পুণ্য করেছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তন পান করলেন?

ভাগবতের আর এক শ্লোকে আছে : শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে মহারাজ, মুক্তিদানকারী কৃষ্ণের কাছ থেকে যশোদা-গোপী যে প্রসাদ পেয়েছেন, তা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র হয়েও, মহেশ্বর তাঁর স্বরূপ হয়েও এবং লক্ষ্মী তাঁর ভার্যা হয়েও লাভ করতে পারেননি।

বাৎসল্যপ্রেমে কৃষ্ণে পুত্রবৎ স্নেহ সঞ্চার হয় যা সখ্যপ্রেম যা দাস্যপ্রেম দিয়ে হয় না; অথচ এতে বন্ধুর ন্যায় এবং দাসের ন্যায় সেবা করাও চলে। সুতরাং বাৎসল্যপ্রেম যে সখ্যপ্রেম থেকে শ্রেষ্ঠ তা মহাপ্রভু স্বীকার ক'রে এর প্রতি সমাদর প্রকাশ করলেন কিন্তু এর চেয়েও ভালো কী জানতে আবার প্রশ্ন করলেন।

মহাপ্রভু বলেন : এহোত্তম, আগে কহ আর।

রামানন্দ বলেন : মিলনরসাত্মক কান্তাপ্রেম হ'ল সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ভাগবতে বলা হয়েছে—রাসোৎসবে ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠদেশ কৃষ্ণের বাহু দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তাঁরা পূর্ণ-মনোরথ হয়েছিলেন ব'লে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, সে প্রসাদ বক্ষঃস্থলস্থিতা পরম অনুরাগিণী লক্ষ্মীদেবীও পাননি কিংবা স্বর্গের অপ্সরা ও দেবপত্নীগণও পাননি; অন্য রমণীগণের কথা আর কি বলবো ?

কান্তাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বল্লভ ব'লে গ্রহণ করে। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তাঁদের প্রিয়তমের সন্তোষের জন্য নিজের দেহ পর্যন্ত অর্পণ করেন কিন্তু এতে তাঁদের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র নাই। এই মধুর-রসাশ্রয়ে কৃষ্ণকে দাসের ন্যায় সেবা করা চলে, তাঁর প্রতি সখার ন্যায় ব্যবহার ও সেবা করা চলে, পিতামাতা সন্তানের যেমন সেবা-যত্ন করেন সেভাবে সেবা করাও চলে, আবার কৃষ্ণ-সুখের জন্য আত্মদেহ পর্যন্ত দান ক'রে তাঁর সেবা করা চলে যা শান্ত, দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্য কোন প্রেমেই হয় না। সুতরাং একমাত্র মধুর-প্রেমেই সমস্ত প্রেমরসের আস্বাদন হয় ব'লে কান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাপ্রভু এ অভিমত গ্রহণ করলেন, এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করলেন না।

রসরাজ রামানন্দ পেয়েছেন রসগ্রাহী বিচারক-শ্রোতা। ভক্তিরস তত্ত্বের গভীর এবং নিপুণ বিশ্লেষণ করতে থাকেন। বলেন : কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে অনেক প্রকার সাধনার নির্দেশ আছে; কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের পার্থক্য-ও অনেক রকম। সাধনার ভাব অনুসারে কেউ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপ, কেউ বা

মাধুর্যময় স্বরূপ লাভ ক'রে থাকেন। এই ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় স্বরূপেরও আবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় স্বরূপ-ই সর্বোত্তম। কৃষ্ণ প্রেমের বশ। কৃষ্ণের মাধুর্যময় স্বরূপ লাভ কেবল মধুর-রসাত্মক কান্তাপ্রেমের দ্বারাই সম্ভব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ রস মধুর বা কান্তাপ্রেমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তবে কৃষ্ণ প্রেমাধীন, ভক্তবৎসল। যে যেভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করে সে তাঁকে সেই ভাবেই পায়।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ আলোচনা ক'রে রামানন্দ বলেন—যদিও কৃষ্ণ-সৌন্দর্য নিখিল-মাধুর্যে পরিপূর্ণ এবং তাতে আর কিছু যোগ করার নাই, তথাপি ব্রজদেবীগণের এমনি অপূর্ব কৃষ্ণপ্রীতি যে, তাঁদের সঙ্গগুণে কৃষ্ণের মাধুর্য আপনিই বেড়ে যায়। ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন—হে মহারাজ, মালার আকারে গ্রথিত স্বর্ণবর্ণ মণিসমূহের মধ্যবর্তী নীলকান্তমণি যেমন পরম শোভা পায়, তেমনি রাসমণ্ডলে নবজলধরশ্যাম ভগবান দেবকীনন্দনও কাঞ্চন-বর্ণা গোপীগণের পরস্পরের মধ্যবর্তী হয়ে পরম মনোহর রূপে বিরাজ করতে লাগলেন।

আলোচনা শুনে প্রফুল্লিত মনে মহাপ্রভু বলেন: সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য কি তা তোমার কাছে শোনা গেল। এর চেয়ে যদি আরও ভালো কিছু থাকে তবে তা আমাকে বল।

রামানন্দ উত্তর করেন: যত প্রকারের সাধনা হ'তে পারে তার মধ্যে কান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ; কান্তাপ্রেমের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেমই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এমনিভাবে দশদিন ধ'রে উভয়ের মধ্যে সাধন-ভক্তি ও কৃষ্ণকথার আলোচনা চলে। রামানন্দ বিশ্লেষণ করেন, মহাপ্রভু তার সুধা পান করেন। শ্রীরাধার রূপগুণ, তাঁর প্রেমের নিবিড়তা, তাঁর অভিমান, তাঁর প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, উভয়ের মিলন-মাধুর্য, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব—এ-সবের রসময় আলোচনা শোনান রসবেত্তা রামানন্দ। কান্তাভাবে সাধনায় নায়ক-নায়িকার মিলনের চরম আনন্দময় অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে রামানন্দ বলেন—তখন তাঁদের মধ্যে আর ভেদজ্ঞান থাকে না; তখন পুরুষ বুঝতে পারেন না যে তিনি পুরুষ এবং রমণীও বুঝতে পারেন না যে তিনি রমণী, তখন তাঁরা পরস্পরে এক হয়ে যান এবং তাঁদের চিত্তে আর পুরুষ-

রমণীগত পার্থক্যের অনুভূতি থাকে না। এই ভাবকে বলা হয়েছে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। রামানন্দ এই ভাব নিয়ে লিখিত স্বরচিত গানটি গেয়ে শোনান :

পহিল হিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ; না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি॥

গান শুনেই প্রেমভরে মহাপ্রভু হাত দিয়ে রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। ভাব এই যে—এইবার আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে, আর কিছু বলতে হবে না, এর পর আর কিছু নাই।

তারপর মহাপ্রভু বলেন : রায়, তোমার প্রসাদে সাধ্যবস্তু যে কি তা নিশ্চিতভাবে জানতে পেলাম কিন্তু সাধন বিনা তো সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না। এখন আমার প্রতি কৃপা ক'রে কৃষ্ণকে পাওয়ার উপায় কী তাই বল।

রামানন্দ বলেন :

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

অতঃপর রামানন্দ কৃষ্ণলীলার রসঘন আলোচনা ক'রে মহাপ্রভুকে পরিতৃপ্ত করেন। এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় রামানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান, গভীর কৃষ্ণভক্তি ও গৌরাঙ্গের প্রতি নিবিড় অনুরাগ। দশ রাত্রি রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে অতিবাহিত ক'রে মহাপ্রভু বিদায় নিয়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে রামানন্দকে বললেন : বিষয় ছেড়ে তুমি নীলাচলে যাও; অল্প-কালের মধ্যে আমি তীর্থ ক'রে সেখানে ফিরে আসব। তারপর দুজনে এক সঙ্গে নীলাচলে থাকব আর কৃষ্ণকথা আলোচনায় সুখে কাল কাটাব।

প্রেমালিঙ্গনে ধন্য হয়ে রামানন্দ ফিরে যান তাঁর কর্মস্থলে। মহাপ্রভু পরদিন প্রভাতে আবার দক্ষিণ-সফর সুরু করেন, কণ্ঠে তাঁর সেই চিত্তাকর্ষণ-কারী মধুর কৃষ্ণনাম-কীর্তন।

## দক্ষিণ সফর

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি-রস আস্বাদন ক'রে মহাপ্রভু পরম তৃপ্তিলাভ করেছেন। নীলাচলে ফিরে আবার রায়ের সঙ্গে মিলিত হবেন এই আশা রয়েছে মনে। রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ-অভিমুখে চলতে চলতে তিনি ত্রিমন্দনগরে এসে উপনীত হলেন। এখানে বহু বৌদ্ধের বাস।

রামগিরি রায় বৌদ্ধগণের প্রধান। তাঁর অঞ্চলে তরুণ এক সন্ন্যাসী এসে কেবল নেচে গেয়ে অশ্রুপাত ক'রে ভক্তিধর্ম প্রচার করবে, তা তিনি সহ্য করবেন কেমন ক'রে! মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র-তর্ক করতে এলেন—ভাব এই—যুদ্ধং দেহি! আমার সঙ্গে শাস্ত্র-আলোচনায় জিতবে এমন সাধ্য কার?

তর্ক-সভা বসলো। বহুলোকের সমাবেশ। বৌদ্ধদের সঙ্গে অনেক পণ্ডিত-ও সমবেত হয়েছেন। মধ্যস্থ হলেন ত্রিমন্দের রাজা। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক ও তার খণ্ডন চললো। অবশেষে বৌদ্ধপণ্ডিত রামগিরি চৈতন্যের কাছে নতি-স্বীকার ক'রে প্রণত হন, বলেন : নবীন সন্ন্যাসী, আমি পাষণ্ডের শিরোমণি। দয়া ক'রে আমায় ভক্তিমার্গ দেখাও।

মহাপ্রভু হেসে বলেন : রামগিরি রায়, তুমি ত মাথার ঠাকুর। হরি ব'লে যে পুলকিত হয় সেইজন ভাগ্যবান।

রামগিরি দয়াল প্রভুর কৃপালাভ করেন। অন্যান্য সব বৌদ্ধগণ-ও রামগিরির পথ অনুসরণ করলেন।

*       *       *       *

তরুণ সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্যের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তার্কিক পণ্ডিতদের মনে আত্ম-জাহির-করার বাসনা জাগে। অন্য প্রদেশ থেকে লোক এসে জ্ঞানের নিশান উড়িয়ে সগর্বে চলে যাবে, তা কি সহ্য হয়। তুঙ্গভদ্রাবাসী-ঢুণ্ঢিরামতীর্থ মহাপ্রভুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আসেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বিদ্যার অহমিকা অত্যন্ত প্রবল। এসে মহাপ্রভুকে তর্কদ্বন্দ্বে আহ্বান করেন।

প্রভু বিনয় ক'রে বলেন : বাণীর কৃপায় তুমি সবশাস্ত্রে অধিকারী। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, দর্শন তোমার নখদর্পণে। আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, কিছুই

জানি না। তর্কে তোমার কাছে এমনি পরাজয় স্বীকার করলেম; আমি জয়পত্র লিখে দেব।

বিনয়নম্র বচনে প্রভু ঢুণ্ডিরামকে বিদায় দিতে চান। কিন্তু মহাপ্রভুর সকাশে এসে ঢুণ্ডিরামের মনের পরিবর্তন ঘটে। জয়পত্র তিনি আর কামনা করেন না, তিনি চান প্রকৃত সম্পদ। মহাপ্রভুর চরণে লুটিয়ে প'ড়ে কৃপা-প্রার্থী হন। মহাপ্রভু শুষ্ক তার্কিককে ভক্তি বিতরণ করেন; এর পর ঢুণ্ডিরাম পরিচিত হন হরিদাস নামে। ঢুণ্ডিরামের এই রূপান্তর দেখে অনেকে কানাকানি করে—ব্যাপার কী? শাস্ত্র-তর্কের আস্ফালন করতে এসে ঢুণ্ডি যে কেঁদেই গ'লে গেল।

রৌদ্রের খরতাপে মাটি শুকিয়ে তপ্ত হয়ে থাকলেও বৃষ্টির জল পেলে গলতে দেরী হয় না। শুষ্ক জ্ঞান যেন রৌদ্রের তাপ; ভক্তি হ'ল বর্ষণ। মন হ'ল আবাদী জমি।

* * * *

গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে বটেশ্বর নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। সেখানে অক্ষয় নামে বটবৃক্ষ; তার তলে বটেশ্বর শিব-বিগ্রহ। রাত্রিতে নামকীর্তন ক'রে অনাহারে সেখানেই কাটালেন। পরদিন প্রভাতে গোবিন্দ ভিক্ষা করতে বের হলেন, ফিরলেন মধ্যাহ্নে। তারপর মহাপ্রভু ভিক্ষান্ন পাক ক'রে উভয়ে গ্রহণ করলেন।

অপরাহ্নকালে মহাপ্রভুর অগ্নিপরীক্ষা। পরীক্ষা করতে এলেন তীর্থরাম নামে এক ধনবান ব্যক্তি, সঙ্গে দুজন বারবণিতা—সত্যবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ। মুনিঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করতে দেবতারা যে পন্থা গ্রহণ করেছেন, তীর্থরাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে ক'রে এনেছেন। সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈকে শিখিয়ে নিয়ে এসেছেন, তরুণ সন্ন্যাসীকে টলানো চাই। মনে মনে ভাবেন—কৌশল ক'রে এবার সন্ন্যাসীর তেজ হরণ করবো।

সত্যবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ ছলাকলা ক'রে মায়াজাল বিস্তার করে; মহা-প্রভুর কাছে গিয়ে বসে, কটাক্ষ হানে, কৌতুকে হাসে। সত্যবাঈ কাঁচলি খুলে অনাবৃত অঙ্গ দেখায়। মহাপ্রভু নির্বিকার। সত্যকে বলেন—মা!

মাতৃ-সম্বোধনে সত্যবাঈয়ের মনে পরিবর্তন আসে। থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে সে। তার অস্ত্র তো ব্যর্থ; এখন বুঝি শাস্তির পালা! ধেয়ে গিয়ে সে মহাপ্রভুর চরণে পড়ে।

প্রভু বলেন : মা, কেন তুমি আমাকে অপরাধী করো ?

এইমাত্র ব'লেই প্রভু মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ; জটার ভার খুলে ধূলায় ধূসর হ'ল। সারাদেহ অনুরাগে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর ॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস ॥

—গোবিন্দদাসের করচা

হরিনামে মত্ত হয়ে মহাপ্রভু নাচেন, কাঁটা-খোচা জ্ঞান নাই, যেখানে-সেখানে আছাড় খেয়ে পড়েন। ক্ষীণ অঙ্গ বয়ে রক্তের ধারা ঝরতে থাকে। অনাহারে দেহ হয়েছে অস্থিচর্মসার কিন্তু তা থেকে অদ্ভুত তেজ বের হয়।

পরীক্ষক তীর্থরাম দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখছিলেন। তাঁর মনে ভয় হ'ল—এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর কাছে তিনি অপরাধী। মহাপ্রভুর চরণে প'ড়ে তিনি আশ্রয় চান। প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান নাই ; তাঁকে চরণে দলিত করেন। প্রেমে মত্ত হয়ে হরি ব'লে বাহু তুলে নাচেন।

সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল, প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
কোথা প্রভু, কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি ॥

স্থানকালপাত্র ভুলে মহাপ্রভু হরিনামে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। যাকে সম্মুখে পান তাকেই ভাবেন নাম-সুধারস-পানের সঙ্গী। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। ঘাড় ভেঙে হেলে পড়েছে সম্মুখ দিকে, মুখে লালা, অঙ্গে ধূলা, দেহে কোন বসন নাই, নয়ন মুদিত, রোমাঞ্চে দেহ কণ্টকিত। পিচকারির ধারার মতো চোখে নামল অশ্রুর ধারা।

অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তীর্থরাম আকুলভাবে কেঁদে ওঠেন—প্রভু, আমি বড়ই পাষণ্ড। কৃপা ক'রে আমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করো।

অনুতাপের অনলে তীর্থরামের মনের কালিমা পুড়েছে, অশ্রুজলে তা ধুয়ে গেছে। দয়াল মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বলেন—তুমি ত প্রধান ভক্ত, তোমার স্পর্শে আমি পবিত্র হলেম।

তীর্থরাম নবজীবন লাভ করেন। ভক্তিতে বিগলিত। প্রভুর চরণ ধ'রে রোদন করতে থাকেন—প্রভু, আমায় উদ্ধার করো, আমায় উদ্ধার করো।

মহাপ্রভু উপদেশ দেন: বিষয়-বৈভব তৃণসম তুচ্ছ মনে ক'রো, তবেই অমূল্য ভক্তিরতন পাবে। অনিত্য ধন ছেড়ে নিত্য ধনের ভজনা কর। এই যে সাধের দেহ চর্ম দিয়ে ঢাকা, কিছুদিন পরে তো এ পচে যাবে। দেহ থেকে প্রাণপাখী উড়ে গেলে তখন তা কীটে খাবে আর না হয় ভস্ম হবে। ত্রিভুবনে গৌরবের ধন কিছু নাই, গৌরব কেবল ঈশ্বর-ভজনে। ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্য শাস্ত্রতর্কের কী প্রয়োজন? সমগ্র জগৎ জুড়েই ঈশ্বরের প্রমাণ, প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি অন্য কোন প্রমাণ চান না। বহু শাস্ত্র আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই, বিশ্বাস ক'রে কৃষ্ণ-ভজন করো। ঈশ্বর কোথায়? মনুষ্য-হৃদয়-মাঝে তিনি বিদ্যমান। মূঢ়জনে ভাবে তিনি দূর হ'তে দূরে কিন্তু জ্ঞানী জানে যে তিনি অত্যন্ত নিকটে।

সংসারে আসক্ত ব্যক্তি অর্থসম্পদের গৌরব করে। তাদের দুঃখ নিবারণ করবে কে? সবে কয়—এ আমার, আমি তার; কিন্তু চোখ বুজলেই কেউ কারো নয়। সবাই মিছামিছি আত্মীয়তা করে—এ যেন ভাঙা পুতুলের মতো মৃতদেহে শোক। পুত্র পিতার আত্মজ, জননীর দেহ থেকে সন্তানের জন্ম কিন্তু তারা তো এক নয়। সন্তানের মৃত্যু হ'লে তো জনক-জননীর মৃত্যু হয় না। প্রকৃত কথা হ'ল—কেউ কারো নয়।

মহাপ্রভুর মুখে উপদেশ শুনে তীর্থরামের মনে চৈতন্যের উদয় হয়। বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে তিনি হরিনাম করেন। প্রভু হরিনামে মত্ত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে তীর্থরাম-ও দুই বাহু তুলে হরিনাম ক'রে নাচেন। ধনী তীর্থরাম হলেন বিষয়ত্যাগী দীন ভক্ত।

তীর্থরামের পরিবর্তনের কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হয়। তীর্থরামের পত্নী কমলকুমারী; চারিদিক আলো-করা তাঁর রূপ। স্বামীর বৈরাগ্যের কথা শুনে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসেন। কমলকুমারীর হাত ধ'রে তীর্থরাম বলেন: বিষয়-সম্পত্তি সব আমি তোমাকে দিলাম। আমি নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। বিষয়-বৈভব তুমি ভোগ কর।

কমলকুমারী কাঁদতে কাঁদতে আছাড় খেয়ে পড়েন মাটিতে। তীর্থরাম নির্বিকার। ঈষৎ হেসে বলেন: হরিনাম করো।

কমলকুমারী নিজের গৃহে ফিরে যান, স্বামীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারেন না। চৈতন্যের কৃপায় তিনি অমূল্য সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন, ভোগ-বিলাস তাঁর কাছে হয়ে গেছে তুচ্ছবস্তু।

সাতদিন সিদ্ধ বটেশ্বরে অবস্থান ক'রে মহাপ্রভু আবার যাত্রা সুরু করলেন। কত গৃহস্থজন প্রভুর জন্য বস্ত্র এনে জড়ো করেছিল; একখণ্ডও তিনি স্পর্শ করলেন না। বস্ত্রের স্তূপ বটবৃক্ষতলেই প'ড়ে রইলো।

* * * *

বটেশ্বর ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে দশ ক্রোশ জুড়ে এক গভীর বন। গোবিন্দের মনে ভাবনা জাগে—কেমন ক'রে এই নিবিড় বন পার হব। বনে কত হিংস্র জীবজন্তু। মহাপ্রভু আগে আগে চলেন কৃষ্ণনাম করতে করতে; পিছনে গোবিন্দ। নির্বিঘ্নে বন পার হয়ে যান। একটি জন্তুরও দেখা মেলে না।

জঙ্গল পার হয়ে মুন্নানগর। তার পাশে বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য প্রভু উপবেশন করলেন। মুন্নাবাসী দুজন গৃহস্থ প্রভুর ভোগের জন্য আটা এনে উপস্থিত করলো। প্রভু মৌন। ক্ষীণ দেহ, তবু অঙ্গে আগুনের মতো তেজ। জ্যোতির্ময় নবীন সন্ন্যাসী দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে। ক্রমে জানাজানি হয়। সন্ধ্যার সময় নগরের বহুলোক—স্ত্রী-পুরুষ এসে সমবেত হয় সন্ন্যাসী-দর্শনে। তারা প্রণিপাত ক'রে অনুরোধ করে—গাছতলা ছেড়ে দয়া ক'রে নগর-মধ্যে চলুন।

মহাপ্রভু নীরব, নির্বিকার। মন তাঁর অন্য জগতে। মনে ভাবের আবেগ জেগে উঠতেই তিনি হরি ব'লে বিহ্বল হয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন। কখনো আছাড় খেয়ে পড়েন, আবার উঠে বাহু তুলে প্রেমাবেশে নাচতে থাকেন। দর্শকজন-ও সঙ্গে সঙ্গে করতালি দিয়ে নাচতে লাগল। গৌরাঙ্গের ভুবন-বিজয়ী রূপ। যে দেখে সেই মোহিত হয়। সমবেত মহিলাগণ পরস্পর বলাবলি করেন—দিদি, এমন সুন্দর কখনো দেখিনি। এই বয়সে কেন জটাভার ধারণ করেছে! আহা এমন সুদর্শন, না খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্মসার হয়েছে!

গৌরাঙ্গের প্রতি মমতায় তাঁরা চোখের জল রোধ করতে পারেন না। সারারাত্রি এইভাবে কাটিয়ে মহাপ্রভু প্রভাতে দক্ষিণ-অভিমুখে যাত্রা করলেন। মুন্নাবাসী নরনারী করজোড়ে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু প্রভু কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। সেই বৃক্ষতলে এক দুঃখী নারী ভিক্ষা করতে এসেছিল। পরণে তার ছিন্ন বাস, পেটে অন্ন নাই। যাত্রার সময় এদিক-ওদিক চেয়ে প্রভু অধিবাসীদের বলেন—আমায় কিছু অন্নবস্ত্র ভিক্ষা দাও ভাই।

হাতের কাছে যেন স্বর্গ। সবাই ছুটে যায় ভিক্ষার দ্রব্য আনতে। কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কে আগে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেবে। রাশি রাশি অন্নবস্ত্র জুটে গেল। মহাপ্রভু বলেন—শোন মুন্নাবাসিগণ, তোমাদের ভিক্ষা আমি গ্রহণ করলেম। বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসে আছে, এই সব অন্নবস্ত্র ওর কাছে দাও।

এই ব'লে মহাপ্রভু বহির্বাস প'রে হরি ব'লে যাত্রা করলেন; করঙ্গা ও খড়ম ঝুলিতে নিয়ে গোবিন্দ চললেন পিছে পিছে।

* * * *

মুন্নানগর ছেড়ে মহাপ্রভু দ্বিপ্রহরকালে বেঙ্কটনগরে এসে উপনীত হলেন। সেখানে দণ্ডিস্বামী নামে এক পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে তর্ক-বিচার করতে আসেন। গৌরাঙ্গ বলেন—তোমার কাছে হার মানলেম। কিন্তু পণ্ডিত-প্রবর ছাড়তে রাজী নন। অদ্বৈতবাদের কথা তোলেন তিনি, চৈতন্য সব যুক্তি খণ্ডন করেন। অবশেষে ঘোরতর তর্ক-বিচারের পর বৈদান্তিক পণ্ডিত নতি-স্বীকার করলেন।

মুন্নানগর থেকে আসার সময় রামানন্দস্বামী নামে এক পণ্ডিত মহাপ্রভুর শিষ্য হবার কামনায় সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। রামানন্দ সদাচারী, গৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট। মহাপ্রভু তাঁর প্রতি কৃপা ক'রে তাঁর কানে হরিনাম-মন্ত্র দিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি-উদ্বেলিতচিত্তে তিনি নিজের মঠে ফিরে গেলেন এবং শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করলেন মধুর হরিনাম।

বেঙ্কটনগরের নিকটে বগুলা নামে এক বন। সেখানে দস্যুদলের আড্ডা, পন্থভীল তাদের দলপতি। বনের মধ্যে পথিককে পেলে তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে এমন কি তার প্রাণবধ করতে-ও এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। এদের কথা শুনে মহাপ্রভু পন্থভীলের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বেঙ্কট-

নগরের অধিবাসীরা অনুনয় ক'রে বারণ করেন—পন্থভীল পাপাচারী ; কোন সাধু ব্যক্তি সেখানে যায় না। জ্ঞানহীন দস্যু আপনার জীবন-নাশও করতে পারে।

কিন্তু গৌরাঙ্গের ভয় কিসের! দস্যু রত্নাকর-ও তো এমনিভাবে পথিকের প্রাণবধ করতো। কৃপালাভ ক'রে সেই পরে হয়েছিল মহামুনি বাল্মীকি। বগুলার ভয়ঙ্কর বন আর পন্থভীলের ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে মহাপ্রভু কৌতূহলী হয়ে চললেন বনের মধ্যে, করঙ্গা নিয়ে গোবিন্দ চললেন পিছনে পিছনে।

বনের মধ্যে নবীন সন্ন্যাসীকে পেয়ে পন্থভীল সমাদর ক'রে নিয়ে গেলেন নিজের আস্তানায়। মহাপ্রভু তিন রাত্রি বাস করলেন দস্যুসর্দারের অতিথি হয়ে।

প্রভু বলেন : পন্থ, তুমি সাধুমহাশয়। তোমার দর্শনে সকল পাপ ক্ষয় হয়। গৃহস্থের মতো তুমি বিষয়ের কীট নও, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার নাই। তুমি তো সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ; রমণীর সঙ্গে তুমি বাস কর না, তুমি সদাই শিষ্যগণে বেষ্টিত থাক ; তোমাকে দেখলেই চিত্ত পুলকিত হয়। তুমি মায়া-মোহে বদ্ধ নও, মনে হয় তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ।

পন্থ নীরবে প্রভুর কথা শ্রবণ করেন। গৌরাঙ্গ-দর্শনে তাঁর মনে পরিবর্তন হ'তে সুরু করেছে, অন্তরে শুভবুদ্ধি উঠেছে জেগে। ভক্তিভরে প্রণাম করেন প্রভুর চরণে। প্রভু হরিনাম করতে থাকেন। ভক্তির জোয়ার আসে পন্থের হৃদয়ে। 'প্রভু উদ্ধার করো' ব'লে লুটিয়ে পড়েন মহাপ্রভুর চরণতলে। পন্থকে কোলে তুলে নিয়ে গৌরাঙ্গ হরিনাম দেন তাঁর কানে।

স্পর্শমণির ছোঁয়া লাগলে লোহা হয় সোনা। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে দস্যু পন্থভীল হলেন ভক্তিমান সাধু, হরিনাম করতেই চোখে জল আসে। মালকোচা ছেড়ে পন্থ পরলেন কৌপীন। কণ্ঠের যে হুঙ্কার-ধ্বনিতে পথিকের হৃৎকম্প হ'ত, এখন তাতে উচ্চারিত হয় মধুর হরিনাম। শুধু পন্থ নয়, তাঁর অনুচর দস্যুরা সবাই পাপকর্ম ছেড়ে দিয়ে হরিনাম গ্রহণ করলো ; দস্যুদের জীবনে সুরু হ'ল এক নূতন শুভ অধ্যায়।

* * * *

বগুলা বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মহাপ্রভু আবার চলতে থাকেন। শরীর শীর্ণ, দুর্বল হয়েছে ; চলতে কষ্ট হয় কিন্তু দেহবোধ নাই। সদাই হরিনামে মত্ত ; কখনো ভাবে বিভোর হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দেন, কখনো বাহ্যজ্ঞানহীন

হয়ে জড়বৎ পড়ে থাকেন, দেহ কদম্বকুসুমের ন্যায় পুলকে রোমাঞ্চিত। কখন কোথায় আছাড় খেয়ে পড়েন তার ঠিক নাই।

এক বৃক্ষতলে ভাববিহ্বল অবস্থায় অনাহারে তিন রাত্রি কেটে গেল। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, তাতে দরদর অশ্রু বয়, শত ডাকে-ও কথা বলেন না, যেন উন্মাদ পাগল। কখনো উলঙ্গ হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দেন, সম্পূর্ণ অন্য জগতের লোক। মহাপ্রভুর অচেতন দেহ গোবিন্দ যত্ন ক'রে কোলে তুলে নেন।

চতুর্থ দিবসে এক মহিলা প্রভুর ভোগের জন্য আটা-চূনা নিয়ে আসে, এক বৃদ্ধা এনে দেন এক ঘটি দুধ। দুধে আটা গুলে গৌরাঙ্গ ভোগের ব্যবস্থা ক'রে নেন।

সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে আছে এক মন্দির; তথায় গিরীশ্বর নামে শিব-বিগ্রহ স্থাপিত। জনপ্রবাদ যে, বিশ্বকর্মা সে মন্দির নির্মাণ করেছেন আর শিব-প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। মন্দিরের নিকটে এক বিরাট বিল্ববৃক্ষ কিন্তু তাতে কোনদিন ফল ধরে না। মন্দিরটির তিন দিকের ভিত পাহাড়-দিয়ে-ঘেরা, দক্ষিণদিকে প্রসারিত-শাখা বিল্ববৃক্ষ। মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে নিজহস্তে বিল্বপত্র তুলে শিবের অঞ্জলি দিলেন, তারপর প্রেমে বিহ্বল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ধরণীতে। দুদিন কাট্‌ল এই রকম বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায়।

তৃতীয় দিনে এক জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় থেকে নেমে এসে শিবপূজা ক'রে ফিরে গেলেন। মৌন-ব্রতধারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী। বাইরের কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি নাই। প্রভুর চেতনা ফিরে এলে গোবিন্দ এই সন্ন্যাসীর কথা বললেন তাঁকে। শুনেই মহাপ্রভু সন্ন্যাসী-দর্শনের জন্য ধেয়ে চললেন পর্বতের দিকে। পর্বতের ওপর উঠে দেখা গেল, সে সন্ন্যাসী এক গাছের নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, দেহ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র; কাছে কোন পাত্র নাই। গৌরাঙ্গ সেখানে দাঁড়িয়ে বিনয় বচন বলতে লাগলেন কিন্তু সন্ন্যাসীর চক্ষু মুদ্রিত, কোন সাড়া নাই। অবশেষে তিনি জোড়হাতে স্তব আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চোখ মিলে চেয়ে আনন্দে হেসে উঠলেন। ক্রমে মহাপ্রভু গিয়ে সন্ন্যাসীর পাশে বসেন, উভয়েই একই পথের পথিক।

অতিথি-সৎকারের ইচ্ছা হ'ল সন্ন্যাসীর মনে। তিনি গিয়ে কোন গাছ থেকে ছয়টি ফল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন, নাম পরটা। দুটি দিলেন চৈতন্যকে, চারটি দিলেন গোবিন্দের হাতে। নিমাই প্রসাদ ক'রে দিলে গোবিন্দ স্বাদ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সুমিষ্ট সুধাসম ফল। খেয়ে গোবিন্দের

আশ মেটেনি। মহাপ্রভু বুঝতে পারেন তাঁর মুখের দিকে চেয়েই। নিজের ফল দুটি গোবিন্দকে দিয়ে হেসে বলেন—খাও ; আঁটি গলায় বাধবে ব'লে ভয় করছো, তা বাধবে না।

গোবিন্দ ভাবেন—প্রভু অন্তর্যামী।

সন্ন্যাসী আর দুটি ফল এনে প্রভুকে উপহার দেন। পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলেছে সুশীতল নির্ঝর। ফল ভোজন ক'রে নির্ঝরের জল অঞ্জলি ভ'রে পান ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হন সবাই। মহাপ্রভু হরিনামে মত্ত হয়ে উঠলেন। জটার বন্ধন খসে পড়লো, দেহ হ'ল রোমাঞ্চিত। বিবশ হয়ে তিনি পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন, কপাল কেটে গেল পাথরের ঘায়ে। বুক বেয়ে পড়ে রক্তের ধারা। চোখে অশ্রুর বান, মুখ দিয়ে ঝরে লালা। অচেতন হয়ে জড় পদার্থের মতো প'ড়ে থাকেন প্রেমের ঠাকুর। গৌরাঙ্গের এই ভাব দেখে সন্ন্যাসী বিস্মিত হলেন ; মনে তাঁর ভক্তিভাব জেগে উঠলো। জটাভার খুলে গেল, শ্মশ্রু বেয়ে অশ্রুধারা পড়তে লাগল। প্রেমভরে তাঁর শীর্ণ শুষ্ক দেহ যেন ফুলে উঠলো। মহাপ্রভু চেতনা লাভ করলে সন্ন্যাসী আকুল হয়ে বলেন ঃ তুমি তো সাধারণ সন্ন্যাসী নও, তুমি ঈশ্বর।

প্রভু দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরেন, বলেন—সন্ন্যাসী, তুমি এমন কথা ব'লো না। ঈশ্বরের প্রতি তোমার অদ্ভুত প্রেম। তোমার বস্ত্র নাই, পাত্র নাই, কোন স্পৃহা নাই ; পার্থিব কোন সুখের তুমি বশীভূত নও। তোমার দর্শনে পাষণ্ডেরও সুমতি হয়। তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।

* * * *

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাপ্রভু তৃপদীনগরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বহু রামাইত বৈষ্ণবের বাস ; তাঁরা শ্রীরামের মূর্তি পূজা করেন। মূর্তি দর্শন ক'রে প্রভু প্রেমভরে ধূলায় গড়াগড়ি দেন। মথুরা নামে রামাইত পণ্ডিত বড়ই তার্কিক ব'লে খ্যাত। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র-তর্ক করতে আসেন। গৌরাঙ্গ ভক্তি-প্রেম-রসিক। শুষ্ক তর্কে আনন্দ পান না। বিনয় ক'রে মথুরা পণ্ডিতকে বলেন ঃ তুমি শ্রীরামের ভক্ত বৈষ্ণব গোঁসাই। তোমার কাছে আমি শতবার হারি। উদাসী রামভক্ত হয়ে শাস্ত্র-তর্কে জয় করার বাসনা কেন ? তার চেয়ে কিছু তত্ত্বকথা বল, লোকে তোমার কথা শুনে পবিত্র হোক্। বাদ-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। দয়া ক'রে তুমি আমায় সূক্ষ্মতত্ত্ব শোনাও।

বলতে বলতে ভাবে বিভোর হয়ে তিনি হরি ব'লে নৃত্য আরম্ভ করলেন। বসন, উত্তরীয় কোথায় খসে পড়লো, ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগল, দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত। হরিনামে মত্ত হয়ে ভাবাবেশে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়লেন, যেন প্রাণহীন। রামাইতগণ গৌরাঙ্গের এই ভাব দেখে তাঁকে ঘিরে নাচতে লাগলেন।

অবশেষে তৃপদী ছেড়ে যাত্রা করলেন। মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে চলেন। প্রভু উপদেশ দিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়ে পান্নানরসিংহ দর্শনের জন্য আনন্দে ধেয়ে চলেন। এখানে আছে নৃসিংহদেবের বিগ্রহ; নিত্য চিনি-পানা দিয়ে ভোগ হয়। নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা নিত্য পূজা করেন।

মহাপ্রভু বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নৃসিংহের স্তব করতে লাগলেন। দর্শকজন বিস্মিত হয়। পূজারী তুলসীর মালা এনে দেয় প্রভুর গলায়। প্রসাদ দিয়ে থালা-ভরে। গৌরাঙ্গ কণামাত্র প্রসাদ হাতে নিয়ে স্তব করেন; চক্ষে বহে অশ্রুর ধারা।

এর পর বিষ্ণুকাঞ্চীধাম। ভবভূতি নামে এক ধনবান শেঠী লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করেন। শেঠী পরম ভক্ত। সেবার জন্য বহু অর্থব্যয় করেন। শেঠী-পত্নী প্রতিদিন নিজহস্তে মন্দির ধুয়ে পরিষ্কার করেন। নিত্য দুই মণ ক্ষীরের ভোগ হয়। মহাপ্রভু লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন ক'রে স্তব ও প্রণাম নিবেদন করলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চী থেকে ছয় ক্রোশ দূরে প্রান্তর-মধ্যে ত্রিকাল ঈশ্বর শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। চারি হস্ত পরিমিত তাঁর গৌরীপট্ট। শিব দর্শন ক'রে প্রভু আনন্দিত হলেন। এখান থেকে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে দিয়ে ভদ্রানদী প্রবাহিত। সেখানে পক্ষতীর্থ। গৌরাঙ্গ পক্ষতীর্থে স্নান করলেন। গোবিন্দ ভিক্ষা ক'রে চাম্পিফল পান, তাই ভোজন ক'রে রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। গভীর রাত্রিতে বাঘ এসে গর্জন সুরু করলো। ভয়ে গোবিন্দ জড়সড়। বাঘের তর্জন-গর্জন দেখে মহাপ্রভু হেসে হরিনাম করতে লাগলেন, বাঘ পিছিয়ে এক লাফে বনের মধ্যে চলে গেল। ব্যাঘ্রের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গোবিন্দ ভয়ত্রাতা মহাপ্রভুর চরণধূলি মাথায় তুলে নিলেন।

ভদ্রানদীর তীর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে কালতীর্থ। সেখানে বরাহদেবের সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন ক'রে ভক্তিতে আকুল হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এক পাণ্ডা এসে প্রভুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। নির্মাল্য প্রসাদ লাভ ক'রে

চৈতন্যের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপে, পিচকারির ধারার মতো অশ্রু পড়তে থাকে।

এর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে নন্দা ও ভদ্রা দুই নদীর মিলনস্থলে সন্ধিতীর্থ। মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে স্নান করলেন। সেখানে সদানন্দপরী নামে এক তার্কিক শাস্ত্র-বিচারের পর প্রভুর কাছে প্রণত হলেন।

সন্ধিতীর্থ ছেড়ে গৌরাঙ্গদেব চাঁইপল্লীতীর্থে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক মহাতপা ভৈরবী বিল্ববৃক্ষমূলে স্থিরভাবে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন; বয়স তাঁর শত বৎসর হয়েছে কিন্তু আকার দেখে তা বোঝা যায় না। নদীর তীরে শৃগালী নামে আর এক ভৈরবী আছেন। মহাপ্রভু ভক্তি-সহকারে ভৈরবী দর্শন ক'রে কাবেরী নদীর কূলে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কাবেরীতে স্নান ক'রে গৌরাঙ্গ হরিনাম-কীর্তনে বিভোর হয়ে পড়লেন। গোবিন্দ ভিক্ষা ক'রে আটা-চুনা সংগ্রহ ক'রে আনেন। তা দিয়ে রুটি তৈরি ক'রে খাবার যোগাড় ক'রে নেওয়া হয়।

পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নাগরনগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পথ চলার সময় মুখে তাঁর কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। নাগরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বিগ্রহ আছে। সেখানে তিনদিন অবস্থান ক'রে প্রভু হরিনাম-কীর্তনে সময় অতিবাহিত করলেন। বহুদূর থেকে লোক এসে জুটতে লাগল। গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে হরিনামের উৎসব আর প্রেমভক্তির উৎসব চলতে লাগল।

নাগরে অবস্থানকালে এক অবিশ্বাসী ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর প্রতি অত্যাচার করতে দলবল নিয়ে আসে। গৌরাঙ্গকে উদ্দেশ ক'রে নানা কটূক্তি ক'রে সে বলে : কপট সন্ন্যাসী সেজে লোকশিক্ষা দিতে এসেছ! গ্রাম্য লোকদের মজানোর ফন্দি করেছ তুমি। এখুনি তোমাকে এখান থেকে তাড়াব।

বিপ্রের এই রকম অশিষ্ট আচরণ দেখে সমবেত লোক তাকে মারতে উদ্যত হয়। প্রভু হাসিমুখে তাদের বারণ ক'রে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য ক'রে বলেন : ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণঠাকুর, হরিনাম করো, মনে সুখ পাবে। এই দেহ জড়পিণ্ড মাত্র; অনিত্য এই শরীর পচে গলে যাবে, শৃগাল-কুকুরে খাবে। রমণীর প্রেম গরল সমান, যারা মূর্খ তারা অমৃত ব'লে তা পান করে। ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র যত-কিছু বল, সবাই অর্থ-বস্ত্র-অলঙ্কারের দাস। মৃত্যুকালে পুত্রকন্যা কাছে এসে বলে—বাবা, আমার জন্য কি ক'রে গেলে? এই সব কথা মনে রেখে

ভক্তিসহ হরি বল। আমাকে আঘাত করো তাতে দুঃখ নাই, শুধু প্রাণভরে হরিনাম করো এই ভিক্ষা চাই।

প্রভুর কথায় দর্শকজন মেতে উঠে হরি ব'লে নাচতে লাগল। ব্রাহ্মণের মতির পরিবর্তন ঘটে ; হরিনাম ক'রে তিনি গৌরাঙ্গের চরণে কৃপাপ্রার্থী হন।

নাগর ছেড়ে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরনগর। সেখানে ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা করেন। মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন। ধলেশ্বরের প্রাঙ্গণের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বকুলগাছ ; সেখানে অনেক বৈষ্ণব ভজন-সাধন করেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের নিকটেই এক শিব-বিগ্রহ, তার পাশে কুম্ভকর্ণ সরোবর নামে এক বিশাল দীঘি। মহাপ্রভু এ সকল স্থান দর্শন ক'রে আনন্দ লাভ করেন।

তাঞ্জোরের নিকটে চণ্ডালু নামে এক মনোহর পর্বত। দেখতে পটে-আঁকা ছবির মতো সুন্দর। এর চারি পাশে অনেকগুলি গুহা। শ্যামলসুন্দর পরিবেশ। চারিদিকে বড় বড় গাছ। পাহাড়ের গা বেয়ে অসংখ্য ঝরনা নেমে এসে একত্রে মিশে নদী হয়ে কুলুকুলু স্বরে বয়ে যায়। স্নিগ্ধ শীতল শান্ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই স্থানটি। পাহাড়ের গুহায় ঈশ্বরপ্রেমিক ধ্যানপরায়ণ অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যাতে রত। লোকালয় থেকে দূরে নির্জন তপোবনের মতো স্থান। সাধকগণ এ স্থান ছেড়ে কোথাও যান না, গ্রামবাসীরাই সেখানে ভিক্ষা এনে যোগায়। এখানে সুরেশ্বর নামে এক প্রধান সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে দেখে আনন্দে অধীর হন। এই মনোরম স্থানে গৌরাঙ্গ কয়েকদিন অবস্থান করেন, সুরেশ্বর তাঁর সঙ্গে হরিনাম-কীর্তনে বিভোর হয়ে পড়েন।

তপোবন ছেড়ে মহাপ্রভু পদ্মকোটতীর্থে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অষ্টভুজা ভগবতীদেবীর পূজা হয়। মহাপ্রভু মন্দিরে গিয়ে দেবী-দর্শন ক'রে স্তুতি-প্রণতি করলেন। নবীন জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য বহুলোকের সমাবেশ হ'ল। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে বসে মহাপ্রভু উপদেশ দেন : এ জগৎ মায়ার খেলা। বিষয়-বাসনায় বদ্ধ যারা তারা বারেবারে এই সংসারে ঘুরে-ফিরে আসে। জড়দেহে বুদ্ধির উন্মেষ হ'লে তখন লোকে কেমন ক'রে এই সংসার-ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবে তার চিন্তা করে। আত্মার মরণ নাই, মরে পাপ-দেহ ; ভ্রমবশতঃ মায়াবদ্ধ জীব জীবদেহের কত যত্ন-পরিচর্যা করে। কৃষ্ণ-ভজন দ্বারাই মানুষ এই মায়া-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

চৈতন্যের কণ্ঠে হরিধ্বনি হ'লে চতুর্দিক থেকে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আনন্দে বালক-বালিকা যুবক-বৃদ্ধ সমস্বরে হরিধ্বনি ক'রে ওঠেন, মহিলারা পুষ্পবর্ষণ করেন, অষ্টভুজা দেবীমূর্তি যেন দুলতে থাকে। পদ্মগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে যায়।

সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে থাকতেন এক অন্ধ। ভক্ত, ঈশ্বরপ্রেমিক। গৌরাঙ্গের উপদেশ আর সুধামাখা হরিনাম শুনে তিনি পুলকিত। অন্তরের বাসনা মহাপ্রভুর যে দেবকান্তি দৈহিক সৌষ্ঠবের কথা শোনেন সকলের কাছে, সেই মনোহর রূপ স্বচক্ষে দর্শন ক'রে জীবন সার্থক করবেন। প্রভুর চরণ জড়িয়ে ধ'রে বলেন—আমি অন্ধ দুরাচার, তোমায় দেখতে পাইনে। তুমি দয়াময়, তোমার রূপ আমায় দেখাও প্রভু।

গৌরাঙ্গ বলেন ঃ তোমার চর্মচক্ষু নাই কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে তুমি সবার অন্তর দেখতে পাও ; তুমি জ্ঞানবান। অজ্ঞ লোকেরা স্থূল চোখ দিয়ে দেখে, জ্ঞানী দেখে অন্তরের চোখ দিয়ে।

অন্ধ নাছোড়বান্দা। প্রভুকে দর্শন না ক'রে ছাড়বেন না। কাতরকণ্ঠে বলেন ঃ তুমি করুণানিধান, আমায় ছল ক'রে ভুলিয়ো না। বহুকাল আমি এই মন্দিরে প'ড়ে আছি। স্বপ্নে ভগবতী আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তুমি অগতির গতি।

মহাপ্রভু বলেন ঃ আমাকে কেন অপরাধী কর ? হরি সকলের অন্তরেই বাস করেন। আমি সামান্য মানুষ।

অন্ধ কেঁদে আকুল। কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। কেবল বলেন—অধিক কথায় কাজ নাই ; তোমার রূপ দেখাও এই আমার ভিক্ষা।

অন্ধের আকুতি দেখে দয়ার্দ্রহৃদয়ে গৌরাঙ্গ তাঁকে হাত ধরে তুলে আলিঙ্গন দিলেন। প্রভুর স্পর্শে অন্ধ আনন্দে শিউরে ওঠেন ; বিদ্যুৎচমকের মতো তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে। মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে অবলোকন ক'রে তিনি কৃতার্থ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন। অন্ধ ভক্তের প্রাণশিখা যেন দৃষ্টিশক্তি-রূপে জ্বলে উঠেই নিঃশেষ হয়ে নিভে গেল। গৌরাঙ্গ অন্ধের দেহ ঘিরে হরি-বোল ব'লে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করলেন এবং সেই আঙ্গিনাতেই অন্ধের সমাধি দিয়ে পদ্মকোট ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

*    *    *    *

পদ্মকোটের পর ত্রিপাত্রনগর। এখানে আছে চণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণে আছে বিশাল বিল্ববৃক্ষ। শিবের মন্দিরে একবার ববোম্ শব্দ

করলে বহুক্ষণ ধরে তার প্রতিধ্বনি হ'তে থাকে। সেখানে অনেক শৈব বাস করেন, ভর্গদেব তাঁদের দলপতি। ভর্গদেব বৃদ্ধ, ভক্তিমান। মহাপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার ব'লে স্তুতি করেন। বলেন : প্রভু, লোকে বলে সোনার মতো তোমার বর্ণ কিন্তু আমি দেখি শ্যামল কিশোর। বার্ধক্যের ফলে আমার চোখের দৃষ্টি ঘোর। চৈতন্য গোঁসাই, দয়া ক'রে আমায় চক্ষুদান দিয়ে তোমার রূপটি দেখাও।

মহাপ্রভু সেখানে এক সপ্তাহকাল নামসংকীর্তনের আনন্দে অতিবাহিত করলেন। বহুদুর থেকে দলে দলে লোক আসে তাঁকে দর্শন করতে। দিনান্তে সামান্য আহার, অনাহারে দেহ হয়েছে ক্ষীণ যষ্টির মতো অস্থিচর্ম্ম-অবশিষ্ট, তথাপি দেহের জ্যোতি আগুনের মতো। অঙ্গশোভা দেখে লোক মোহিত হয়, অঙ্গে সর্বদা পদ্মগন্ধ। দেহ এমন দীপ্তিময় যে, তাকালে চোখ ঝল্‌সে যায়।

* * * *

ত্রিপাত্র ছেড়ে মহাপ্রভু দক্ষিণে চলতে লাগলেন। পথে পড়লো এক গভীর বন। বনে কত হিংস্র জীবজন্তু কিন্তু চৈতন্য ভয়লেশহীন। হরিনাম করতে করতে তিনি আগে চলেন, পিছনে গোবিন্দ। বনের মধ্যে লোকজন নাই। বৃক্ষের ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন, বৃক্ষতলে রাত্রি কাটান। তিনদিন পরে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাওয়া গেল। তাদের সঙ্গে বনভূমি পার হয়ে গেলেন। বিশাল বন পার হ'তে লাগল এক পক্ষকাল।

বন পার হয়ে রঙ্গধাম। সেখানে নৃসিংহদেবের অপূর্বসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; নরসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর সংহারে উদ্যত, সম্মুখে করজোড়ে ভক্তিমান প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান। মূর্তি দর্শন ক'রে মহাপ্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হলেন। কখনো চক্ষু মুদ্রিত ক'রে ধ্যানে মগ্ন হন, কখনো কাঁপতে কাঁপতে আছাড় খেয়ে পড়েন, ঘামে সর্বশরীর ভিজে যায়, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে ফেনা ওঠে।

যুধিষ্ঠির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ সেই মন্দিরের পূজারী। যুধিষ্ঠির নিত্য গীতা পাঠ করেন কিন্তু তিনি বিদ্যাবিহীন। ভুল উচ্চারণে গীতা পড়েন শুনে লোকে হাসে, বলে—মূর্খের গীতাপাঠ! ব্রাহ্মণ এ-সব গ্রাহ্য করেন না, নিবিষ্ট-ভাবে নির্জনে গীতা পাঠ করেন আর আনন্দে রোদন করেন।

বিপ্রের ভক্তিভাব দেখে মহাপ্রভুর মন গলে যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—ব্রাহ্মণঠাকুর, গীতা পাঠ করতে কাঁদ কেন?

বিপ্র বলেন—গীতা প'ড়ে বড় আনন্দ। গীতাপাঠের সময় অর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখতে পাই। সেই-লোভে পড়ি।

মহাপ্রভু বলেন ঃ তুমি কৃষ্ণের দর্শন পাও। তোমার সমান সাধু কখনো দেখিনি। তোমাকে ভজলে কৃষ্ণকে দেখতে পাব। দয়া ক'রে তুমি আমায় আলিঙ্গন দাও।

যুধিষ্ঠির একদৃষ্টে গৌরাঙ্গের প্রতি চেয়ে দেখেন, তারপর লুটিয়ে পড়েন তাঁর চরণতলে।

যাত্রাকালে মহাপ্রভু বলেন ঃ যেখানে-সেখানে কৃষ্ণদর্শনের কথা ব'লো না। তুমি বড় ভাগ্যবান।

রঙ্গধাম ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু ঋষভ পর্বতে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে পরানন্দ পুরীর সঙ্গে আনন্দে কৃষ্ণকথা আলোচনা করলেন, তারপর এসে পৌঁছলেন রামনাথনগরে। রামনাথনগরে শ্রীরামের পদচিহ্ন আছে। পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে গৌরাঙ্গ পুলকে শিহরি উঠলেন।

এর পর রামেশ্বর তীর্থ। গৌরাঙ্গ সেখানে রামেশ্বর নামে শিব-বিগ্রহ দর্শন করেন। অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন সেখানে। একজন মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র-তর্ক করতে আসেন। গৌরহরি বিনয় ক'রে বলেন—আমি বিচার করতে চাইনে ; তর্কে পরাজিত হলেম। বিচারে পণ্ডিত হয়ে কি প্রয়োজন ? বহু শাস্ত্র জেনেও যে কামাচারী, অর্থের জন্য যে প্রবঞ্চনা করে, কামিনী-কাঞ্চনের জন্য মন যার ব্যস্ত তার পক্ষে শাস্ত্রচর্চা বাদ-বিতণ্ডায় কী লাভ ? হরিনামে যার হৃদয় গলে, তাকেই ত আমি মনে করি বড় পণ্ডিত। বহু পড়াশোনা ক'রে যার কৃষ্ণে রুচি নাই সে সদাই অশুচি।

মহাপ্রভুর কথা শুনে সাধুজন নীরব। সবাই একাগ্রচিত্তে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতে লাগল। অবশেষে গৌরাঙ্গ হরিনামে মত্ত হয়ে দুই বাহু তুলে কীর্তন করতে করতে অচেতন হয়ে পড়লেন। পাথরের ঘায়ে থুতনি কেটে রক্ত পড়তে লাগল। নিমাইয়ের দেহবোধ নাই। পণ্ডিত-সন্ন্যাসী যত্ন ক'রে রক্তের ধারা মুছিয়ে দিলেন। তিনদিন সেতুবন্ধে অবস্থান ক'রে মহাপ্রভু মাধবীবন দর্শন করতে চললেন।

মাধবীবনে এক মৌনী সাধু তপস্যায় রত আছেন। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ; দেহ বিবস্ত্র। শুভ্র দীর্ঘ দাড়ি বুকের মাঝখান পর্যন্ত পড়েছে ; সদাই শান্তভাবে চক্ষু দুটি মুদিত। মহাপ্রভু তাঁর সম্মুখে জোড়হাতে অনেক স্তবস্তুতি করলেন

কিন্তু সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইলেন না। তিনদিন পর পর অন্যান্য সাধুরা এই মৌনী যোগীর কাছে ফলমূল এনে ভিক্ষা দেন, তাই গ্রহণ ক'রে ইনি জীবনধারণ করেন।

ধ্যান ভঙ্গ হ'লে যোগী চোখ মেলে তাকালেন। তখন মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হ'ল গোবিন্দ তা শুনে বুঝতে পারলেন না। সাধু চাম্বনি শিঙড়ি ব'লে হাসলেন। প্রশান্ত হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবার চাম্বনি শিঙড়ি ব'লে তিনি মহাপ্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গৌরাঙ্গ প্রতি-নমস্কার ক রে আনন্দে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। মৌনী সাধুকে প্রণাম করতে দেখে অপর সাধুসকল মহাপ্রভুর চরণতলে প্রণত হলেন।

মাধবীবনে সাত দিন অতিবাহিত ক'রে প্রভু তত্ত্বকুন্তী নামক তীর্থে গিয়ে পৌছলেন। এর পর তাম্রপর্ণী নদী। মাঘী পূর্ণিমার দিন তাম্রপর্ণী নদীতে পুণ্যস্নানের যোগ। অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। একপক্ষ সেখানে অবস্থান করার পর তাম্রপর্ণীতে স্নান ক'রে, নদী পার হয়ে মহাপ্রভু চললেন কন্যাকুমারী দর্শনে।

সমুদ্রমেখলা ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। বৃক্ষ লতাপাতা নাই, কেবল মসৃণ পাথর আর উঁচু বালির স্তূপ। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন। ফেনপুঞ্জ মাথায় নিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ তীরে এসে ভেঙে পড়ে; ভারত-জননীর চরণে বুঝি মহাসাগরের অর্ঘ্য নিবেদন। যত দূর চোখ যায় কেবল জল— নীলাম্বুরাশি নীল আকাশের সঙ্গে মিশেছে। মহান বিস্ময়কর সৌন্দর্যে মন পূর্ণ হয়ে যায়।

মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে গোবিন্দকে সমুদ্রে স্নান করতে বলেন। পর্বত-সমান বড় বড় ঢেউ বেগে তীরের দিকে ধেয়ে আসে। সেখানে দুজনে স্নান করলেন। সমুদ্রে স্নান করার পর মহাপ্রভুর হৃদয়ের প্রেম যেন উথলে ওঠে। শীর্ণ দেহ পুলকে হয় রোমাঞ্চিত। ভারতের সর্বদক্ষিণ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করা হ'ল। মহাপ্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—গোবিন্দ, এর পর কোন্ দিকে যাবে?

গোবিন্দ বলেন—যেদিকে প্রভুর গমন, দাস-ও সেই দিকে যাবে সেবা করার জন্য।

এবার ফেরার পালা কিন্তু যে পথে এসেছেন সে পথে নয়, ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে।

## পশ্চিম ভারতে

রামেশ্বর সেতুবন্ধে সমুদ্র-স্নান ক'রে একদল সন্ন্যাসী ফিরে চলেছেন। গৌরাঙ্গ তাঁদের সঙ্গ নিলেন। পনের ক্রোশ পথ চলার পর সাঁতাল পর্বত। এখানে এক গাছের তলে বসে সবাই বিশ্রাম করছেন। অনাহারে দেহ দুর্বল। গোবিন্দ চিন্তিত—অনাহারে রাত্রি কাট্‌বে; পরদিন খাদ্য মিলবে কিনা কে জানে। গোবিন্দের মনের ভাব বুঝে মহাপ্রভু হেসে বলেন—গোবিন্দ ভাবছ কেন? হরিনাম-সুধা পান ক'রে রাত্রি কাটাব। প্রভাতে উঠে যেখানে খুশি চলে যাব।

গোবিন্দ আশ্বস্ত হন। গৌরাঙ্গ এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে চক্ষু মুদে ধ্যানস্থ হলেন। যাত্রী সন্ন্যাসিগণ খঞ্জনি বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন। এমন সময় একজন শ্রেষ্ঠী সেখানে এসে ফলমূল, দুধ ও চিনি সকলের জন্য ভিক্ষা দিয়ে গেলেন। গোবিন্দ এবার উৎফুল্ল।

প্রভাতে যাত্রীদল গিরিপথ দিয়ে পর্বত পার হয়ে ত্রিবঙ্কু দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সন্ধ্যাকালে ত্রিবঙ্কুনগরে এসে উপনীত হলেন। বৃক্ষতলে রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। ত্রিবঙ্কুরাজ্যের অধিবাসীরা অতিশয় অতিথিপরায়ণ। রাজা প্রজাবৎসল, সুশাসক এবং ভক্তিমান। রাজ্যে সুখ-শান্তি ও লক্ষ্মীশ্রী বিরাজিত।

এক তরুণ উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী নগরপ্রান্তে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন এ খবর শীঘ্রই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, দলে দলে লোক সমবেত হয় মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য। গৌরাঙ্গ মুদিত নয়নে বসে হরিনাম করেন, নয়নের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা পড়ে; প্রেমে পুলকিত অন্তর, দেহ রোমাঞ্চিত। দর্শকজন মহাপ্রভুর সামনে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে। কেহ ফলমূল এনে যোগায়। কেহ স্বগৃহে নেবার জন্য অনুনয় করতে থাকে। কিন্তু গোরাচাঁদ চোখ মেলে তাকান না। একজন বৃদ্ধ আসেন প্রভুকে দর্শন করার আগ্রহ নিয়ে, বলেন—কোথায় সন্ন্যাসী আছে আমায় দেখাও। সঙ্গে এনেছেন ফলমূল চুনা ভক্তি-উপহার। দয়াপরবশ হয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি উঠে যান তাঁর কাছে; বৃদ্ধ প্রণাম ক'রে ফলার্ঘ্য নিবেদন করেন।

কিন্তু সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইলেন না। তিনদিন পর পর অন্যান্য সাধুরা এই মৌনী যোগীর কাছে ফলমূল এনে ভিক্ষা দেন, তাই গ্রহণ ক'রে ইনি জীবনধারণ করেন।

ধ্যান ভঙ্গ হ'লে যোগী চোখ মেলে তাকালেন। তখন মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হ'ল গোবিন্দ তা শুনে বুঝতে পারলেন না। সাধু চাম্বনি শিঙড়ি ব'লে হাসলেন। প্রশান্ত হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবার চাম্বনি শিঙড়ি ব'লে তিনি মহাপ্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গৌরাঙ্গ প্রতি-নমস্কার ক রে আনন্দে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। মৌনী সাধুকে প্রণাম করতে দেখে অপর সাধুসকল মহাপ্রভুর চরণতলে প্রণত হলেন।

মাধবীবনে সাত দিন অতিবাহিত ক'রে প্রভু তত্ত্বকুন্তী নামক তীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন। এর পর তাম্রপর্ণী নদী। মাঘী পূর্ণিমার দিন তাম্রপর্ণী নদীতে পুণ্যস্নানের যোগ। অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। একপক্ষ সেখানে অবস্থান করার পর তাম্রপর্ণীতে স্নান ক'রে, নদী পার হয়ে মহাপ্রভু চললেন কন্যাকুমারী দর্শনে।

সমুদ্রমেখলা ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। বৃক্ষ লতাপাতা নাই, কেবল মসৃণ পাথর আর উঁচু বালির স্তূপ। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন। ফেনপুঞ্জ মাথায় নিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ তীরে এসে ভেঙে পড়ে; ভারত-জননীর চরণে বুঝি মহাসাগরের অর্ঘ্য নিবেদন্। যত দূর চোখ যায় কেবল জল—নীলাম্বুরাশি নীল আকাশের সঙ্গে মিশেছে। মহান বিস্ময়কর সৌন্দর্যে মন পূর্ণ হয়ে যায়।

মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে গোবিন্দকে সমুদ্রে স্নান করতে বলেন। পর্বত-সমান বড় বড় ঢেউ বেগে তীরের দিকে ধেয়ে আসে। সেখানে দুজনে স্নান করলেন। সমুদ্রে স্নান করার পর মহাপ্রভুর হৃদয়ের প্রেম যেন উথলে ওঠে। শীর্ণ দেহ পুলকে হয় রোমাঞ্চিত। ভারতের সর্বদক্ষিণ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করা হ'ল। মহাপ্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—গোবিন্দ, এর পর কোন্ দিকে যাবে?

গোবিন্দ বলেন—যেদিকে প্রভুর গমন, দাস-ও সেই দিকে যাবে সেবা করার জন্য।

এবার ফেরার পালা কিন্তু যে পথে এসেছেন সে পথে নয়, ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে।

## পশ্চিম ভারতে

রামেশ্বর সেতুবন্ধে সমুদ্র-স্নান ক'রে একদল সন্ন্যাসী ফিরে চলেছেন। গৌরাঙ্গ তাঁদের সঙ্গ নিলেন। পনের ক্রোশ পথ চলার পর সাঁতাল পর্বত। এখানে এক গাছের তলে বসে সবাই বিশ্রাম করছেন। অনাহারে দেহ দুর্বল। গোবিন্দ চিন্তিত—অনাহারে রাত্রি কাটবে; পরদিন খাদ্য মিলবে কিনা কে জানে। গোবিন্দের মনের ভাব বুঝে মহাপ্রভু হেসে বলেন—গোবিন্দ ভাবছ কেন? হরিনাম-সুধা পান ক'রে রাত্রি কাটাব। প্রভাতে উঠে যেখানে খুশি চলে যাব।

গোবিন্দ আশ্বস্ত হন। গৌরাঙ্গ এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে চক্ষু মুদে ধ্যানস্থ হলেন। যাত্রী সন্ন্যাসিগণ খঞ্জনি বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন। এমন সময় একজন শ্রেষ্ঠী সেখানে এসে ফলমূল, দুধ ও চিনি সকলের জন্য ভিক্ষা দিয়ে গেলেন। গোবিন্দ এবার উৎফুল্ল।

প্রভাতে যাত্রীদল গিরিপথ দিয়ে পর্বত পার হয়ে ত্রিবঙ্কু দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সন্ধ্যাকালে ত্রিবঙ্কুনগরে এসে উপনীত হলেন। বৃক্ষতলে রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। ত্রিবঙ্কুরাজ্যের অধিবাসীরা অতিশয় অতিথিপরায়ণ। রাজা প্রজাবৎসল, সুশাসক এবং ভক্তিমান। রাজ্যে সুখ-শান্তি ও লক্ষ্মীশ্রী বিরাজিত।

এক তরুণ উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী নগরপ্রান্তে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন এ. খবর শীঘ্রই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, দলে দলে লোক সমবেত হয় মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য। গৌরাঙ্গ মুদিত নয়নে বসে হরিনাম করেন, নয়নের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা পড়ে; প্রেমে পুলকিত অন্তর, দেহ রোমাঞ্চিত। দর্শকজন মহাপ্রভুর সামনে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে। কেহ ফলমূল এনে যোগায়। কেহ স্বগৃহে নেবার জন্য অনুনয় করতে থাকে। কিন্তু গোরাচাঁদ চোখ মেলে তাকান না। একজন বৃদ্ধ আসেন প্রভুকে দর্শন করার আগ্রহ নিয়ে, বলেন—কোথায় সন্ন্যাসী আছে আমায় দেখাও। সঙ্গে এনেছেন ফলমূল চুনা ভক্তি-উপহার। দয়াপরবশ হয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি উঠে যান তাঁর কাছে; বৃদ্ধ প্রণাম ক'রে ফলার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ক্রমে সন্ন্যাসীর কথা রাজার কানে ওঠে। সন্ন্যাসীকে রাজভবনে নিয়ে যাবার জন্য তিনি রাজদূত প্রেরণ করেন। দূত মহাপ্রভু সকাশে গিয়ে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং রাজপুরীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। প্রভু বলেন—সেখানে আমার কোন প্রয়োজন নাই। বিষয়ীর কাছে আমি যাই না।

—কেন সন্ন্যাসী-ঠাকুর? বস্ত্র অলঙ্কার ধন সম্পত্তি যা তুমি কামনা কর, তাই সেখানে পাবে? আপত্তি কেন?

রাজদূতের কাছে অর্থসম্পদ-ই একমাত্র কাম্য বস্তু। এর চেয়েও মূল্যবান বস্তু যে জগতে আছে, যার জন্য মানুষ অন্য সব-কিছু হেলায় তুচ্ছ করতে পারে তা তিনি ধারণা করতে পারেন না। ভোগ-বিলাসে মগ্ন সংসারী মানুষ, জড়জগতের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ।

মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে বলেন—শোন রাজদূত, ধনে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যারা বিষয়ের কীট তাদের সংস্রবেও আমি কখন যাই না। ধনমদে যারা মত্ত তারা তত্ত্বকথা ভুলে বিষয়-নরকে মগ্ন হয়ে থাকে। এই শরীর অনিত্য—এ-কথা তারা জানে না; ধনকেই জীবনের সার্থক বস্তু মনে করে।

রাজদূতের মনে অভিমান ও দম্ভ প্রবল হয়ে ওঠে। রাজা স্বয়ং আহ্বান করেছেন, অযাচিত হয়ে অপরিচিত সন্ন্যাসীকে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আর সন্ন্যাসী কিনা তা প্রত্যাখ্যান ক'রে রাজার অমর্যাদা করলেন! এর প্রতিফল তিনি ভোগ করবেন! রাজদূত রাজশক্তির চেয়েও বেশী উগ্র; সূর্যের কিরণের চেয়ে বালি বেশী তপ্ত। তিনি হয়ত ভাবেন—উদ্ধত সন্ন্যাসীকে হাত-পা বেঁধে রাজপুরীতে নেবার হুকুম হবে কিংবা রাজ্য থেকে বহিষ্কার করার আদেশ হবে। রাজদূত ফিরে যান রাজার কাছে এবং মহাপ্রভুর স্পষ্ট কথাগুলি সবই বলেন।

রাজার মনে ক্রোধের উদয় হয় না, জাগে কৌতূহল; ভাবেন—দেখতে হবে কেমন সে সন্ন্যাসী যিনি অর্থের আকর্ষণের ঊর্ধ্বে। রাজা নিজেই মহাপ্রভুর দর্শন করতে যাত্রা করেন। হস্তী-অশ্ব, অনুচরবৃন্দ দূরে রেখে দীন বেশে তিনি কয়েকজন মাত্র মন্ত্রী সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর নিকটে আসেন। জোড়হস্তে বিনয় ক'রে বলেন—না বুঝে তোমায় ডেকেছিলাম; দয়া ক'রে আমার অপরাধ ক্ষমা করো। ওহে অধমতারণ, লোক দুঃখশোক পায়

কিসের কারণ, তা থেকে নিস্তারের উপায় কি, সে সম্বন্ধে আমায় জ্ঞান শিক্ষা দাও।

রাজা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ; ভাগবতে বড় জ্ঞানী। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতও এসেছেন। মহাপ্রভু বলেন—রাজা, তুমি বড় ভাগ্যবান। তুমি ভাগবত জান, নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তোমাকে আমি কি বলবো। রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি অন্য কিছু জানি না।

কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতেই গৌরাঙ্গের মনে প্রেমের জোয়ার উথলে ওঠে। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে অমনি উঠে দুই বাহু বাড়িয়ে নাচতে সুরু করেন। নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন ; মহারাজ ভক্তিভরে পিছন দিক থেকে তাঁকে জাপ্‌টে ধরেন। প্রভুর অঙ্গস্পর্শে রাজার দেহ পুলকে কণ্টকিত হয়ে ওঠে, চোখে নামে জলের ধারা।

রাজার ভক্তি দেখে মহাপ্রভু পুলকিত হন, তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বলেন—হরিনামে যার নয়নে অশ্রু বয়, সে আমার নয়নের তারা। তোমার ভক্তি দেখে আমার হৃদয় জুড়াল।

মহাপ্রভুর কৃপাস্পর্শ লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে রাজা রাজপুরীতে ফিরে যান ; সন্ন্যাসীর ভোগের জন্য বহুপরিমাণ ফলমূল পাঠিয়ে দেন। সাধারণ লোকেও চুনা-আটা প্রভৃতি নানাবিধ ভোগের সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত। আত্মভোলা গৌরাঙ্গ কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। স্থানটি মনোরম। চতুর্দিকে পাহাড়-দিয়ে-ঘেরা ; নির্মল জলের অসংখ্য ঝরনা অবিরাম বয়ে চলে ; চারিদিকে বড় বড় নিমগাছ। শ্যামল সৌন্দর্য দর্শককে মুগ্ধ করে।

ত্রিবাঙ্কুনগরের কাছে রামগিরি নামে পাহাড়। জনপ্রবাদ যে, লঙ্কার সমরে জয়লাভ ক'রে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা এই পাহাড়ে উঠে বিশ্রাম করেছিলেন। জনসাধারণের কাছে রামগিরি পবিত্র স্থান। রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে পূত স্থান দর্শনের জন্য মহাপ্রভু সে পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং যেখানে রামসীতা বিশ্রাম করেছিলেন সেখানে ভক্তিভরে প্রণত হন। এক পক্ষকাল এই দেশে অবস্থান ক'রে মহাপ্রভু পয়োষ্ণিনগরে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে শিব-নারায়ণ-বিগ্রহ দর্শন করেন, তারপর যান শিঙারির মঠে।

শিঙারির মঠে শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণ একত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র-তর্ক করতে আসেন ; বিচার-সভা বসে কিন্তু অবশেষে গৌরাঙ্গের অভিমত মানতে বাধ্য হন। মঠ থেকে তিনি মৎস্যতীর্থে গিয়ে উপনীত হন। তীর্থ ক'রে

কাচাড়ে গিয়ে ভগবতী দর্শন করেন। এখানে ভদ্রানদী প্রবাহিত। ভদ্রাতে স্নান ক'রে মহাপ্রভু নাগপঞ্চপদী নামক স্থানে গিয়ে তিন রাত্রি বাস করেন। এখানকার সব লোক রামভক্ত।

নাগপঞ্চপদীর পর পার্বত্য পথ অতিক্রম ক'রে চিতোল। চিতোল পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে গিয়ে উপস্থিত হন। তুঙ্গভদ্রায় স্নান ক'রে কৃষ্ণনাম-কীর্তনে মেতে ওঠেন তিনি। তারপর কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থল কোটিগিরিতে উপনীত হন। এর পর চণ্ডপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। বাম দিকে থাকে সত্যগিরি নামে পর্বত। দূর থেকে তার নয়নাভিরাম নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়।

চণ্ডপুরের নিকটে গিয়ে মহাপ্রভু এক বৃক্ষতলে উপবেশন করেছেন। লোক-মুখে শোনেন, সে নগরে একজন উদাসীন সন্ন্যাসী আছেন। ঈশ্বর ভারতী নামে পরিচিত। গৌরাঙ্গ গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু অহঙ্কারপূর্ণ। এক কানে তাঁর সোনার কুণ্ডল। মহাপ্রভুকে সাধারণ একজন সন্ন্যাসী মনে ক'রে গর্বভরে আলোচনা স্থরু করেন। সন্ন্যাসীর অহঙ্কার দেখে গৌরাঙ্গ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঈষৎ হাসেন, কোন কথা বলেন না। তাঁকে নীরব দেখে সন্ন্যাসীর মনে তর্কযুদ্ধের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়ে বলেন—লোকে বলে তুমি স্থপণ্ডিত, কিন্তু আমি দেখছি তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। আমি যে শাস্ত্র আলোচনা করছি তাতে তুমি কোন কথাই বল না। এতে কি বুঝব? বিচার করার জ্ঞান বা বিদ্যা তোমার নাই। যেখানে-সেখানে ভিক্ষা ক'রে বেড়াও আর দেশশুদ্ধ লোককে হরিবোলা করলে। এদেশের মূর্খ লোকের ওপর চাতুরি ক'রে তুমি কেমন ক'রে এখান থেকে যাও তাই আমি দেখব!

এই কথা ব'লে ভারতী এক দৌড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং আর তিনজন সঙ্গী নিয়ে ফিরে এসে মহাপ্রভুকে চারিদিক ঘিরে বসলেন। ভারতীর আচরণ দেখে মহাপ্রভু কৌতুক বোধ ক'রে হাসতে থাকেন।

ভারতী বলেন: তুমি হেসে উড়াতে পারবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। উপাস্য দেব কে—এ-কথার উত্তর দাও।

—কৃষ্ণ ভিন্ন সংসারে কি আছে? মহাপ্রভু বলেন।

ভারতী বলেন: এক ব্রহ্ম সর্বেশ্বর, এই হ'ল বেদের প্রমাণ। যেদিকে তাকাই সবই ব্রহ্মময়। এ-বাদের খণ্ডন করবে কি ক'রে?

মহাপ্রভু বলেন : তোমার মতো বিচার করা জানি না। মানলেম তুমি সর্বতত্ত্বে জ্ঞানী ; তোমার নিকট বিচারে হার মেনে নিচ্ছি। যদি চাও জয়পত্র লিখে দিতে পারি।

এ-কথায় ভারতী সাধু খুশি হন না। তিনি গৌরাঙ্গের জ্ঞান পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান আর চান নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতে।

গৌরাঙ্গ বলেন : বেদবেদান্তের মত ছেড়ে দিয়ে ভক্তি সার কর। ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। , বহু শাস্ত্র আলোচনা ক'রে কি ফল ? কৃষ্ণ বিনা জগতে দাঁড়াবার স্থল কোথায় ?

এই কথা ব'লেই মহাপ্রভু চক্ষু মুদিত করলেন ; ভক্তিতে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'ল, শরীরে ঘাম দেখা দিল, থরথর ক'রে সর্বশরীর কম্পিত হ'তে লাগল, কৃষ্ণ ব'লে ডাক দিয়ে তিনি ঢুলতে লাগলেন। ক্রমে হৃদয়ে ভক্তির আবেগ প্রবল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণ হে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়, ভক্তি বিতরণ ক'রে হৃদয় আমার বিশুদ্ধ করো—এই কথা ব'লে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। চোখ মেলে সম্মুখে দেখতে পান তমালবৃক্ষ। অমনি কৃষ্ণ ব'লে ধেয়ে গিয়ে বৃক্ষ জড়িয়ে ধরেন।

ভারতী সাধু গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ দেখে বিস্মিত হন। তাঁর মনের পরিবর্তন হ'তে থাকে। মহাপ্রভুর চরণ জড়িয়ে ধরে বলেন—তোমার ভাব দেখে আর আমি বিচার করতে চাইনে, কৃষ্ণের জন্য আমার উৎকণ্ঠা বাড়ছে। তোমার চরণে আমার নিবেদন—আমার মনে ভক্তি দাও।

যোগীর কোন কথাই মহাপ্রভু শুনতে পান না। অশ্রুজলে মাটি ভেজে, মহাভাবাবেশে অঙ্গ তাঁর স্তম্ভিত। কৃষ্ণ ব'লে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দেন। সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হয়, কাঁটা-খোঁচায় দেহে রক্ত ঝরে। গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ দেখে ভারতীর হৃদয় গলে গেছে। মহাপ্রভুর লুণ্ঠিত দেহের কাছে বসে তিনি কাঁদতে থাকেন। ভারতীর ভক্তি দেখে তাঁর প্রতি প্রভুর দয়ার উদয় হয়। সাধুর পিঠে হাত রেখে মহাপ্রভু দুই-চারিটি উপদেশ-বাক্য বলেন। প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁর মনে। কৃপা লাভ ক'রে প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলাতে গড়াগড়ি যান। তার্কিক সাধু ভক্ত সাধুতে পরিণত হয়েছেন।

বিদায়ের সময় সাধু গৌরাঙ্গের খড়ম আঁকড়ে থাকেন, কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। মহাপ্রভুর চরণ নিত্যবন্দনার জন্য তিনি পাদুকা দুখানি নিজের

কাছে রাখতে চান। চৈতন্য বলেন—তুমি কৃষ্ণে বিশ্বাস কর, আজ থেকে তোমার নাম হ'ল কৃষ্ণদাস।

* * * *

চণ্ডপুর ছেড়ে মহাপ্রভু পার্বত্য পথ দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকেন। পথ বড়ই দুর্গম, আশেপাশে লোকালয় নাই। সারি সারি কদম্ববৃক্ষ চোখে পড়ে। তা দেখে মহাপ্রভুর মন কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হয়, বলেন—আমার কৃষ্ণ এই বৃক্ষতলে বিরাজ করেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলেন। পথে দুই দিন দুই রাত্রি কেটে যায়। কিছুদূর গিয়ে দেখা যায় একটি ছোট জলাশয়। একটি বাঘ এসে সেখানে জলপান করছে। দেখতে পেয়ে গোবিন্দ ভয়ে অস্থির। নিঃশব্দে ইঙ্গিত ক'রে গৌরাঙ্গকে দেখান সে দৃশ্য, শঙ্কিত হয়ে তাঁর পিছনে গা ঘেঁষে চলেন। চৈতন্যদেব নিঃশঙ্ক, নির্বিকার। হরিনামে মত্ত হয়ে চলেছেন। বাঘের পাশ দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু বাঘ ফিরে তাকাল না। গোবিন্দের মনের ভয় যায়নি, কি জানি যদি পিছন দিক থেকে ধরে। পথ চলেন আর পিছনে ফিরে ফিরে তাকান। তাঁর ভাবগতিক দেখে মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে বলেন—ভয় কিসের গোবিন্দ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক, সংশয় ক'রো না; হরিনামে যমের ভয়-ও থাকে না।

গোবিন্দের মনের ভয় দূর হয়, শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বাড়ে। চলতে চলতে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এসে উপনীত হন। অধিবাসীরা সবাই দরিদ্র। পর্বতবেষ্টিত স্থানটি মনোরম। নিমাই সেখানে গিয়ে বসেন; গোবিন্দ ভিক্ষা করতে যান গ্রামের মধ্যে। এক ঘর ব্রাহ্মণ সেখানে। বড়ই দুঃস্থ। ভিক্ষা ক'রে দিনপাত হয়। গোবিন্দকে দেখে সমাদর ক'রে গৃহে বসান কিন্তু ভিক্ষা দেবার মতো কিছুই গৃহে নাই। তথাপি অতিথিকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ ক'রে নিজে ভিক্ষায় বের হন। কিছুকাল পরে ভিক্ষালব্ধ দুটি নারিকেল নিয়ে ফিরে আসেন এবং সে দুটিই গোবিন্দকে দান করেন। ব্রাহ্মণের কাছে অতিথি পূজ্য, দেবতাতুল্য। নিজেদের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় না রেখে সবই ভক্তিভরে তুলে দেন অজানা অতিথির হাতে।

গোবিন্দের কাছে ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহাপ্রভুর ভক্তিমান বিপ্রকে দেখার ইচ্ছা হয়। সন্ধ্যাকালে আসেন তাঁর গৃহে। ব্রাহ্মণ যেন হাতের কাছে স্বর্গ

পান। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে করজোড়ে মহাপ্রভুর সামনে এসে দাঁড়ান। গৃহে তাঁরা দুজন—ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পত্নী। গোপাল-বিগ্রহ আছে, ভিক্ষা ক'রে ভোগ-সেবা করেন।

বিপ্র বলেন—কি দিয়ে অতিথির পূজা করবো! কেমন ক'রেই বা বলি প্রভু ফিরে যাও! গৃহে আসন-ও নাই যে বসতে দেব।

ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলেন—দেখছ না অতিথির পায় বিদ্যুৎ খেলছে, মাথা পেতে দাও। তুলসী এনে দাও সন্ন্যাসীর পায়ে।

বিপ্র তাড়াতাড়ি তুলসী এনে মহাপ্রভুর চরণে দিতে যান। গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণের হাত ধরে বারণ করেন, বলেন—কি কর, কি কর! তুলসী গোপালের পায়ে অর্পণ করো।

মহাপ্রভুর কথা শুনে বিপ্র কাঁদতে থাকেন। প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বলেন—ব্রাহ্মণ, তুমি বড় ভাগ্যবান। তোমার গৃহে গোপাল বিরাজ করেন। তোমার ঘরণী-ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

বিপ্র বলেন—তোমার অঙ্গে দেখি সৌদামিনী খেলে, তোমার দেহে পদ্মগন্ধ। তুমি তো সামান্য মানুষ নও দয়াময়। দয়া ক'রে তোমার চরণ তুলে দাও আমার মাথায়।

ব্রাহ্মণের উক্তি শুনে মহাপ্রভু দাঁতে জিভ কেটে কয়েক পা পিছিয়ে যান কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্যাকুলভাবে ছুটে গিয়ে মহাপ্রভুর পদতলে মাথা নোয়ান। গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে সাদরে ভূমি থেকে তুলে ভক্তিভরে নামকীর্তন সুরু করলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মধুর নামকীর্তনে আকৃষ্ট হয়ে অনেক শ্রোতা ছুটে গেল। তারাও নাম-গানে মেতে উঠলো, আবেশে অনেকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। এই-ভাবে সারারাত্রি সেখানে কীর্তনের আনন্দে অতিবাহিত ক'রে মহাপ্রভু প্রভাতে নীলগিরি অভিমুখে যাত্রা করলেন।

অপরাহ্ণকালে নীলগিরিতে গিয়ে উপনীত হন। নীলগিরির প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নলোভন। সমগ্র পাহাড়টি যেন ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। পর্বতশীর্ষে বড় বড় গাছ, বাতাসে ডালপালা দোলে, যেন চামরব্যজন। ঝর ঝর শব্দে ঝরনার জল পড়ে অবিরত। বিচিত্র লতা-

বেষ্টিত বনস্পতি। বনে ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যায়। অন্যান্য নানা জাতীয় পাখীর কাকলিতে বনভূমি মুখরিত। কত রঙিন ফুল ফুটেছে যেন সবুজ বনানীতে বিচিত্র বর্ণের আলপনা। রাত্রিতে গাছে গাছে জোনাকির ঝাঁক, চলমান হীরার ফুল্‌কির মতো। কতক লতা থেকেও অন্ধকারে আলো ঠিক্‌রে পড়ে। একটি পাহাড়ী নদী ঝুরুঝুরু স্বরে বয়ে চলেছে। তার তীরে বসে মহাপ্রভু সন্ধ্যাপূজা করেন। রাত্রিতে এক গাছের নীচে বসে হরিনাম-গানে যাপন করলেন। নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে নির্জন পাহাড়ের কোলে মধুরকণ্ঠে উচ্চারিত হরে কৃষ্ণ নাম প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে। চতুর্দিকের স্তব্ধতার মধ্যে নির্ঝরের সঙ্গীতের সঙ্গে কেবল মহাপ্রভুর কণ্ঠ জেগে থাকে; সমগ্র প্রকৃতি যেন নীরব শ্রোতা।

সারা দিন-রাত্রির মধ্যে আহার হয়নি কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় গোবিন্দের ক্ষুধাতৃষ্ণা লাগে না।

পরদিন প্রাতে গুর্জরীনগরে গিয়ে উপনীত হন। সমৃদ্ধ স্থান; নগর অনেক অট্টালিকায় শোভিত। মহাপ্রভু নগরের ধারে অগস্ত্য কুণ্ডেতে স্নান ক'রে কুণ্ডতীরে বসে হরিগুণ-গান গাইতে লাগলেন। ক্রমে দু'-চারজন লোক জমা হ'তে লাগল; কেউ কেউ সন্ন্যাসীকে গৃহে নেবার জন্য অনুরোধ করলো, একজন দুধ এনে ভিক্ষা দিল। কিন্তু মহাপ্রভু কারো কোন কথায় সাড়া দিলেন না; চক্ষু মুদিত ক'রে বসে ভাবাবেশে দুলতে লাগলেন। আবেগ প্রবল হয়ে উঠলে 'কৃষ্ণ হে' ব'লে রোদন করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দেন, চোখের জলে মৃত্তিকা ভিজে যায়। জটার বাঁধন খুলে পড়ে, দেহে জাগে রোমাঞ্চ। কখনো ভক্ত সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকেন, কখনো ভাবে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেন। এই আত্মভোলা সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য অনেক লোকের সমাবেশ হয়।

সেখানে অর্জুন নামে একজন বেদান্তের পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতে আসেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ কি তাই নিয়ে তর্ক। পণ্ডিত বলেন—জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই, এদের পৃথক অস্তিত্ব নাই।

মহাপ্রভু বেদান্তের সূক্ষ্মকথা আলোচনা ক'রে অর্জুনের মত খণ্ডন করেন। তিনি বলেন—পরমাত্মাকে যদি একটি মহাবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে জীবাত্মাকে বলা চলে যেন তার পাতা।

তারপর উপদেশ দিয়ে বলেন—পণ্ডিত, আকাশ-পাতাল এই সব তর্ক আলোচনা দূর কর। এতে কী লাভ? ভগবানের ইচ্ছাতেই জীব মায়ায় আবদ্ধ। মায়া-বন্ধন ঘোচাতে না পারলে তাঁর স্বরূপ জানার উপায় নাই। মায়ার যবনিকার মধ্যে একজন আছেন। যবনিকা তুলে তাঁকে দর্শন করো।

এই কথা ব'লেই মহাপ্রভু ভাবে মত্ত হয়ে 'কৃষ্ণ হে' ব'লে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান নীরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন গৌরাঙ্গের মুখের দিকে। মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণের কী প্রাণস্পর্শী মাধুর্য! নাম শুনেই গোবিন্দের দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে; শত শত লোক চারিদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে নামকীর্তন শুনতে থাকে। মৃদুমন্দ বাতাস বয়, সে স্থান অকস্মাৎ পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ভাববিহ্বল মহাপ্রভুর আঁখি দিয়ে ঝর ঝর ক'রে অশ্রু ঝরে। দর্শকজনের অন্তরে হরি-নামের সুধাবর্ষণ হয়। বড় বড় মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত এসে দাঁড়িয়েছেন, অনেক শৈব বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চক্ষু মুদিত ক'রে কৃষ্ণনাম সুধা পান করছেন, গোবিন্দ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন শত শত কুলবধূ দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে হরিনাম শুনছেন। মহাপ্রভু কথা বলেন কখনো সংস্কৃত ভাষায়, কখনো তামিল ভাষায়। দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করার সময় তিনি তামিল বলতে শিখেছেন। মহাপ্রভু যেন ভক্তিপ্রেমের উৎস; দর্শকগণ তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী আর হরিনাম-গান তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন। গান করতে করতে গৌরাঙ্গ নাচতে সুরু করেন, নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পড়েন আছাড় খেয়ে। জটার ভার খুলে যায়। কৌপীন খসে পড়ে, দেহ যেন প্রাণহীন। দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকে এসে যত্ন ক'রে ধরে তোলেন, চোখে মুখে জল দেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু উঠে বসেন, আনন্দে জনতা হরিধ্বনি করে।

* * * *

গুর্জরীনগর ছেড়ে মহাপ্রভু চললেন পূর্ণনগর অভিমুখে। সাত দিন চলেন একাদিক্রমে। বিজাপুর পর্বতের শিখরে আরোহণ ক'রে হরগৌরী দর্শন ক'রে বিশ্রাম করলেন। তারপর পর্বত হ'তে অবতরণ ক'রে উত্তরদিকে এগিয়ে চলেন, পিছে পিছে গোবিন্দ। পথের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সহগিরি দূর থেকে দেখা যায় যেন নীলরেখা চলে গেছে। কাছে গেলে এর গম্ভীর সমাহিত ভাব মনে বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ সঞ্চার করে। সহগিরি দেখে



১২

মহাপ্রভু আনন্দে আত্মহারা হয়ে হরিনাম করতে করতে চললেন। পরণে কৌপীন, সর্বাঙ্গে ধূলা ; দেখলে মনে হয় পাগল।

পর্বত-অংশ পার হয়ে গৌরাঙ্গ পূর্ণনগরে গিয়ে উপনীত হলেন। বিদ্যা এবং ধর্মচর্চার স্থান। নগরের মধ্যে অচ্ছসর নামে এক সরোবর, তার তীরে আছে বিস্তৃত বকুলবৃক্ষ। মহাপ্রভু সেই গাছের নীচে গিয়ে বসেন। নয়ন মুদিত ক'রে তিনি কৃষ্ণনাম গান করেন, অবিরল ধারায় অশ্রু পড়ে। অনেক বৈষ্ণব সাধু একত্রিত হন মহাপ্রভুর ভক্তির আবেগ দেখে। ব্রহ্মবাদী তার্কিক পণ্ডিত-ও আসেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা ও তর্কজাল বিস্তার করতে। মহাপ্রভু তাঁদের তর্কবাদ খণ্ডন করেন। কৃষ্ণের জন্য আকুলতা বেড়ে ওঠে, বলেন—কৃষ্ণ লাগি প্রাণ মোর হয়েছে কাতর।

গৌরাঙ্গ যখন প্রেমাবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে ব্যাকুল হয়েছেন, এমন সময় একজন পণ্ডিত এসে বলেন—তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরের মধ্যে আছেন।

এই কথা শোনামাত্র গৌরাঙ্গ রোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাঁড়ালেন, চোখে নামল অশ্রুর বান ; ফুলে' ফুলে' কাঁদেন আর বলেন—কৃষ্ণ বিনা আমার প্রাণ বিকল হ'ল। কৃষ্ণ বিনা যাতনা যে আর সহ্য হয় না।

সেই সন্ন্যাসী পণ্ডিত আবার বলেন—তোমার কৃষ্ণ ত জলে লুকিয়ে আছেন।

এবার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা উপলব্ধি করতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদের মতো হয়ে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন দীঘির জলে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে মহাপ্রভুকে সরোবরের তলদেশ থেকে টেনে তোলেন। যে সন্ন্যাসী বলেছিলেন কৃষ্ণ জলে লুকিয়ে রয়েছেন, তাঁকে সবাই নানারকম কটূক্তি করতে থাকেন।

মহাপ্রভু তাঁদের বারণ ক'রে বলেন—সন্ন্যাসী মহারাজকে বৃথা ভর্ৎসনা কর কেন? জলে স্থলে শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজ করছেন, সমগ্র জগৎ কৃষ্ণ-ময় ; যে ভক্ত, সেই দেখতে পায়। সংসারে ভক্তিই হ'ল পরম তত্ত্ব। কেবা আত্মপর, কেবা পিতামাতা? মোহ অন্ধকারে জীব আপনাকে ভুলে মুখে একবার হরি বলে না। ঐশ্বর্যের মিথ্যা গর্ব ক'রো না। প্রাণপাখী যখন দেহবৃক্ষ ছেড়ে যাবে সেদিন জড় দেহ প'ড়ে থাকবে। সবাই একদিন মরবে ; জেগে জেগে কেন আর স্বপ্ন দেখ ভাই! এস ভাই, সকলে মিলে হরিধ্বনি করি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক, জন্ম মৃত্যু জরা বারবার হবে না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ

ব'লে ডাক, মনের আঁধার ঘুচবে। কৃষ্ণ আরাধনা ক'রে প্রারব্ধ কাটাও, তবে শোক তাপ দুঃখ দূরে চলে যাবে।

প্রভুর দর্শনের জন্য বহুলোকের সমাবেশ হয়। কেউ বলে—এ সন্ন্যাসী ত মানুষ নয়; কেউ বলে—এ মহাজন। গৌরাঙ্গ কারো কথায় কোন সাড়া দেন না। চক্ষু মুদে হরিনাম করেন, দু'নয়নে প্রেমধারা বয়। প্রেমাবেশে ভূমিতে উলটি-পালটি গড়াগড়ি দেন। এমন প্রেমভক্তির আবেগ কেউ কোথাও দেখেনি।

* * * *

পূর্ণনগর ছেড়ে যাবার সময় মহাপ্রভু ভোলেশ্বর শিব দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তুন্নু নামে একজন সদাশয় ব্রাহ্মণ বলেন যে, পাটসগ্রামের কাছে গোরঘাট; সেইখানে ভোলেশ্বর শিবের পাট। তুন্নু পণ্ডিতের নির্দেশমতো পার্বত্য পথ অতিক্রম ক'রে মহাপ্রভু ভোলেশ্বর তীর্থে গিয়ে উপনীত হলেন। ভোলেশ্বর দর্শনের পর দেবলেশ্বর বিগ্রহের সম্মুখে প্রেমে গদগদ হয়ে স্তবস্তুতি করেন। তিনি যেখানেই যান, তাঁর দর্শনের জন্য লোক আসে দলে দলে।

দেবলেশ্বর ছেড়ে কিছুদূরে জিজুরীনগর। সেখানে খাণ্ডবা নামে দেব-বিগ্রহ বিশেষভাবে পূজিত। বহুলোক সেখানে তীর্থদর্শন করতে আসে। সে-অঞ্চলের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পিতামাতা নিজের কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হ'লে খাণ্ডবার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দায়মুক্ত হয়। খাণ্ডবাকে পতি ভেবে কত শত নারী পথের ভিখারিণী হয়েছে; জীবিকা অর্জনের জন্য কত শত জন গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করেছে। তীর্থ করতে যারা আসে তারাই হ'ল এদের প্রধান শিকার। সাধারণের কাছে খাণ্ডবার নারী 'মুরারি' নামে পরিচিত। এরা তীর্থস্থান কলুষিত করে, দেবতার প্রতি আনে অশ্রদ্ধা। সমাজদেহে এরা বিষাক্ত ব্রণের মতো। মুরারিদের বিবরণ শুনে মহাপ্রভুর মনে দয়ার উদয় হ'ল। তিনি বলেন, তিনি যাবেন তাদের দেখতে। গোবিন্দ বারণ করেন, বলেন—মুরারিপল্লীর মধ্যে গিয়ে কাজ নাই।

কিন্তু মুরারিগণের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মহাপ্রভু তাদের উদ্ধার করতে চান। নিষেধ না মেনে তিনি মুরারিপল্লীর মধ্যে গিয়ে প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম করতে থাকেন। প্রভুর অদ্ভুত ভাবের কথা শুনে ক্রমে বহু নারী এসে সমবেত হয়। তাদের উদ্দেশ ক'রে মহাপ্রভু বলেন—হরি বড়ই দয়াল, অগতির গতি তিনি। তাঁকেই নিজ নিজ পতিরূপে ভাব। কৃষ্ণকে পতি-

রূপে পাবার জন্য গোপীগণ শুদ্ধ মনে কাত্যায়ণী ব্রত করে। কৃষ্ণ পতি হ'লে ভবভয় দূর হবে। কৃষ্ণই সকলের পতি। ভক্তিভরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক, তবেই তোমাদের দুর্দশার অন্ত হবে।

এই ব'লেই প্রভু নামকীর্তন আরম্ভ করলেন। পুলকে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রেমাবেশ দেখে মুরারিগণ ভক্তিভরে তাঁর চরণ পূজা করতে লাগল। গৌরাঙ্গ বলেন—আমি গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ফিরি, আমায় ছুঁয়ো না। ভক্তিসহ হরিনাম করো, তোমাদের সকল পাপ-তাপ দূর হবে। না বুঝে যে পাপে মগ্ন হয়, হরিনাম বললে তার পাপ ক্ষয় হ'য়ে যায়।

উপদেশ শুনে খাণ্ডবার যত নারী সবাই প্রভুর নিকটে এসে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন আগুনের মতো রূপ, এমন করুণা, এমন অমৃতময় কণ্ঠের উপদেশ এরা কখনও শোনেনি। এমন পুরুষ যে থাকতে পারে তা-ও হয় ত ছিল ধারণার বাইরে। এই পতিতা নারীদের অতীত অন্ধকার, ঘৃণ্য, কালিমালিপ্ত ; সম্মুখে দেখতে পায় আশার আলো। তাদের মনে আলোড়ন ওঠে শুভ্র সুন্দর জীবনযাপনের জন্য। ইন্দিরাবাঈ নামে এক বয়স্কা মুরারি মহাপ্রভুর চরণতলে ধূলায় লুটিয়ে বলে—তোমার পদধূলি দিয়ে আমায় উদ্ধার করো প্রভু ; এই কলঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি চাই।

মহাপ্রভু তাদের হরিনাম দান করেন।

সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী।
মত্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি॥

* * * *

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু জিজুরীনগর ছেড়ে চোরানন্দী বনে যাবার ইচ্ছা করেন। চোরানন্দী বনে দস্যু-তস্করের আস্তানা। বিস্তৃত বনে তারা দলপতির অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে, অপরের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ক'রে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। মহাপ্রভু ডাকাতদের কাছে যেতে ইচ্ছুক হ'লে অনেকেই বারণ করেন, বলেন—বহু চোরদস্যু সেই বনে থাকে, সেটা কোন তীর্থস্থান নয়, তবে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা কর কেন ? সেখানে গেলে তোমার জীবন-সংশয় হ'তে পারে।

গৌরাঙ্গ বলেন—আমার ভয় কিসের ? হরিনামে আমি দস্যুদের মাতাব।

গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চোরানন্দী বনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে এক গাছের তলায় গিয়ে উপবেশন করেন। একজন লোক এসে কাঁইমাই ক'রে তার নিজের ভাষায় কি যেন বললো; মহাপ্রভুও তেমনি ভাষায় উত্তর দিলেন। কথা শুনে লোকটি কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে থাকে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বনের মধ্যে চ'লে যায়। এর কিছুকাল পরে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে একজন মহাবলবান ব্যক্তি এসে হাজির হ'ল, সকলের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। এ হ'ল দস্যুদলের অধিনায়ক নারোজী। সন্ন্যাসী দেখে ডাকাতরা প্রণাম করে। নারোজী বলে—সন্ন্যাসী, তুমি আমাদের বাসস্থানে চলো, আজ সেখানেই রাত্রি কাটাবে।

—এই গাছের নীচেই রাত্রি কাটাব, মহাপ্রভু বলেন।

নারোজী তখন তার সঙ্গীদের ভিক্ষাদ্রব্য এনে দিতে আদেশ দেয়। অনুচরগণ তৎক্ষণায় ছুটে যায় বনের মধ্যে। অল্প সময়ের মধ্যে শুক্‌নো কাঠ, চা'ল, চিনি, ঘি, দুধ, ফলমূল প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য রাশি রাশি পরিমাণ এনে জমা করে। তারপর নারোজী তার লোকজন নিয়ে চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে অপূর্বদর্শন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মহাপ্রভু খাদ্যবস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ-ও করেন না, যোগাসনে ব'সে হরিনাম করতে থাকেন। ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমের বিহ্বলতা আসে, বাহু তুলে হরিনাম ক'রে নাচতে থাকেন; খাদ্য-দ্রব্য পদতলে পিষ্ট হয়। নারোজার অনুচর দস্যুগণ বিরক্তি প্রকাশ করে, বলে—এ আবার কেমন সন্ন্যাসী, খাওয়ার জিনিস পায়ের তলায় নষ্ট হয় সেদিকে খেয়াল নাই!

সন্ন্যাসীকে দর্শন ক'রে, তাঁর কণ্ঠে হরিনাম শুনে নারোজীর মনে আলোড়ন ওঠে। কে যেন আকর্ষণ করে তাকে; দুষ্কর্মের জীবন ছেড়ে সৎ জীবন লাভের কামনা জাগে তার মনে। অনুচরদের বলে—খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় হোক্, সেজন্য কোন চিন্তা ক'রো না। আবার সামগ্রী এনে জুগিয়ে দেব।

মহাপ্রভু ভাবে মাতোয়ারা হয়ে কৃষ্ণনাম করতে থাকেন, চোখের জলে বুক ভিজে যায়। বনের মধ্যে সে এক অপূর্ব দৃশ্য! চতুর্দিকে শত শত ডাকাত নীরবে দাঁড়িয়ে, মাঝে একা গৌরাঙ্গ ক্ষীণ চঞ্চল অগ্নিশিখার মতো কখনো মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আবার উঠে মধুর নৃত্য করতে থাকেন। অপরাহ্নকালে মূর্ছিত হয়ে পড়েন; সোনার দেহ ধূলায় ধূসরিত। দস্যুগণ পূর্বে কখনো এমন ভাবের পাগল দেখেনি। নারোজীর মনে দোলা লাগে সবচেয়ে

বেশী। সন্ন্যাসী চোখ মেলে দেখেন না, কোন কথাও বলেন না কিন্তু মন গলিয়ে দেন।

গৌরাঙ্গের ভাব দেখে নারোজীর চোখে জল আসে, অনুশোচনায় অন্তর পুড়ে যায়; বলে—সন্ন্যাসী, তোমার ভাব দেখে মনে হয় আর পাপ কাজে লিপ্ত থাকব না, এই বন ছেড়ে চলে যাব। ষাট বছর বয়স হয়েছে; আমি দুরাচার ব্রাহ্মণ-সন্তান এই পাপ কাজে মগ্ন হয়ে আছি। আমার পুত্রকন্যা নাই, সংসার নাই; তবে আমি দস্যুদলের সঙ্গে মিলে পাপকর্ম করি কেন? কুকর্মের ওপর আমার বড় ঘৃণা হয়েছে, আমি আর দস্যুদলপতি থাকব না।

এই কথা ব'লে তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে নারোজী তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মহাপ্রভু বলেন—নারোজী, কার জন্য অর্থ সঞ্চয় কর? পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেউ কারো নয়। এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহরক্ষা হয়, তবে পাপ-কর্মের ভিতর দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করার কী প্রয়োজন? কুবেরের সমান ধনী যারা তাদেরও একদিন মরতে হবে; দরিদ্রের যে গতি, সম্রাটেরও সেই গতি। 'আমার আমার' ক'রে বৃথা কেন কষ্ট পাও! প্রেমভক্তিসহ হরিনাম কর।

নারোজীর রূপান্তর ঘটেছে। দস্যুবৃত্তির জীবন তার কাছে হয়েছে একান্ত ঘৃণ্য, অসহ্য। মহাপ্রভুর কাছে অনুনয় করে—প্রভু, দয়া ক'রে আমায় তোমার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দাও। আমি তোমার পিছনে পিছনে যাব, সকল তীর্থের পথ চিনিয়ে দেব। এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম, তুমিই আলো দেখিয়েছ। এই হাতে কত নরহত্যা করেছি, এই মুখে কতজনকে কটু কথা বলেছি! জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকি, মানুষের সমাজে যেতে পারিনে। অগতির গতি, তুমি আমাকে প্রকৃত পথ দেখিয়েছ। আমি আর ডাকাতের দলপতি থাকব না।

মহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ ক'রে দস্যু নারোজী হয় ভক্ত শিষ্য; তীর্থদর্শনে তাঁর সঙ্গী হয়ে চলে।

চোরানন্দীর পর খণ্ডলা। এখানে মূলানদী অতিশয় খরস্রোতা। নদীতে স্নান ক'রে গোবিন্দ আর নারোজী নগরের মধ্যে ভিক্ষায় যান। মহাপ্রভু বসে থাকেন নদীতীরে। খণ্ডলার অধিবাসীরা বিশেষ অতিথিপরায়ণ। ক্রমে দুই-চারজন ক'রে অনেক লোক সমবেত সন্ন্যাসীকে দেখতে। সবাই তাঁকে নিজগৃহে নেবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। অবশেষে কে গৌরাঙ্গকে

গৃহে নিয়ে অতিথিসংকার করবে, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদের উপক্রম। মহাপ্রভু নীরবে হাসেন মনে মনে। একজন ধনী এসে বলেন—সন্ন্যাসী, তুমি আমার বাগানে গিয়ে অবস্থান কর। পরিধানে বস্ত্র নাই, এ কি বিড়ম্বনা! একখানা বসন দিতে ইচ্ছা করি, পথের সম্বল অর্থ যা চাও তা-ও দেব ; আমার উদ্যানে গিয়ে দয়া ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ কর।

মহাপ্রভু হেসে বলেন—শোন মহারাজ, বিলাস-বিভবে আমার কোন প্রয়োজন নাই। পরিধানে আমার ছিন্ন বস্ত্র ; এই বহু মানি। অর্থের-ও কোন প্রয়োজন বোধ করি না। সম্পদের সঙ্গে অহঙ্কার বাড়ে ; অহঙ্কারে কলুষ বাড়ে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছ, এ-সব কোথায় চলে যাবে মনে ভেবে দেখ। বিলাস-বিভব সব বিলুপ্ত হবে, কেবল জগৎপতিই চিরন্তন। আমার সঙ্গীজন ভিক্ষা ক'রে এনেছে ; অধিক ভিক্ষায় আর কি প্রয়োজন? তুমি যদি ভিক্ষা দিতে চাও, দরিদ্র দুঃখীকে দাও ; তাদের অভাব পূরণ হবে। সংসারের মায়ার বন্ধনে থেকে সুখ নাই। যদি বন্ধন কাটতে চাও, তবে প্রেমভক্তিসহ হরি বল।

এই কথা ব'লে মহাপ্রভু চোখ বুজে হরিনাম করতে লাগলেন। পুলকের ভরে জটা খসে পড়লো, বহির্বাস খুলে গেল। প্রেমের আবেগে তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নৃত্য সুরু করলেন ; কখনো মাটিতে পড়েন মূর্ছিত হ'য়ে, দেহ হয় ধূলায় ধূলিময়। সারারাত্রি গৌরাঙ্গ বসে হরিনাম ক'রে কাটান। নারোজী কাছে বসে ভক্তিভরে প্রভুর দেহের ঘাম মুছে দেয়।

প্রভাতে উঠে তিনজন চললেন নাসিক-তীর্থ দর্শন করতে। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেছিলেন। এর উত্তর অংশে ত্রিমুকের কাছে রামের কুটীর বিদ্যমান। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু শ্রীরামের স্তবস্তুতি ক'রে আনন্দে নামকীর্তন করলেন। ত্রিমুকের নিকটে বনের মধ্যে রামের চরণ-চিহ্ন আছে শুনে তা দর্শনের জন্য গৌরাঙ্গ ধেয়ে চলেন। নিবিড় বন। ঝরনার ধারে একখানি প্রস্তরের ওপর দুটি চরণ-চিহ্ন। পাথরের ওপর নিটোল পদচিহ্ন স্পর্শ ক'রে আবেশে গৌরাঙ্গের দেহ ফুলে' ফুলে' ওঠে, পুলকে জটা যেন নেচে ওঠে। আকুল কণ্ঠে বলতে থাকেন—কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর, দেখা দিয়ে আমার অন্তর জুড়াও প্রভু।

ভাবের আবেগে গোবিন্দের গলা জড়িয়ে ধরে মহাপ্রভু 'আমার রাম কোথায়' ব'লে রোদন করতে থাকেন। প্রেমে উন্মাদের মতো। কৃষ্ণ হে ব'লে

ডাকেন, এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করেন, আকাশের দিকে চেয়ে কাকে যেন ডাকেন, কি দেখে যেন চমকে ওঠেন। কয়েক দিন উপবাসে গেছে, দেহ ক্ষীণ কিন্তু জ্যোতির্ময়। শরীর থেকে পদ্মগন্ধ বের হয়; মৃদুমন্দ সমীরণ বইতে থাকে, বন হয় দেবস্থলী।

এর পর মহাপ্রভু পঞ্চবটীতে প্রবেশ ক'রে লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত গণেশ-বিগ্রহ দর্শন করেন। পঞ্চবটীতে পাহাড়ের গুহা হয়েছে তাঁদের সাময়িক বাসস্থান। গোবিন্দ ভিক্ষা ক'রে আনেন, নারোজী বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করেন। নীরব নিথর বন; মাঝে মাঝে দু-চার ঘর লোকের বাস। একদিন গোবিন্দ গেছেন ভিক্ষায়, নারোজী গেছেন ফলের সন্ধানে; গোবিন্দ ফিরে এসে দেখেন বনভূমি নিঝুম, গুহার মধ্যে গৌরাঙ্গ ধ্যানস্থ হ'য়ে আছেন, অঙ্গ থেকে তেজরাশি নির্গত হচ্ছে, গুহা হয়েছে আলোময়। অঙ্গের দ্যুতিতে গোবিন্দের চোখ ঝলসে যায়; চুপি চুপি কাছে যান এই অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দর্শন করতে। পদশব্দ পেয়ে আচম্বিতে মহাপ্রভু ভাব সংবরণ করেন কিন্তু গোবিন্দের মনের চোখে সেই উজ্জ্বল দিব্যকান্তি ঝলমল করতে থাকে। নারোজী বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ ক'রে এনে জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়ায়। তা দিয়ে ভোগ দিয়ে গৌরাঙ্গ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করেন।

বসে বসে হরিনাম জপে সারারাত্রি অতিবাহিত হ'ল। প্রভাতে মহাপ্রভু দমননগরী অভিমুখে যাত্রা করেন। দমনে অবস্থান না ক'রে সেখান থেকে উত্তরদিকে চলতে লাগলেন। এক পক্ষকাল পথে কাটিয়ে গৌরাঙ্গদেব সুরথের রাজ্যে অষ্টভুজা ভগবতী দেবী দর্শনের জন্য উপনীত হলেন। অষ্টভুজা দেবী রাজা সুরথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মহাপ্রভু সেখানে তিনদিন বাস করলেন। সেই মন্দিরে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে বলেন—তোমার সমান সাধু আমি আর দেখিনি; তোমাকে দর্শন ক'রে মনে ভক্তির উদয় হয়। কিরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করতে হয় তার নির্দেশ দিয়ে আমার মনের ব্যাকুলতা ঘুচাও।

মহাপ্রভু বলেন—সুন্দর নায়ক দেখে সামান্য নায়িকা যে ভাবে রাগাত্মিকা হয়ে তাকে দেখে, তেমনিভাবে কৃষ্ণকে বারে বারে ডাকো, মনের অন্ধকার আপনি ঘুচে যাবে।

গৌরাঙ্গ যখন অষ্টভুজার মন্দিরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, সেই সময় এক ব্রাহ্মণ দেবীর সম্মুখে বলির জন্য এক ছাগ নিয়ে এসে উপস্থিত হয় মহাপ্রভু সর্বজীবে দয়াপরবশ। পুণ্যকামী ব্রাহ্মণের মনের সংস্কার দূর

ক'রে ভক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে বলেন—অহিংসা পরম ধর্ম, এই হ'ল সর্বশাস্ত্রের অভিমত। জীবে দয়া করো, আনন্দ লাভ করবে। পশু-হত্যা ক'রে ধর্ম আচরণ হয় না; মাংসাশী রাক্ষসগণ ভোজনের জন্য পশু বধ করার নির্দেশ দিয়েছে। শাস্ত্রে বলে, দেবী ভগবতী পরম পবিত্র। তবে তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন কেমন ক'রে! আসল কথা হ'ল—তামস আহারে তোমাদের রতি, তাই দেবীর কাছে ছাগবলি দিতে এনেছ; ভেবেছ পশু-হিংসা ক'রে পাপকর্মের ফল থেকে পরিত্রাণ পাবে। কেউ যদি ভক্তিভরে দেবীর সম্মুখে নরবলিরূপে তোমাকে কাট্‌তে চায়, তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন হয় বল দেখি? জীবহিংসা করলেই যদি ধর্ম হয়, তবে দস্যুগণকে লোকে সাধু বলে না কেন? প্রতিদিন মৎস্যজীবী বহু মৎস্যের প্রাণনাশ করে, তবে তাদের ধার্মিক বলি না কেন? নরহত্যা, পশুহত্যা মহাপাপ। এই পাপ আচরণে মানুষ কখনও শান্তিলাভ করতে পারে না। পরম বৈষ্ণবী অষ্টভুজা ভগবতী মদ্যমাংস খাবে, এ-কথা বললে কে বিশ্বাস করবে? কাজেই যে ছাগ তুমি দেবীর কাছে বলির জন্য এনেছ, তা ছেড়ে দিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য দিয়ে দেবীর পূজা করো।

মহাপ্রভুর কথায় ব্রাহ্মণের মনের পরিবর্তন ঘটে। পশুবলির সংকল্প তিনি পরিত্যাগ করেন। বলির ছাগ মুক্ত ক'রে দিয়ে পুষ্পবিল্বদলে দেবীর পূজা ক'রে তিনি হৃষ্টমনে গৃহে ফিরে গেলেন।

অষ্টভুজা ভবানীর সম্মুখে স্তুতিবন্দনা ক'রে মহাপ্রভু তাপতী নদীতে স্নানের উদ্দেশ্যে নদীতীরে গিয়ে উপনীত হলেন। অদূরে এক প্রান্তরের মধ্যে বামন-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বলিরাজা এই মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। বামন তাপতীর জলে স্নান করেছিলেন, তাই তাপতী হয়েছে তীর্থক্ষেত্র। বামন দর্শন ক'রে মহাপ্রভু যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করতে ভঁরোচনগরে গিয়ে উপস্থিত হন। যজ্ঞের প্রকাণ্ড খাত দেখে আনন্দে গৌরাঙ্গের অন্তর পূর্ণ হ'য়ে যায়।

এর পর নর্মদা নদীতে স্নান ক'রে মহাপ্রভু বরোদানগরে গিয়ে পৌছেন। বরোদার পূর্বদিকে ডাঁকোরজী-বিগ্রহ অধিস্থিত। ডাঁকোরজী দর্শনের জন্য গৌরাঙ্গ সেখানে গেলেন। ডাঁকোরজীর আঙিনা অনেকটা নীচু। সেখানে দাঁড়িয়ে দর্শন ও স্তুতিবন্দনা ক'রে তিনি বরোদায় ফিরে এলেন। বরোদার রাজা পুণ্যবান ভক্ত। স্বহস্তে তিনি গোবিন্দদেবের মন্দির পরিষ্কার করেন এবং নিত্য তুলসীমঞ্জরী গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়ে ভক্তিভরে পূজা করেন।

সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গ গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়ে দেব-দর্শন করলেন। ভক্তি-পুলকে নয়নে দরদর ক'রে অশ্রুধারা বইতে থাকে। দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণে মহাপ্রভুর বেশ হয়েছে পাগলের মতো ; ছিন্ন বহির্বাস, সর্বাঙ্গে ধূলা, মাথায় জটাভার।

বরোদায় অবস্থানকালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নারোজীর মৃত্যু হ'ল। মৃত্যু-কালে মহাপ্রভু তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। মরণ-সময়ে নারোজী জোড়হাতে গৌরাঙ্গের দিকে তাকিয়ে হরি হরি বললেন ; মহাপ্রভু আপনি শ্রীমুখে তাঁর কর্ণে কৃষ্ণনাম দিলেন। দস্যু নারোজী পরম শান্তিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর মনের কালিমা ধুয়ে গিয়েছিল। গৌরাঙ্গ স্বয়ং নারোজীর মৃতদেহ কোলে ক'রে তমালের তল থেকে স্থানান্তরিত ক'রে সমাধি দিলেন। তারপর সমাধি প্রদক্ষিণ ক'রে কীর্তন ক'রে তাঁর ভক্তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করলেন।

ক্রমে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির কথা রাজার কানে পৌঁছায়। নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে তিনি নিজেই আসেন। গৌরাঙ্গের সম্মুখে এসে রাজা প্রণাম ক'রে দাঁড়ান ; মহাপ্রভু নীরব হয়ে থাকেন। রাজা তাঁকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রভু বলেন—গৃহস্থের দ্বারেই ভিক্ষা মেলে ; বিলাসের ভিক্ষায় কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই তোমার কাছে ভিক্ষা চাইনে।

রাজা করজোড়ে অনুনয় করতে থাকেন। অগত্যা মহাপ্রভু ইঙ্গিতে গোবিন্দকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে বলেন। গোবিন্দ সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে যেমন মুষ্টিভিক্ষা নেন, তেমনি রাজার কাছ থেকে-ও নেন।

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু পশ্চিমদিকে আমেদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বেগবতী মহানদী পার হয়ে তিনি আমেদাবাদের কাছে গিয়ে উপনীত হন। শহরটি সমৃদ্ধ এবং জাঁকজমকশালী ; বড় বড় অট্টালিকা, সুন্দর উদ্যান, মনোরম বাসগৃহ। অধিবাসীরা অতিথিপরায়ণ। মহাপ্রভুর রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে বহুলোক সমবেত হয় তাঁর কাছে। সবাই তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। গৌরাঙ্গ বলেন—গৃহীর বাসস্থানে যাব না, নন্দিনীবাগানের ধারেই রাত্রি কাটাব।

নন্দিনীবাগানের পাশে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র ক'রে অনেক লোকের সমাবেশ হয়। ভক্তিভরে অনেকে ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে আসে, গৌরাঙ্গের শীর্ণ কিন্তু দীপ্ত

দেহ বিস্ময়ের সঙ্গে দর্শন করে, মুগ্ধ হ'য়ে হরিনাম শ্রবণ করে। দর্শকদের দলে একজন পণ্ডিত এসে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বলেন—ভাল ক'রে কৃষ্ণগুণ-গান করো ; ইচ্ছা হয় সব-কিছু ভুলে এই শ্লোক শুনি।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গৌরাঙ্গের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেন। পরে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—এ সন্ন্যাসী সামান্য সন্ন্যাসী নন। তোমরা ভালো ক'রে এঁর সেবা করো।

লোকমুখে এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, দলে দলে লোক আসে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে। চারিপাশে বহুলোক দেখে গৌরাঙ্গ আনন্দে মত্ত হয়ে নাম বিতরণ করেন। সকলকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম কর, সব তাপ দূরে যাবে, দুঃখ থাকবে না। কাকেও গর্বভরে ঘৃণা ক'রো না। গর্বশূন্য হয়ে কৃষ্ণনাম গান কর। ভক্তিরসে যার চিত্ত শুদ্ধ নয়, সে পণ্ডিত হ'লেও তার কোন গৌরব নাই। যে সকল বিঘ্ন তৃণসম মনে ক'রে প্রেমে মত্ত হয়, তাকেই বলি ভক্ত। ভক্তিপ্রেমই হ'ল সার তত্ত্ব। হরিভক্ত ব্যক্তি প্রেমে এমনই মত্ত হয় যে, মুক্তিও সে কামনা করে না। মায়ায় বদ্ধ হয়ে মানুষ এই জড়দেহকেই একান্ত নিজস্ব এবং সর্বস্ব ব'লে ভাবে কিন্তু এ-দেহ কয়দিনের ? জড়দেহের অভিমান ছেড়ে যে কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা হয় সেই ত মাথার ঠাকুর।

* * * *

পরদিন মহাপ্রভু আমেদাবাদ নগর পরিত্যাগ ক'রে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হলেন। কিছুদূরে শুভ্রামতী নদী। নদী পার হয়ে একদল তীর্থযাত্রী দ্বারকা অভিমুখে চলেছে। তার মধ্যে আছেন দুজন বাঙালী—রামানন্দ আর গোবিন্দচরণ। বিদেশে বহুদিন কাটানোর পর বাঙালী দেখে গোবিন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করেন—ভাই, তোমার ঘর কোথায় ?

—আমি রামানন্দ বসু, বাড়ী কুলীননগরে। তুমি কোথায় চলেছ ?

গোবিন্দ বলেন—প্রভু চৈতন্যদেবের সঙ্গে দ্বারকায় চলেছি।

মহাপ্রভু শুভ্রামতীতে স্নান ক'রে উঠে আসেন। রামানন্দ গিয়ে প্রণাম করেন ভক্তিভরে। গৌরাঙ্গ তাঁকে দু-চার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর বলেন—রামানন্দ, তোমাকে দেখে আমার মনে গৌড়ের ভাব জেগে উঠলো। চল একসঙ্গে দ্বারকায় গিয়ে দ্বারকাধীশকে দর্শন করবো। রামানন্দ

পরম বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করেন তিনি। গৌরাঙ্গের অপূর্ব প্রেমভক্তি ও গৃহত্যাগের কথা তিনি দেশে থাকতেই শুনেছিলেন কিন্তু ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এই অবস্থায় তাঁর দর্শন মিলবে, তা কল্পনা করতে পারেননি। চারজন বাঙালীর যাত্রীদল প্রফুল্লমনে দ্বারকার দিকে এগিয়ে চলে; পথে ঘোগা নামে এক গণ্ডগ্রামে উপনীত হয়ে মহাপ্রভু এক প্রকাণ্ড বাগিচার ধারে এক নিমগাছের কাছে গিয়ে উপবেশন করেন।

মহাপ্রভু যে বাগানের কাছে বসলেন সেটি বারমুখী নামে এক রূপবতী ধনশালিনী বারবণিতার উদ্যান, নাম পিয়ার কানন। বারমুখী বহু দাসদাসী নিয়ে বিলাসের জীবন যাপন করে। তার রূপ আর ঐশ্বর্যের কথা এ অঞ্চলের সবাই জানে।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ ফলমূল ভিক্ষার জন্য গ্রামের মধ্যে যান, ফিরে এলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। গৌরাঙ্গ ও তাঁর সঙ্গী তিনজন প্রফুল্লমনে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। গোবিন্দ তীর্থযাত্রী গোবিন্দচরণকে মিতা বলে ডাকেন। প্রভু হেসে বলেন—তবে রামানন্দকে ফাঁকি দেবে কেন? রামানন্দ আমার মিতা।

এই ব'লে রামানন্দকে হাসতে হাসতে মিতা সম্বোধন ক'রে মহাপ্রভু করতালি দিয়ে নামকীর্তন আরম্ভ করেন। রামানন্দ বিব্রত, সঙ্কুচিত হ'য়ে একপাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে থাকেন। অল্পসময়ের মধ্যেই গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন। পিচকারির ধারার মতো অশ্রু বইতে থাকে; কখনো বাহু তুলে নাচেন, কখনো সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপে, দরদর ক'রে ঘাম ঝরে; কখনো বা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন বিহ্বল অবস্থায়, কখনো রোমাঞ্চিত কলেবরে টলতে থাকেন, কখনো আবার প্রাণকৃষ্ণ ব'লে উচ্চকণ্ঠে আকুলভাবে ডাকেন। ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে বহু লোক এসে ঘিরে দাঁড়ায়। তারা নির্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মহাপ্রভুর মুখের দিকে; হরি বলতে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দধারা বয়। আধ-নিমীলিত চক্ষু, জটা এলিয়ে পড়েছে, ধূলামাটিতে অঙ্গ হয়েছে মলিন। কৃষ্ণপ্রেমে এমন উন্মাদ কেউ কোথাও দেখেনি। গৌরাঙ্গ আবেশে মত্ত হয়ে নামগান করেন, রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ দুই ধারে করতালি দিয়ে হরিনাম করতে থাকেন। গৌরাঙ্গ কখনো হাত তুলে 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকেন; একবার 'কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ' ব'লে ধেয়ে গিয়ে নিমগাছ জড়িয়ে ধরলেন।

কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতায় মহাপ্রভু হয়েছেন আত্মবোধশূন্য। সড়কের ধারে ছিল প্রকাণ্ড এক গর্ত। আবেশ-অবস্থায় তিনি গড়িয়ে পড়লেন সেই গর্তের মধ্যে।

সংসারে সুজন যেমন আছে, তেমনি দুর্জন-ও আছে। তারা মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, সকলকেই তারা নিজেদের মনের হীন মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে, তারা নিজেদের মনে করে খুব চালাকচতুর। বালাজী নামে এমনি এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ ভাব দেখে তা ভণ্ডামি মনে ক'রে অকথ্য কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগল। মহাপ্রভুকে বললো—তুমি এখানে প্রবঞ্চনা করতে এসেছ। হরিধ্বনি ক'রে গ্রাম্য লোক ভুলিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করবে এই তোমার মতলব। বহু কপট সন্ন্যাসী আমি দেখেছি, আমার কাছে ফাঁকিবাজি চলবে না।

বালাজীর এই কথা শুনে সমবেত লোক তাকে প্রহার করতে উদ্যত হ'ল। মহাপ্রভু তাদের শান্ত হ'তে উপদেশ দিয়ে বলেন—ভাই সব, ওকে মেরে কি লাভ হবে? পিপাসায় ওর কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে, ওকে হরিনাম-সুধা পান করাও। ভক্তি বিনা ওর হৃদয় মরুভূমির মতো নীরস হয়ে গেছে, তাতে উৎপাদিকা শক্তি সঞ্চার করো।

বালাজীকে সম্বোধন ক'রে মহাপ্রভু বলেন—এস সাধু, তোমার পাপের ভার আমি গ্রহণ করবো; তোমাকে হরিনাম-মন্ত্র দেব, এর বলে তোমার সব তাপ দূর হ'য়ে যাবে।

এই কথা ব'লে গৌরাঙ্গ বালাজীর কাছে গিয়ে তার কানে হরিনাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন থেকেই তার জীবনে সুরু হ'ল এক নূতন পবিত্র অধ্যায়।

বারমুখীর পিয়ার কাননের পাশে মহাপ্রভুর দলের কীর্তন-গান আর বালাজীকে নিয়ে হৈচৈ শুনে সে নিজের জানালায় দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করছিল। কৌতূহলের বশে সে দাঁড়িয়েছিল জানালার পাশে। পরণে তার রঙিন মিহি পেশোয়াজ, তাতে জরির কাজ; অগুরু কুম্‌কুমে দেহ সুবাসিত; দীর্ঘ চুল পরিপাটি ক'রে বেণী-করা; দেহে উচ্ছল টলমল যৌবন। গৌরাঙ্গের দেহকান্তি প্রথমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সুদর্শন, তেজোময় তরুণ সন্ন্যাসী সে কখনো দেখেনি। সন্ন্যাসীর দেহ ক্ষীণ, মাথায় জটাভার, অঙ্গ ধূলামাখা, পরিধানে ছিন্ন গেরুয়া কিন্তু এমন মনোমোহন সৌন্দর্য যে চোখ ফিরানো যায় না। কত সৌখিন ধনবান যুবাপুরুষের সঙ্গে বারমুখীর পরিচয়

হয়েছে কিন্তু এমনটি তো দেখেনি কোথাও। সন্ন্যাসীর অর্থ নাই, বসন-ভূষণ নাই; তথাপি তাঁকে দেখে মন আনন্দে পূর্ণ হয় কেন! তাঁর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে কেন!

শুঁয়াপোকা নিজের মুখ-নিঃসৃত লালা-দিয়ে-তৈরী আবরণের মধ্যে কিছুদিন বদ্ধ থেকে নিজের দেহের রূপান্তর ঘটায়। গুটি কেটে যখন সে বেরিয়ে আসে, তখন আর শুঁয়াপোকারূপে নয়, বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত প্রজাপতিরূপে। তখন তার জীবন-ধারাতেই আসে পার্থক্য; গাছের পাতার পরিবর্তে প্রজাপতি পান করে ফুলের রেণু আর মধু; তাকে দেখে মানুষ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয় না, হয় আনন্দিত। দেহোপজীবিনী রূপবিলাসিনী সমাজহীনা বারমুখীর জীবনে এমনি পরিবর্তনের সূচনা হয়। জানালার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে সে মহাপ্রভুকে নিরীক্ষণ করছিল আর তার মনের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল নিজের জীবনের কালিমাময় চিত্রগুলি। তার নিজের কাছেই নিজেকে মনে হচ্ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। অনুশোচনার আগুন জল্‌ছিল মনে; জীবনের অতীতকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ ক'রে।সে নূতন পবিত্র সুন্দর জীবনের জন্য আকুল হয়ে উঠলো। এমন সময় বালাজীর প্রতি সন্ন্যাসীর অপার করুণা দেখে তার নিজের মনেও ভরসা আসে—হয়।তো দয়ালু দেবতুল্য সন্ন্যাসী তাকে-ও উদ্ধার করতে পারেন!

মনস্থির ক'রে বারমুখী ঘর থেকে নেমে আসে, পরিচারিকা মীরা আসে তার পিছনে পিছনে। বারমুখী বলে—মীরা, আজ হ'তে আমার সকল ধনসম্পত্তি তোমায় দিলাম, আমি হলেম পথের ভিখারিণী।

বারমুখী এসে মহাপ্রভুর সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াল। আশ্চর্য রূপের ছটা, দীর্ঘ কালো চুল দিয়েছে এলিয়ে যেন স্থিরবিদ্যুতের পাশে মেঘের রাশি। সমবেত লোক রূপসী বারমুখীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে; মহাপ্রভু চক্ষু মুদে নীরব হয়ে আছেন।

বারমুখী করজোড়ে অনুনয় ক'রে বলে—ওগো সন্ন্যাসী, আমি বড়ই পাপিষ্ঠ, নরকের কীট; আমার বন্ধন কেটে আমায় উদ্ধার করো। কিসে আমার পরিত্রাণ পাব তাই বলো। দয়া না করলে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। আমার এই পাপদেহে আর কী প্রয়োজন?

এই ব'লে বারমুখী নিজের হাতে কাঁচি দিয়ে আ-নিতম্ব বিলম্বিত সুন্দর সুগন্ধি কালো চুলের রাশি কেটে ফেলতে লাগল। বহুমূল্য বসন পরিত্যাগ

ক'রে সামান্য বস্ত্র পরিধান ক'রে আবার গৌরাঙ্গের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। পঙ্ক থেকে যেন শুভ্র শ্বেতপদ্ম জেগে উঠলো।

মহাপ্রভু বলেন—তুমি এখানে তুলসীকানন ক'রে তার মাঝে থেকে কৃষ্ণের সাধনা কর।

—তুমি কৃষ্ণ, তুমি হরি। এই কথা ব'লে গৌরাঙ্গের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু তিন-চার পা পিছিয়ে যান। বারমুখীর ভক্তিভাব এবং বিরাট পরিবর্তন দেখে জনতা ধন্য ধন্য করতে থাকে। মীরা দাসী বারমুখীর দৈন্যদশা দেখে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করে, আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। বারমুখী হাসিমুখে তাকে প্রবোধ দিয়ে বলে—আমার কথা শোন, মীরা! আমার যত ধন আছে সব তোমায় দিলাম। অতিথি এলে ভালরূপে তাঁর সেবা ক'রো, বিরলে বসে হরিনাম ক'রো। প্রেম-অনুরাগে রাধাকৃষ্ণের ভজনা ক'রো, আমার দিব্যি রইলো আর পাপকর্মে মন দিয়ো না। প্রভুর কৃপায় আমার বন্ধন কেটেছে, আমি আর ঘরে ফিরে যাব না ; তুলসীকাননই আমার বাসস্থান।

* * * *



এর পর মহাপ্রভু সোমনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে জাফরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অনেক কষ্টে তিনদিন পরে সেখানে গিয়ে উপনীত হন। জাফরাবাদের বাসিন্দারা দরিদ্র কিন্তু অতিথিকে তারা সমাদর করে। গ্রামবাসীরা ভিক্ষা এনে উপস্থিত করে। এক মালীর বাগানে রাত্রি যাপন ক'রে পরদিন প্রভাতে সোমনাথ উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ; সোমনাথে গিয়ে পৌছতে লাগল ছয় দিন ।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে সোমনাথ মন্দির এক সময় সমৃদ্ধি ও খ্যাতিতে সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। এর বিশাল মন্দির, মণিরত্নখচিত শিবলিঙ্গ ও মন্দিরে সঞ্চিত ধনরত্ন লোকের কাছে উপকথার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে ধনসম্পদ লুঠ ক'রে নেবার জন্য গজনীর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। দস্যু বিধর্মীর হাতে মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, তীর্থক্ষেত্র হয়েছিল বিনষ্ট।

মহাপ্রভু সোমনাথে উপনীত হয়ে মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে দুঃখে অভিভূত হন। মন্দিরের সে শোভা নাই, ভগ্নস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সোমনাথ-বিগ্রহ নাই—সবই শ্রীহীন। গৌরাঙ্গ খেদ ক'রে বলেন—হায় গঙ্গাধর

বিদেশ থেকে তোমার দর্শনের জন্য আর লোক আসবে না, কত যাত্রী গৌরব ক'রে আসত তোমাকে দেখতে কিন্তু সে গৌরব মুছে গেছে। বিদ্বেষ ক'রে যবনেরা তোমার মণিমুক্তা, ধনরত্ন হরণ ক'রে নিয়ে গেছে! হায় প্রভু, তুমি কোথায় অন্তর্ধান করলে, কৃপা ক'রে ভক্তজনকে আর দর্শন দিলে না!

মহাপ্রভু যখন এইভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন অকস্মাৎ প্রবল ধূলিঝড় চতুর্দিক আচ্ছন্ন ক'রে এল। ধূলার আবরণে সব-কিছু অবলুপ্ত। পাণ্ডাগণ তাড়াতাড়ি কুটীরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। গৌরাঙ্গ আর তাঁর তিনজন সঙ্গী কুটীরের বাইরে বসে রইলেন। এমন সময় একজন অবধূত সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বারবার গৌরাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। পরিধানে বসন নাই, সর্বাঙ্গে ভস্ম-মাখা, মাথার জটা উভ ক'রে বাঁধা, দেহের গড়ন অপূর্বসুন্দর; অরুণবরণ ঢুলুঢুলু চোখ দুটি দেখতে অতি সুন্দর, মুখে মধুর হর হর শব্দ। সন্ন্যাসী এসে কর উর্ধ্বে তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে গৌরাঙ্গ-ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মহাপ্রভুকে কি যেন ব'লেই অন্তর্হিত হলেন। চারিদিক ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন; সন্ন্যাসী কোন্ দিকে চলে গেলেন তা বোঝা গেল না।

হেনকালে অবধূত সন্ন্যাসী আসিয়া।
বারবার গোরাচাঁদে দেখে তাকাইয়া॥
সব গায় ভস্ম মাখা নাহিক বসন।
উভ করি জটা বাঁধা আশ্চর্য গঠন॥
লোহিত বরণ তাঁর হয় চক্ষুর্দ্বয়।
মুখে হর হর শব্দ পবিত্র হৃদয়॥
ঢুলুঢুলু আঁখি দুটি দেখিতে সুন্দর।
আশীর্বাদ করে আসি ঊর্ধ্ব করি কর॥
উঠিলা আমার প্রভু তাঁহারে দেখিয়া।
অন্তর্হিত হৈলা তবে কি যেন বলিয়া॥ —গোবিন্দদাসের করচা

তারপর মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে তিনবার সোমনাথ পরিক্রমা করেন। তাঁর সঙ্গী তিনজন গৌরাঙ্গের সঙ্গে হরি-সংকীর্তনে যোগ দিলেন। গৌরাঙ্গ প্রেমে গদগদ; তাঁর ভাবাবেশ দেখে কয়েকজন পাণ্ডাও এসে যোগ দেন কীর্তনের দলে।

এর পর সোমনাথ ছেড়ে মহাপ্রভু জুনাগড়ে গিয়ে পৌছেন। এখানে কোন তীর্থক্ষেত্র নাই। সমৃদ্ধ বড় গ্রাম, অনেক দালান-কোঠা আছে। এক স্থানে রণছোড়-জীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে; মিরাজী নামে বিপ্র তাঁর সেবাইত। সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গ রণছোড়-জী দর্শনের জন্য মিরাজীর গৃহে উপনীত হলেন। ব্রাহ্মণ সমাদর ক'রে যাত্রীদের বাসস্থান এবং ভোজনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। জুনাগড়ে দুইদিন অবস্থান ক'রে গৃণার পর্বতে কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দর্শনের জন্য অধীর হয়ে মহাপ্রভু পর্বত অভিমুখে ছুটে চললেন। গৃণার পাহাড় অতি মনোরম; জুনাগড় থেকে বেশী দূরে নয়।

গৃণার পাহাড়ের ওপর কিছুটা উঠে মহাপ্রভু দেখলেন একদল সন্ন্যাসী বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। তাঁদের দলপতি ভর্গদেব পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দলপতির জন্য সবাই বিপন্ন, অসহায়। একটি গাছের নীচে ভর্গদেব রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট্ করছেন। দেখেই গৌরাঙ্গ তাঁর সঙ্গীদের সন্ন্যাসীর সেবা করতে আদেশ দেন, আর বলেন—নিমপাতার রস ক'রে রোগীকে খাওয়াও।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ ভর্গদেবের পরিচর্যা সুরু করেন; তাঁকে নিমপাতার রস সেবন করানো হয়। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সুস্থ বোধ করেন। রোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে ভর্গদেব মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা ক'রে কৃপাপ্রার্থী হন। তিনি-ও শিষ্যগণসহ গৃণার পর্বতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শনের জন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে চললেন।

চরণ-চিহ্ন পর্বতের উচ্চতর অংশে অবস্থিত। প্রভাতে সে স্থান অভিমুখে রওনা হয়ে অপরাহ্নে চরণের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রস্তরের ওপর দুইটি চরণের চিহ্ন, তাতে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ চিহ্ন স্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে। চরণ-চিহ্নের কাছে একজন পাণ্ডা সর্বদা থাকেন। গৌরাঙ্গ চরণ-চিহ্ন বন্দনা ক'রে পাণ্ডার নিকট এর পৌরাণিক কাহিনী কি তা জিজ্ঞাসা করলেন।

পাণ্ডা বলেন—প্রভাসে যদুবংশীয়গণ মধুপানে মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রে সকলেই যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন বলদেব এখানে এসে তপস্যা আরম্ভ করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে বলদেবকে বললেন—যদুগণ পাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল; তার ফলস্বরূপ তাদের ধ্বংস তারা নিজেরাই করেছে। আমার কার্য শেষ হয়েছে, আর পৃথিবীতে থাকব না। আমার জন্য যদি পাণ্ডবগণ শোক করে, তবে তুমি তাদের সান্ত্বনা দিও। দ্রৌপদী আমার প্রাণ থেকেও প্রিয়; তুমি তাকে আগে শান্ত ক'রো এই আমার নিবেদন।

নয়ে

কৃষ্ণের মনোভাব জানতে পেরে বলদেব আসন্ন বিরহ-ব্যথায় কাতর হন। বিনয় ক'রে বলেন—বিদুর, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তদের কাছে আমি কি বলবো? কেমন ক'রে তাদের প্রবোধ দেব? তাদের জন্য তুমি কোন চিহ্ন রেখে যাও যা তারা প্রীতিভরে দর্শন ক'রে শান্তিলাভ করতে পারবে। তুমি ত তাদের সকলের প্রাণধন, তোমার অভাবে তারা জীবন রাখবে কেমন ক'রে? পাঞ্চালী যখন হাহাকার করবে, কি ক'রে আমি তাকে প্রবোধ দেব? এ-কথা শুনে কৃষ্ণ সেখানে পদভর দিলেন, অমনি এই চরণ-চিহ্ন ফুটে উঠলো।

পাণ্ডার মুখে পদচিহ্নের এই বিবরণ শুনে মহাপ্রভুর মনে প্রেমাবেশ জেগে উঠলো। স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তিনি নীরবে পদচিহ্ন অবলোকন করলেন। তারপর গদগদভাবে পাণ্ডাকে বললেন—পাণ্ডা ভাই, তুমি সাধু ব্যক্তি, তুমি আমায় কি রত্ন দেখালে! তুমি নিত্য দর্শন ক'রে সুখলাভ করো; তোমার মতো পুণ্যবান আর কে আছে! আমার এই পাষাণ-হৃদয়ে যদি এ-চিহ্ন পড়তো তবে নিত্য ব্রহ্মানন্দ-সুখ অনুভব করতে পারতেম।

এই ব'লে চরণ-চিহ্নের ওপর মাথা রেখে গৌরাঙ্গ বারবার সেখানে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ক্ষীণ দেহ প্রেমানন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠলো; চরণ-চিহ্ন স্পর্শ ক'রে তিনি চক্ষু মুদিত করলেন, অশ্রুধারায় বুক ভেসে যেতে লাগল। করতালি দিয়ে তিনি পদচিহ্ন প্রদক্ষিণ করেন, কটিবন্ধ খসে পড়ে, জটাভার পড়ে এলিয়ে। প্রেমের আবেশে গৌরাঙ্গ আত্মহারা।

মহাপ্রভুর এই ভাব দেখে রামানন্দ পুলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত; গোবিন্দচরণ ভক্তিভরে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন।

* * * *

গৃণার পাহাড় থেকে নেমে এসে মহাপ্রভু ভদ্র নামে নদীর তীরে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন প্রভাতে নদী পার হয়ে প্রভাস-তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নদীর ওপর থেকে সুরু হয়েছে ধন্বিধরঝারি নামে বিস্তৃত বন। এখানে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুর বাস। এই বন পার হয়ে যেতে হবে। নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে চিন্তা ক'রে গোবিন্দ ভীত হন, ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে তাঁর চোখেমুখে। তা দেখে মহাপ্রভু হেসে বলেন—গোবিন্দ, ভয় পাও কেন? হরিনামে যমের ভয় দূর হয়; আর এই ঝারিখণ্ড দেখেই ভয়!

মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গী এবং ভর্গদেবের সন্ন্যাসীদলসহ বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। দলে মোট ষোল জন। নিবিড় বন; মানুষের বসতি নাই বনের মধ্যে। একটি পায়ে-চলা পথ, দুই পাশে জঙ্গল। যতই অগ্রসর হওয়া যায় জঙ্গল তত গভীর। সেই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী যাত্রীর দল বন পার হয়ে যাতায়াত করে। কিছুদূর পর পর পথের ধারে কাঠ-দিয়ে-ঘেরা কিছুটা ফাঁকা জায়গা ক'রে দেওয়া আছে। সেখানে যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে, কোন ঘর বা ছাউনি নাই। বনপথ নানাজাতীয় পাখীর কাকলিতে মুখরিত। বন্য পুষ্প ফুটেছে অজস্র, নানা আকারের, বিচিত্র বর্ণের। ফুলের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পথের ধারে দেখা যায় নানারকম বন্য ফলের গাছ। ফল যেমন সুমিষ্ট, তেমনি প্রচুর। বন পার হওয়ার সময় বন্য ফল পথিকের একমাত্র খাদ্য। বিধাতা যেন মানুষের অসুবিধা দূর করার জন্য আগে থেকেই বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। ভর্গদেবের সঙ্গী সন্ন্যাসীরা ফল কুড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে চলেছেন; কামরাঙ্গার মতো চৌ-শিরা। গোবিন্দ কতক কুড়িয়ে রাখেন মহাপ্রভুর জন্য। মহাপ্রভু বনপথে কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে চলেছেন, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই। অপরাহ্ণে গোবিন্দ ফলগুলি গৌরাঙ্গের সামনে রাখলেন। তিনি নিজে অল্প কয়েকটা আস্বাদন ক'রে সঙ্গীদের খেতে বলেন। গোবিন্দ, রামানন্দ আর গোবিন্দচরণ মনের আনন্দে সুস্বাদু ফল খেয়ে উদর পূরণ করেন। এ ফলের এমনি গুণ যে, এতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই দূর করে।

সারাদিন পথ চ'লে সন্ধ্যার পূর্বে কাঠ-দিয়ে-ঘেরা আস্তানায় রাত কাটানো। মহাপ্রভু করতালি দিয়ে কীর্তন আরম্ভ করেন, সকল সঙ্গীরা মেতে ওঠেন সে মধুর গানে। শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বালানো হয়। হরিনাম গানের সুধারসে মগ্ন হ'য়ে যাত্রীদল রাত্রি যাপন করেন। প্রভাতে আবার যাত্রা সুরু হয়। কিছুদূর গিয়ে পথে একটি খাল পাওয়া গেল। সেখানে মহাপ্রভু স্নান করলেন আর রামানন্দকে বললেন—বন থেকে ফল সংগ্রহ করতে।

প্রভুর আদেশে রামানন্দ নানাজাতীয় পাকা পাকা ফল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন। গৌরাঙ্গ পূজা ক'রে ভোগ দিলেন এবং সকলে তৃপ্তিসহকারে ভোজন সমাধা করলেন।

সন্ধ্যায় পথের ধারে কাঠ-দিয়ে-ঘেরা এক ফাঁকা জায়গায় রাত্রিবাসের জন্য সবাই উপনীত হলেন। ভর্গদেবের সঙ্গীরা শুক্‌নো কাঠ যোগাড় ক'রে নিয়ে

আসেন ; আগুন জ্বালানো হয়। মহাপ্রভু অন্যান্য দিনের মতো করতালি দিয়ে হরিনাম-কীর্তন আরম্ভ করেন। এদিন গান করতে করতে ভাবাবেশ হ'ল ; সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো ; 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর এই ভাব দেখে ভর্গদেব-ও ভাবের আবেগে কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার গন্তব্য স্থান অভিমুখে যাত্রা। পথে একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা। তাঁরা সোমনাথ অভিমুখে চলেছেন। দুই দলের সাক্ষাৎ হ'লে সবাই আনন্দে হরিধ্বনি ক'রে ওঠেন। সাত দিন একাদিক্রমে বনপথ দিয়ে চলে মহাপ্রভু ধন্বিধরঝারি পার হয়ে অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। এই স্থান প্রভাস-তীর্থ নামে খ্যাত।

প্রভাসক্ষেত্রে যদুগণ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ক'রে সকলে নিহত হয়েছিলেন। এখানে গিয়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হয়ে পড়লেন। বিরসবদনে সেখানে বসে কাঁদেন ; কখনো পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটে যান, জটা খুলে পড়ে পিঠের ওপর, বহির্বাস শিথিল, সর্বাঙ্গে ধূলি, চোখের তারা ঊর্ধ্বমুখী। গৌরাঙ্গ পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করলেন—যজ্ঞের কুণ্ড কোথায়? তাঁদের নির্দেশমতো সবাই প্রভাসের দক্ষিণ-ভাগে গিয়ে কুণ্ড দেখতে পান। এখানে যজ্ঞ করা হয়েছিল এবং এখানেই যদুগণ আত্ম-কলহে মত্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এখানে সত্যভামা কাম্যবন রচনা করেছিলেন ; সেখানে মাঝে মাঝে কৃষ্ণের সঙ্গে বাস করতেন। পাণ্ডাদের কথা শুনে গৌরাঙ্গ প্রেমাবেশে রোদন করতে থাকেন। তিনদিন এখানে অবস্থান ক'রে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে সাগরের খাড়ি পার হওয়ার জন্য দড়ির পুল আছে। তা পার হয়ে মহাপ্রভু দ্বারকার পথে এগিয়ে চলেন। দূর থেকে চোখে পড়ে রৈবতক পাহাড়। রৈবতক দেখে গৌরাঙ্গের মনে আনন্দ উথলে ওঠে, মুচকি মুচকি হাসেন আর বলেন—দ্বারকায় গিয়ে প্রণাম ক'রে সবাই কৃতার্থ হও ; ভক্তি ক'রে এখানকার ধূলি অঙ্গে মাখো, বহু পুণ্যের ফলে দ্বারকানগরী দেখতে পেলে।

দ্বারকানগরীর কাছাকাছি যেতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে হেলে-দুলে চলতে চলতে নগরীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁকে আর সামলানো যায় না। রোমাঞ্চিত কলেবরে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন, জটা এলোমেলো, চোখ ফেটে অশ্রুধারা ছুটে ; বারবার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে

চিৎকার ক'রে ওঠেন। দ্বারকাধীশের বাড়ীতে যখন প্রবেশ করলেন, তখন মহাপ্রভুর ভাব দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠলো। কদম্বকেশরের মতো রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ায় সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, ভাবে চোখ ঢুলুঢুলু। কখনো চোখ বন্ধ ক'রে থাকেন, কখনো উর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকেন। কৃষ্ণের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ক'রে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। ভক্তিভরে শ্রীমন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করেন ; প্রতিবারেই নত্র হয়ে নমস্কার করেন ; অবশেষে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েন মন্দিরের সম্মুখে।

ক্রমে এই নবীন ভাবোন্মাদ সন্ন্যাসীর কথা দ্বারকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ; দলে দলে নারীপুরুষ আসে গৌরাঙ্গকে দর্শন করতে। হরিনাম-গানে মহাপ্রভু সকলকে মাতিয়ে রাখেন। একদিন সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভু ধীরে ধীরে কৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে উপনীত হলেন, বহুলোক যায় পিছনে পিছনে। মন্দিরের দ্বারে গিয়ে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, অন্য সবাই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে জোড়হাতে স্তব করতে থাকেন, চোখ দিয়ে জলের ধারা ছুটে, যেন জলের ফোয়ারা। চোখ বন্ধ ক'রে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে আকুল আহ্বান করেন ; সেই ভাবে গদগদ মধুর কণ্ঠের প্রাণস্পর্শী ডাকে দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে। সমবেত জনতার মনে লাগে অপূর্ব প্রেমের দোলা। এমন অনুরাগ, এমন গভীর উন্মাদনা, এমন আকুলতা কেউ কখনো দেখেনি।

পাণ্ডাগণ একদিন ভোগ দিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করেন ; সেখানে মহাপ্রভু এবং তাঁর সঙ্গিগণ সাদরে নিমন্ত্রিত হলেন। গৌরাঙ্গ নিজে ক্ষীর, দই, পুরী প্রভৃতি পঙ্গুদের মধ্যে বিতরণ করেন। দ্বারকায় পরম আনন্দে পনের দিন অতিবাহিত করার পর তীর্থ-ভ্রমণ সমাপন ক'রে মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে ফিরে রওনা হলেন। নীলাচলে ফেরার কথা মনে হ'তে মনে পড়ে রামানন্দ রায়ের কথা। বলেন—রামানন্দ সাধকের শিরোমণি, রামানন্দ আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। চল, সবাই বিদ্যানগরে গিয়ে রামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে যাই। রামানন্দকে ফেলে আমি যাব না।

দ্বারকা ছেড়ে যখন মহাপ্রভু ফেরার পথে যাত্রা করেন, শত শত লোক তাঁর অনুগমন করতে থাকে। খাড়ির ওপর দড়ির পুল। সেখানে এসে গৌরাঙ্গ সকলকে মিষ্টবাক্যে গৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। তারপর একে একে পুল পার হয়ে সঙ্গীসহ মহাপ্রভু এবং ভর্গদেব ও তাঁর শিষ্যদল

বরোদানগরে ফিরে আসেন। এক বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন ক'রে যাত্রীদল পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা স্থরু করেন। যোল দিন পর তাঁরা নর্মদা নদীর তীরে গিয়ে উপনীত হলেন। মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে সশিষ্য ভর্গদেব এখান থেকে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে চলে যান; মহাপ্রভু তাঁর বাঙালী পরিকরদের সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন ক'রে পরদিন দোহদনগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গোবিন্দ ভিক্ষা ক'রে কিছু আটা সংগ্রহ করেন। রুটি দিয়ে ভোগ দিয়ে যাত্রিগণ বৃক্ষতলে রাত্রিবাস করেন।

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু কুক্ষীনগরে গিয়ে পৌছেন। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। সন্ধ্যাকালে লোকে হরিধ্বনি করে, শুনে গৌরাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হন। কুক্ষীনগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্যপূজা করেন। গৌরাঙ্গ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী দেখে বিপ্র নিজেকে বড়ই বিব্রত বোধ করেন; ঘরে কোন সম্বল নাই—কি দিয়ে অতিথির সেবা করবেন! মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা ক'রে বলেন—সন্ন্যাসী অতিথি, তুমি কৃপা ক'রে আমার গৃহে পদার্পণ করেছ কিন্তু আমি এখন কি করি! আমি নিঃস্ব, কেমন ক'রে তোমার সমাদর করি! আমার বুঝি ধর্মনষ্ট হ'ল!

মহাপ্রভু আশ্বাস দিয়ে বলেন—কোন চিন্তা ক'রো না ঠাকুর। যাঁর সৃষ্টি তিনিই খাদ্য দেবেন। কার জন্য কে ভাবে? লোকে মনে করে 'আমি করছি, আমি দিচ্ছি' কিন্তু সকলের মালিক কৃষ্ণ, তিনিই সব ব্যবস্থা করেন। কর্তা বলে—আমিই সকলকে খেতে দিই কিন্তু বন্ধুহীন ব্যক্তি বৃক্ষতলে থেকেও তো খাদ্য পায়। বনের মধ্যে ক্ষুদ্র কীটের আহার যোগায় কে? তবে তুমি ঠাকুর, মিছে এত ভাবনা কর কেন?

এমন সময় এক বৈশ্য দুধ চিনি আটা নিয়ে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়ে বলেন—শোন ব্রাহ্মণঠাকুর, তোমার ওপর প্রভুর কৃপা হয়েছে। স্বপ্নে দেখি তোমার লক্ষ্মীজনার্দন আমার কাছে পায়স খেতে চাইলেন। আদেশ পেয়ে ভোগের সামগ্রী নিয়ে এসেছি, পায়স রেঁধে নারায়ণের ভোগের ব্যবস্থা কর।

বিস্মিত বিপ্র বলেন—এ যে চমৎকার ব্যাপার! কোথা থেকে কেমন ক'রে এ-সব জিনিস এল?

—নারায়ণ নিজেই জুগিয়ে দিয়েছেন, বিস্মিত হ'চ্ছ কেন? মহাপ্রভু বলেন।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে গৌরাঙ্গ কথা বলেন, এদিকে বৈশ্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন গৌরাঙ্গের মুখের দিকে; তাঁর হাবভাবে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও আনন্দের

আভাস। তা দেখে বিপ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—বৈশ্য, তুমি অমন ক'রে কী দেখছ, ভাই?

বৈশ্য বলেন—বড়ই ধাঁধায় পড়েছি, তাই বারেবারে এত ভালো ক'রে সন্ন্যাসীকে দেখছি; স্বপ্নে আমি এঁকেই দেখেছি।

এ-কথা শুনে মহাপ্রভু বৈশ্যকে বলেন—মিছে কেন গণ্ডগোল কর! অলীক স্বপনে তুমি কাকে দেখেছ তা দিয়ে সোরগোল ক'রে লাভ কি? তুমি ভাগ্যবান, তাই প্রভু তোমায় দেখা দিয়েছিলেন। আমি সামান্য সন্ন্যাসী, ভোজনের জন্য এ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়েছি।

বিপ্র বলেন—ও-কথায় আর কি প্রয়োজন। অতিথির সেবার জন্য নারায়ণ নিজেই ভাবেন। এখন তুমি দয়া ক'রে নিজ হাতে পায়স রান্না ক'রে ভোগ লাগাও।

বিপ্রের প্রতি গৌরাঙ্গ প্রসন্ন। স্বহস্তে পায়সান্ন রান্না ক'রে তিনি প্রসাদ বিতরণ করলেন। ব্রাহ্মণের গৃহে আনন্দ-মহোৎসব পড়ে গেল। পরদিন প্রাতে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। পথের মধ্যে সেই বৈশ্য লুকিয়ে মহাপ্রভুর প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। পিছে পিছে সঙ্গে গিয়ে তিনি গৌরাঙ্গের চরণে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তোমায় আমি চিনেছি প্রভু, আর কিছুতেই ছাড়ব না। পদধূলি দিয়ে আমাকে কৃপা কর, ঠাকুর!

বৈশ্যের আগ্রহ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁর কানে একবার সুমধুর হরিনাম উচ্চারণ করলেন। এর পর বৈশ্যের জীবনে এল পরিবর্তন; তিনি আর সংসারের ভোগ-বিলাসের মধ্যে ফিরে গেলেন না। বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে নির্জনে তুলসী-কানন তৈরি ক'রে কৃষ্ণ ধ্যানে, কৃষ্ণনাম জপে মগ্ন হয়ে রইলেন।

* * * *

বৈশ্যকে বিদায় দিয়ে গৌরাঙ্গ নগরের পথ ছেড়ে জঙ্গলময় পথ দিয়া চলতে লাগলেন। দুইদিন কাটল বনপথে; লোকালয় মিলল না, খাদ্যও পাওয়া গেল না। ক্ষুধায় সঙ্গিগণ অস্থির হয়ে পড়েছেন কিন্তু মহাপ্রভু নির্বিকার। সঙ্গীদের তিনি বলেন—হরি যেদিন খাদ্য মিলাবেন সেদিন ভোজ্যবস্তু জুটবে। ছট্‌ফট্‌ ক'রে লাভ কি?

দুদিন পরে জঙ্গল পার হয়ে তাঁরা আমঝোরা নগরে গিয়ে পৌছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা ক'রে সের দুই আটা সংগ্রহ ক'রে আনলেন, ষোলখানা রুটি

তৈরি করা হ'ল চারজনের জন্য। এমন সময় এক ভিখারিণী বালক-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে ভিক্ষা চাইল। মহাপ্রভু তাঁর নিজের ভাগ তুলে দিলেন ভিখারিণীর হাতে, সন্তুষ্ট হয়ে সে চলে গেল; তিনি নিজে অনাহারে সারাদিন যাপন করলেন। রাত্রিতে গোবিন্দ কিছু ফল ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে আসেন; গৌরাঙ্গ তাই গ্রহণ করলেন।

আমঝোরার কাছেই পর্বতবেষ্টিত একটি কুণ্ড, পরিসরে কম কিন্তু অত্যন্ত গভীর; নাম লক্ষ্মণ-কুণ্ড। জনশ্রুতি এই যে, সীতা পিপাসায় কাতর হ'লে লক্ষ্মণ বাণ মেরে এই কুণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। স্থানটি চমৎকার; কুণ্ডের জল স্নিগ্ধশীতল। এই তীর্থে স্নান ক'রে মহাপ্রভু আনন্দে মত্ত হয়ে হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

* * * *

পরদিন গৌরাঙ্গদেব সঙ্গীদের নিয়ে বিন্ধ্যগিরির ওপর মন্দুরা নগরে উপনীত হন। লোকমুখে শুনলেন সেখানে পর্বতের গুহার মধ্যে একজন তপস্বী আছেন। শুনে মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। তপস্বী ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, অতি প্রশান্ত-দর্শন মূর্তি; গলিত সোনার মতো গায়ের রঙ, তা থেকে তেজ বিচ্ছুরিত হয়। হাত-পায়ের নখ দীর্ঘ হয়ে উল্‌টে গেছে, দীর্ঘ সাদা দাড়িতে বুক ঢাকা পড়েছে, দেহ অস্থিচর্মসার, হাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। দেহ বিবস্ত্র; নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, যেন কাঠের মূর্তি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন; তপস্বী ধ্যান ভেঙে চাইলেন। গৌরাঙ্গের চোখে চোখ পড়তেই তপস্বীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ক'রে পর্বত থেকে নেমে মণ্ডলনগরীতে এসে পৌঁছলেন।

মণ্ডল থেকে দেবঘর তিনদিনের পথ। পথ পাষাণময়; বামে বিন্ধ্যগিরি, ডাইনে নর্মদা নদী। দেবঘরে পৌঁছে মহাপ্রভু গ্রামের বাইরে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করলেন। তাঁর অঙ্গশোভায় স্থান যেন আলোময় হয়ে যায়। নবীন সন্ন্যাসীর কথা ক্রমে জানাজানি হয়; দু-চারজন ক'রে লোক আসতে থাকে।

গোবিন্দ ভিক্ষায় গিয়ে কিছু আতপ চাউল নিয়ে আসেন, রামানন্দ ফুল তুলে আনেন, গোবিন্দচরণ সংগ্রহ ক'রে আনেন শুক্‌নো কাঠ। মহাপ্রভু স্নান ক'রে পূজা করলেন, তারপর ভোগ দিয়ে প্রেমাবেশে কীর্তন সুরু করলেন, তার সঙ্গে মধুর নৃত্য। অবশেষে ভাবে বিভোর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন

ধরণীতে। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভাবোন্মত্ততার কথা শুনে বহুলোক গৌরাঙ্গকে দর্শন করতে এসে সমবেত হয়। তার মধ্যে আছেন আদিনারায়ণ নামে এক বণিক। আদিনারায়ণ ধনশালী ব্যক্তি কিন্তু কুষ্ঠগ্রস্ত ব'লে মনে সুখশান্তি নাই। তরুণ সন্ন্যাসীর তেজোময় অঙ্গকান্তি আর অপূর্ব প্রেমভাবের কথা শুনে তিনি-ও এসেছেন সন্ন্যাসীর কৃপাভিক্ষা করতে।

মহাপ্রভুর সম্মুখে এসে কাতরভাবে করজোড়ে রোদন করতে করতে আদিনারায়ণ বলেন—আমাকে নিস্তার করো প্রভু, এই যন্ত্রণা থেকে আমায় উদ্ধার করো দয়াময়।

আদিনারায়ণ ভক্তিমান, বৈষ্ণব। তাঁর প্রতি অনুগ্রহ ক'রে মহাপ্রভু তাঁকে প্রসাদ ভক্ষণ করতে দেন। ভক্তিভরে তিনি প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সেবন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠরোগ দূর হ'ল; নূতন পবিত্র জীবন লাভ করলেন যেন। আদিনারায়ণের এই রোগ-মুক্তির সংবাদ শুনে দলে দলে রোগী আসতে লাগল। এদের হাত এড়ানোর জন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে যাত্রা করার ইঙ্গিত করলেন। খড়ম নিয়ে গোবিন্দ অগ্রসর হন, গৌরাঙ্গ চলেন পিছে পিছে। আদিনারায়ণ মহাপ্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চান না, সন্ন্যাসীর পায়ে আত্ম-সমর্পণ করেন তিনি।

গৌরাঙ্গ বলেন—কৃষ্ণের কৃপায় তুমি রোগমুক্ত হয়েছ, এখন ঘরে গিয়ে ধনসম্পদ ভোগ কর। আমার সঙ্গে চলেছ কেন?

আদিনারায়ণ বলেন—গৃহে আর যাব না, তোমার সঙ্গে দেশে দেশে ফিরব। যদি সঙ্গে না নাও, তবে কুটীর বেঁধে সেখানে জীবন কাটাব।

মহাপ্রভু তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন—তুলসী-কানন ক'রে তুমি সেখানে কৃষ্ণনাম নিয়ে সময় অতিবাহিত করো।

গৌরাঙ্গের চরণ বন্দনা ক'রে আদিনারায়ণ ফিরে যান—মনে তাঁর নূতন জীবনের ভাব-স্পন্দন।

* * * *

দেবঘর থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানীনগর। দুদিন পথ চলে মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে পৌছেন। শিবানীর পূর্বভাগে মলয়পর্বত। মলয়পর্বত দর্শন ক'রে গৌরাঙ্গ চণ্ডীপুর নগরে আসেন। সেখানে চণ্ডীদেবী দর্শন করেন। তারপর এসে পৌছেন রায়পুরে। গৌরাঙ্গের ভাববিহ্বলতার কথা শুনে

দলে দলে লোক আসে তাঁর কণ্ঠে হরিনাম শুনতে। তিনি যেন চলমান আনন্দের উৎস।

রায়পুর থেকে মহাপ্রভু বিদ্যানগরে ফিরে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি বলেন—রায়, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি, আমি আর ভট্ট নীলাচলে গিয়ে হরিনাম ক'রে সাধ মিটাব। তোমার সঙ্গে তত্ত্বকথায় আমি বড় আনন্দ পাই।

রামানন্দ বলেন—প্রভু, আপনি আগে যান; অল্পদিনের মধ্যে আমি এদিকের কাজের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে আপনার পিছে পিছে আসছি।

বিদ্যানগর পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু উত্তরদিকে অগ্রসর হ'লেন। ছয় দিন পথ চলার পর রত্নপুরে উপনীত হন। রত্নপুর ছেড়ে মহানদী; মহানদীর ধার দিয়ে পূর্বমুখে এসে স্বর্ণগড়ে পৌছেন। স্বর্ণগড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার রাজা শান্তীশ্বর পরম ধার্মিক। লোকমুখে সন্ন্যাসীর আগমন-বার্তা শুনে তিনি নিজেই মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন। ভূমিতলে লুটিয়ে প্রণাম ক'রে তিনি জোড়হাত ক'রে অনুনয় করতে থাকেন—সন্ন্যাসী মহাশয়, কৃপা ক'রে আমার গৃহ পদধূলি দিয়ে পবিত্র করুন। আমার গৃহে আজ দয়া ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

মহাপ্রভু নির্বিকার। রাজার অনুরোধের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি গোবিন্দের দিকে তাকান। গোবিন্দ ইঙ্গিত বুঝতে পারেন, ভিক্ষা চান রাজার কাছে। প্রচুর ভিক্ষা-সামগ্রী এনে দিয়ে রাজা অপরাহ্নকাল পর্যন্ত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গৌরাঙ্গ সেখানে বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার পথ-চলা সুরু হয়। সন্ধ্যাকালে সম্বলপুরে উপনীত হয়ে সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সম্বলপুর থেকে ভ্রমরানগরী। এখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। বিষ্ণুরুদ্র নামে এক কৃষ্ণভক্ত উড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ক'রে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। এখানে চারদিন অবস্থান করার পর প্রতাপনগরীতে গিয়ে পৌছেন; তারপর দাসপাল নগর। দাসপাল থেকে রসালকুণ্ড নামক স্থানে গিয়ে সবাই উপনীত হন। এখানে কূর্মদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

রসালকুণ্ডে তিনদিন অবস্থান ক'রে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণনাম-সুধা বিতরণ করলেন। এক মারোয়াড়ী ব্রাহ্মণের বালক-পুত্র মহাপ্রভুর কাছে এসে বিনয় ক'রে বলে—প্রভু, পদধূলি দিয়ে আমার দুঃখ দূর করো। আমি তোমার কাছে ভক্তি

ভিক্ষা চাই। আর আমার পিতা অত্যন্ত কৃষ্ণদ্বেষী, বৈষ্ণব দেখলেই তিরস্কার করেন। দয়া ক'রে তাঁর মনেও ভক্তি সঞ্চার করো, প্রভু।

বালকের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। শ্রীহস্তের স্পর্শে তার অন্তরে ভক্তিভাব জেগে উঠলো। পুত্রের প্রতি সন্ন্যাসীর কৃপার কথা শুনে পিতার মনে রোষ জ্বলে ওঠে। সন্ন্যাসীকে শাস্তি দেবার জন্য সে একখানা লাঠি হাতে নিয়ে এসে হাজির হয়। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে— ওরে ভণ্ড দুরাচার, তুই আমার একমাত্র পুত্রকে নষ্ট করলি! তুই মনে করেছিস্ বালককে ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবি? অনেক সন্ন্যাসী আমি দেখেছি, এইবার তুই আমার কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পাবি; এই লাঠি দিয়ে তোকে প্রহার করবো, দেখি কে তোকে রক্ষা করে।

এইভাবে আস্ফালন ক'রে ক্রোধান্ধ পিতা গৌরাঙ্গকে আঘাত করতে উদ্যত হ'ল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েকজন মারোয়াড়ী ব্রাহ্মণকে পাল্টা প্রহার করার জন্য রুখে দাঁড়াল। মহাপ্রভু তাদের শান্ত ক'রে হেসে ক্রুদ্ধ পিতাকে বলেন—আমাকে মারতে হ'লে হরিনাম করতে হবে। যতবার মুখে হরিনাম করবে ততবার আঘাত করতে পাবে। যদি ক্রোধ ক'রে মারতে চাও তা হ'লেও হরেকৃষ্ণ নাম বল; এই আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি, একবার হরি ব'লে আমায় আঘাত করো।

পিতার আচরণে পুত্র নিজেকে বিব্রত বোধ করে। পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, বলে—প্রভু, আমার পিতার অপরাধ মার্জনা কর, নরক হ'তে তাঁকে উদ্ধার করো—তোমার পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই।

মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে বলেন—তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছ তা পবিত্র হয়েছে। সে বংশে কারো নরকের ভয় নাই।

মারোয়াড়ীকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—তোমার হৃদয় মরুভূমির মতো কঠিন; কৃষ্ণের কৃপায় তা আজ রসাল হোক্। আমাকে মারো তাতে কোন ক্ষতি নাই, শুধু তুমি একবার মুখে হরেকৃষ্ণ বলো।

ব্রাহ্মণের মনে কেমন ভাবান্তর আসে। মহাপ্রভুর কথা শুনে, তাঁর দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে অভিভূত হয়ে কেঁদে ওঠে। আকুল হয়ে রোদন করতে করতে সে গৌরাঙ্গের চরণ জড়িয়ে ধরে বলে—অপরাধ ক'রে আমার মনে বড় ভয় হয়েছে, আমায় ক্ষমা করো দয়াময়। না বুঝে তোমায় কত কথা বলেছি, দণ্ড দাও বা ক্ষমা করো—তোমার যা অভিরুচি।

ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহাপ্রভু তার কর্ণে হরিনাম দান করেন। অনুতপ্ত পিতা অবশেষে গৌরাঙ্গের পদধূলি নিয়ে স্বস্থানে ফেরে।

রসালকুণ্ড পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু ঋষিকুল্যা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে নদীর উভয় তীরে অনেক ঋষি আশ্রম ক'রে থাকেন। তাঁরা সবাই গৌরাঙ্গকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে হরিনাম-কীর্তনে তিন রাত্রি আনন্দে যাপন ক'রে তিনি আলালনাথ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে দিন যাপন করছিলেন। তিনি ফিরে আসছেন শুনে সবাই উল্লাসে মত্ত হয়ে ছুটে চললেন দর্শনের জন্য। অনুরাগভরে গদাধর, মুরারি ছুটে আসেন; খঞ্জন আচার্য খোঁড়া কিন্তু তিনি চলেছেন সকলের আগে আগে, এমনি উৎসাহ। নরহরি নিশান হাতে ক'রে চলেছেন, সার্বভৌম ডঙ্কা বাজিয়ে দলবল নিয়ে আসেন। মহাপ্রভুর পরিকরবৃন্দ ছাড়াও শত শত পণ্ডিত-গোঁসাই, সাধু-সন্ন্যাসী হৃষ্টমনে এসে সমবেত হন। হাজার হাজার লোক গৌরাঙ্গকে ঘিরে আনন্দে নাম-কীর্তন করতে থাকে।

দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে সফর ক'রে মহাপ্রভু পুরীতে ফিরে এসেছেন; তাঁর অনুগামী-জন আনন্দে বিভোর, এ যেন বিজয় অভিযান শেষ ক'রে গৌরব-পতাকা উড়িয়ে প্রত্যাবর্তন। শোভাযাত্রা ক'রে গৌরাঙ্গকে পুরীর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকের হাতে শ্বেত নীল বিচিত্র রঙের শত শত পতাকা, গুরু গুরু শব্দে ডঙ্কা বাজে, মৃদঙ্গের মধুর শব্দের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি। কেউ নাচে, কেউ গান গায়, কেউ বা আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

দুই বৎসর ভ্রমণের পর মাঘ মাসের তৃতীয় দিনে অপরাহ্ণে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মহাপ্রভু পুরীতে ফিরে এসে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এক-দৃষ্টিতে মহাবিষ্ণু দেখতে দেখতে দরদর প্রেমাশ্রু বইতে লাগল, জ্ঞানশূন্য হয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন ধরায়। জটাজুট আলুলায়িত হ'ল, কৌপীন পড়লো খসে; রোমাঞ্চিত দেহ হ'ল কদম্বের মতো, সহস্র ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল। চারিদিকে ভক্তগণের তুমুল হরিধ্বনি। সার্বভৌম গৌরাঙ্গের মূর্ছিত দেহ সযত্নে কোলে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা লাভ ক'রে মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে মহাবিষ্ণু দর্শন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু ফিরে এসেছেন নীলাচলে; ভক্তবৃন্দ যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

## নীলাচলে

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গেলে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের কাছে তাঁর অলৌকিক শক্তি ও অপূর্ব সাত্ত্বিক ভাবের কথা শুনে গৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা নিজেও ভক্তিমান, ঈশ্বরপরায়ণ। সার্বভৌমের মতো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে যিনি মুগ্ধ করেছেন, তিনি যে অসাধারণ পুরুষ হবেন সে-বিষয়ে রাজার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এই অদৃষ্টপূর্ব তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগে তাঁর মন রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন—কবে মহাপ্রভু সফর শেষ ক'রে ফিরে আসবেন, কবে তাঁকে দর্শন ক'রে, তাঁর কৃপালাভ ক'রে নিজের জীবন ধন্য করবেন। মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদ্‌দের বাসের জন্য শ্রীমন্দিরের কাছাকাছি প্রশস্ত কোন স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেবার জন্য সার্বভৌম রাজাকে অনুরোধ জানান। রাজগুরু কাশী মিশ্রের ভবন নির্বাচিত হয়। মহাপ্রভুর অবস্থানের পক্ষে মিশ্র-ভবন সকল দিক দিয়েই উপযোগী।

মহাপ্রভুকে জগন্নাথ-মন্দির থেকে সার্বভৌম পরম সমাদরে নিজগৃহে নিয়ে আদর-আপ্যায়ন ও আতিথ্য করলেন। বিবিধ উপকরণে তাঁকে ভোজন করিয়ে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন; তারপর গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্ত-বৃন্দের কাছে তাঁর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা ক'রে সারারাত্রি অতিবাহিত করলেন। এ বিবরণ যেমন বিচিত্র, তেমনি আনন্দদায়ক।

পরদিন প্রভাতে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁর জন্য নির্ধারিত কাশী মিশ্রের ভবনে নিয়ে যান, বলেন—মহারাজ প্রতাপরুদ্র তোমার জন্য এই বাসা স্থির ক'রে দিয়েছেন। কাশী মিশ্র নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। তাঁর গৃহ পবিত্র হবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলিতে; মহাপ্রভুর সম্মুখে মাটিতে দীঘল হয়ে প'ড়ে তিনি প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গ তাঁকে সাদরে তুলে আলিঙ্গন দেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গেলে তাঁর কথা শুনে নীলাচলবাসী ভক্তগণ তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাঁর দর্শনের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তিনি ফিরে এসেছেন এ-খবর সকলেই শুনেছেন। এখন ভক্তগণ এবং জগন্নাথের সেবকগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সার্বভৌমকে অনুরোধ করতে লাগলেন। সার্বভৌম তাঁদের নিয়ে

কাশী মিশ্রের ভবনে গিয়ে প্রভুর কাছে তাঁদের পক্ষ হয়ে অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। তাঁরা একে একে মহাপ্রভুর পদতলে লুটিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন, গৌরাঙ্গ তাঁদের প্রত্যেককে দিলেন আলিঙ্গন। এঁদের মধ্যে আছেন জগন্নাথ-সেবক জনার্দন, স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখন-অধিকারী শিখি মাহিতী, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, জগন্নাথের প্রধান পাচক মুরারি মাহিতী, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ। সার্বভৌম এঁদের সকলের পরিচয় দিলেন। এমন সময় রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্রসহ মহাপ্রভুর সমীপে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। সার্বভৌম বলেন —ইনি ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায় এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে ভবানন্দকে আলিঙ্গন করেন, বলেন—রামানন্দের মতো যাঁর পুত্র তিনি বড়ই ভাগ্যবান। তুমি যেন সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডবের তুল্য।

ভবানন্দ কুণ্ঠিত হয়ে বলেন—আমি শূদ্র বিষয়ী অধম। আমার পঞ্চপুত্র-সহ নিজেকে এবং আমার সব-কিছু তোমার চরণে সমর্পণ করলেম। আমার কনিষ্ঠ পুত্র বাণীনাথ তোমার কিঙ্করক্ষপে এখানে থাকবে, তোমার যা ইচ্ছা তা·এ পালন করবে। আত্মীয় জ্ঞান ক'রে অসঙ্কোচে একে গ্রহণ করো।

মহাপ্রভু বলেন—সঙ্কোচ কিসের, তুমি তো পর নও।

ভবানন্দ প্রভু-দর্শন ক'রে ফিরে আসেন; বাণীনাথ সেবার জন্য নিযুক্ত হয়ে সেখানে রয়ে গেলেন।

* * * *

মহাপ্রভু যে দক্ষিণ ভারতে গমন করেছেন, সে-কথা নবদ্বীপের অধিবাসীরা শুনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর শচীমাতা এবং ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিবার জন্য নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ গোবিন্দকে পাঠানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। গৌরাঙ্গের অনুমতি নিয়ে গোবিন্দ চললেন নবদ্বীপ অভিমুখে। নবদ্বীপে উপনীত হয়ে শচীমাতাকে প্রণাম ক'রে গৌরাঙ্গের-দেওয়া মহাপ্রসাদ তাঁর হাতে দেন। প্রসাদের ভিতর দিয়ে মাতা পুত্রের স্পর্শ অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন, গৃহত্যাগ ক'রে গেলেও নিমাই তাঁর স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেন নি। ভক্তবৃন্দের মধ্যে আনন্দের সাড়া প'ড়ে যায়; তাঁরা নীলাচলে যাবেন তাঁদের প্রাণের গৌরাঙ্গকে দর্শন করতে। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীধর, দামোদর প্রভৃতি

শচীমাতার অনুমতি নিয়ে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করার আয়োজন করতে লাগলেন।

এই সময়ে দক্ষিণ-দেশ থেকে পরমানন্দপুরী নামে একজন সন্ন্যাসী গঙ্গা-তীরে এসে শচীদেবীর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে এসেছেন শুনে তিনি অবিলম্বে তাঁর দর্শনের জন্য কমলাকান্ত নামে একজন গৌরাঙ্গ-ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচল যাত্রা করলেন। গৌরাঙ্গকে পুরী-সন্ন্যাসী পূর্বে দেখেননি কিন্তু তাঁর ভক্তি-ভাবাবেশের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নীলাচলে পৌঁছে জগন্নাথ-মন্দির দেখেও গৌরাঙ্গের প্রতি তন্ময়-তার জন্য প্রণাম করতে ভুলে গেছেন। পরে অনুশোচনা হওয়ায় ফিরে মন্দির সম্মুখে এসে জগন্নাথদেবকে করজোড়ে বলেন—প্রভু, তুমি অন্তর্যামী। গৌরাঙ্গ-দর্শনের উৎকণ্ঠায় আমি তোমাকেও প্রণাম করতে ভুলে গেছি; আমার অপরাধ ক্ষমা করো, প্রভু।

মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। দেখেন বহুলোক-বেষ্টিত অতি সুদর্শন এক তরুণ সন্ন্যাসী; এমন অপরূপ শ্রী কখনো যে মানুষের হ'তে পারে তা তাঁর ধারণার অতীত। ভাবলেন—ইনিই নিশ্চয় শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়ালেন। কমলাকান্ত তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—ইনি পরমানন্দপুরী। মহাপ্রভু এঁকে প্রণাম করলেন, পুরী-গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আলিঙ্গন দিলেন। বললেন—আমি তোমার কাছে থাকব ব'লে এসেছি। তোমার সন্ধানে নবদ্বীপে গিয়ে আমি শচীমাতার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেছি। তুমি এখানে ফিরে এসেছ শুনে অধীর হয়ে ছুটে এলাম।

মহাপ্রভুর বাসস্থানে পুরী-গোস্বামীর জন্য একখানি ঘর এবং সেবার জন্য একজন অনুচর নিযুক্ত ক'রে দিয়ে গৌরাঙ্গ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন।

নবদ্বীপ থেকে গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁর নূতন অনুরাগী। পুরুষোত্তম আচার্য। নবদ্বীপে মহাপ্রভু যখন প্রেমের বন্যায় সকলকে ভাসিয়েছেন, তখন ইনি নীরবে, গোপনে ভজন-সাধনে রত ছিলেন। গৌরাঙ্গ সংসারত্যাগ ক'রে নীলাচলে চলে এলে ইনি বারাণসীতে চৈতনানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। গুরু আদেশ দিলেন, বেদান্ত পাঠ করতে কিন্তু জ্ঞানমার্গের চেয়ে ভক্তিপথ তাঁকে

আকৃষ্ট করলো, শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠে তিনি নিমগ্ন হলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করলেন না। নিজ-স্বরূপেই অর্থাৎ পূর্ব-অবস্থাতেই রইলেন ব'লে তাঁর নাম হ'ল 'স্বরূপ'। স্বরূপ-দামোদর গুরুর আজ্ঞা নিয়ে কৃষ্ণভজনের জন্য নীলাচলে এলেন। গভীর পাণ্ডিত্য কিন্তু মুখে তাঁর কথা নাই; কৃষ্ণরসতত্ত্ববিদ্। সঙ্গীতে গন্ধর্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য; কৃষ্ণ-প্রেমের উৎসস্বরূপ।

দামোদর মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম ক'রে শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন :

> হে শ্রীচৈতন্যদেব, হে দয়ার সাগর, তোমার যে মাধুর্য সর্বদুঃখ দূরীভূত করে, যা নির্মল, যা আনন্দ দান করে, যা চিত্তে উন্মাদনাময় ভাব জাগায়, যা সর্বদা ভক্তিসুখ প্রদান করে এবং যা মদ-নামক ভাবের সঙ্গে বিদ্যমান, সেই অপূর্ব মাধুর্যে পরিপূর্ণ হওয়ায় তোমার যে দয়া সমধিক উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়, সেই দয়া আমার প্রতি বর্ষিত হোক্।

মহাপ্রভু সাদরে দামোদরকে তুলে আলিঙ্গন দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাবেশে দুজনেই অচেতন হয়ে পড়লেন মাটিতে। কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে গৌরাঙ্গ বললেন—তুমি যে আসবে তা আমি আজ স্বপ্নে দেখেছি। ভাল হ'ল—অন্ধ যেন দুই চোখ পেলাম।

দামোদর কুণ্ঠিত হয়ে বলেন—প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা করো। তোমার চরণে আমার প্রেমলেশ নাই, তোমাকে ছেড়ে আমি গেলাম অন্যত্র। আমি পাপী, তাই অন্য দেশে গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে ছেড়েছিলাম কিন্তু তুমি কৃপাময়, তুমি ছাড়নি; কৃপারজ্জু গলায় বেঁধে টেনে এনেছ তোমার চরণে।

এই সময় থেকে মহাপ্রভুর সেবা-যত্নের দায়িত্ব দামোদর স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিলেন। যত্ন-পরিচর্যায় মায়ের মতো। অফুরন্ত প্রীতি ও গভীর প্রেমের আবেষ্টনীতে তিনি গৌরাঙ্গকে ঘিরে রাখেন।

* * * *

কাশী মিশ্রের ভবনে মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ-দল নিয়ে কৃষ্ণকথায় রত আছেন। মুকুন্দ দ্বার-রক্ষক। এই সময় ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরাঙ্গকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-মন্ত্রদাতা কেশব ভারতী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী এক গুরুর শিষ্য। মুকুন্দ গিয়ে ব্রহ্মানন্দের আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করতেই গৌরাঙ্গ নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা

করতে এলেন দরজায় ; সঙ্গে তাঁর ভক্তবৃন্দ। ব্রহ্মানন্দ চর্মাম্বর পরিধান ক'রে এসেছেন। এতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দকে যেন দেখতে পাননি এমনি ভান ক'রে মুকুন্দকে বললেন—ভারতী গোঁসাই কই ?

মুকুন্দ সসম্ভ্রমে বলেন—ওই তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

গৌরাঙ্গ বলেন—মুকুন্দ, তুমি কি অজ্ঞান! ভারতী গোঁসাই জীবচর্ম পরিধান করবেন কেন ?

ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মহিমার কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে এসেছেন কিন্তু চর্মাম্বর পরিধানের দম্ভটুকু ছাড়তে পারেননি। মহাপ্রভুর পরোক্ষ ভৎর্সনায় লজ্জায় তিনি ম্রিয়মাণ হয়েছেন। মনে মনে বলছেন—খুব শিক্ষা হয়েছে। ক্ষমা করো প্রভু, এখুনি আমি চর্মাম্বর পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত।

গৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে গদাধর কৌপীন ও বহির্বাস এনে ভারতীর হাতে দেন ; লজ্জা নিবারণের উপায় পেলেন যেন তিনি। কৌপীন পরিধান করা হ'লে মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করেন, তিনি ভীত হয়ে আলিঙ্গন দিয়ে বলেন—প্রভু, আপনি অপরের শিক্ষার জন্য গুরুজনকে প্রণাম ক'রে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন কিন্তু আমার নিবেদন আমাকে আর কখনও এমন করবেন না, এতে আমি বড় ভয় পাই।

ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন পরিচ্ছদের দম্ভ ভক্তিপথের অনুকূল নয়। মহাপ্রভু পরোক্ষ তিরস্কারে এই শিক্ষাই দিলেন। ভক্তিতে মন হয় কোমল ; দম্ভ মনকে করে নীরস কঠিন।

উড়িষ্যার রাজধানী কটক। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে নানা রাজকীয় কাজে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মন প'ড়ে রয়েছে নীলাচলে। গৌরাঙ্গ-দর্শনের জন্য তিনি আকুল হয়েছেন। সার্বভৌমের প্রতি তিনি কৃপা করেছেন, তাঁর প্রজাবৃন্দ মহাপ্রভুর কৃপালাভে ধন্য হ'ল কিন্তু তিনি এখনো বঞ্চিত। গৌরাঙ্গ দক্ষিণ-সফর শেষ ক'রে ফিরে এসেছেন জেনে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। সার্বভৌমকে চিঠি দিয়ে জানতে চান—আমার ব্যবস্থা কি হ'ল ? মহাপ্রভু আমাকে দর্শন দেবেন কবে ? পাপী উদ্ধার করতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ; তিনি আর সকলকেই উদ্ধার করবেন, কেবল আমিই বাদ থাকব ? আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত ; আমি তাঁর শরণাগত ; তবু কি তাঁর দয়া হবে না ?

রাজার কাতরতা দেখে সার্বভৌম নিজেকে অসহায় মনে করেন। অগত্যা মনে মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে মহাপ্রভুর কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে। বিনীতভাবে জোড়হাত ক'রে বলেন—প্রভু, একটি নিবেদন আছে, যদি অভয় দাও, তবে বলি।

মহাপ্রভু বলেন—বলো, যদি যোগ্য হয় করবো, আর অযোগ্য হ'লে করবো না।

—রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার দর্শনের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমার কাছে বহু অনুনয়-বিনয় করেছেন তোমার কৃপাভিক্ষা করার জন্য। দয়া ক'রে তাঁকে একবার দর্শন দাও, এই আমার প্রার্থনা।

কথা শুনেই মহাপ্রভু কানে হাত দিয়ে নারায়ণ স্মরণ করেন, বলেন—সার্বভৌম, এরূপ অযোগ্য বচন কেন বল? সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষ-ভক্ষণের তুল্য।

সার্বভৌম উত্তর করেন—এ কথা সত্য; তবে রাজা জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোত্তম।

গৌরাঙ্গ বলেন—তথাপি রাজা ও নারী উভয়ই সন্ন্যাসীর পক্ষে কালসর্পাকার। বিষয়ী ব্যক্তি বা স্ত্রীর মূর্তি পর্যন্ত ভিক্ষুকের দর্শন করা উচিত নয়। তুমি কি আমাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ করতে পরামর্শ দাও? এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না। তা সত্ত্বেও যদি এমনি অনুরোধ করো, তবে আমাকে শ্রীক্ষেত্র ছাড়তে হবে।

ভক্তগণ অনুভব করেন যে, নিয়ম-রক্ষায় মহাপ্রভু অনমনীয়। সার্বভৌম রাজাকে সমস্ত বিষয় লিখে জানান এবং এ আশ্বাস-ও দেন যে, মহাপ্রভু ভক্তবৎসল; তাঁর যদি একান্ত ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁরই রাজ্যে অবস্থান ক'রে গৌরাঙ্গ তাঁকে দর্শন পর্যন্ত দিতে রাজী নন। সার্বভৌমের চিঠিতে মহারাজ এ-কথা জানতে পারেন। কিন্তু এতে তাঁর অহমিকা বা মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য আরো বেশী আকুল হয়ে ওঠেন। তিনি বিষয়ী, তিনি ঐশ্বর্যশালী, তিনি প্রজাপালক, তিনি সংসারে লিপ্ত। তবু ভগবদ্ভক্তির যে প্রবাহ তাঁর অন্তরে ফল্গুর ধারার মতো বয়ে চলেছে, তার উন্মাদনায় তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গ কামনা করেন। জাগতিক বিষয়-সম্পদই

যদি তাঁর পথের অন্তরায় হয়, তবে তিনি তা পরিত্যাগ ক'রে কানে কুণ্ডল ধারণ ক'রে যোগিবেশে গৃহত্যাগ করতে সঙ্কল্প করলেন। তাঁর মনের আকুলতা এবং তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ না হ'লে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা সার্বভৌমকে জানালেন।



এক পক্ষ কঠোর; অন্য পক্ষ বিগলিত, নাছোড়বান্দা। মিলনের মধ্যস্থ হলেন সার্বভৌম। কিন্তু সার্বভৌম মহাপ্রভুর কাছে রাজার কথা আর উত্থাপন করার সাহস পান না। অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করেন। অবশেষে স্থির হয় যে, নিত্যানন্দ ভিন্ন প্রভুর মন কোমল করানোর সাধ্য আর কারো নাই। নিত্যানন্দকে-ও ইতস্ততঃ করতে দেখে সার্বভৌম বলেন—চলো, তবে আমরা সকলে মিলেই যাই; প্রভুর কাছে রাজার ভক্তি-ভাবের কথা বর্ণনা করি, তাঁকে দর্শন দেওয়ার কথা মুখ ফুটে নাই-বা বললেম।

ভক্তবৃন্দ নীরবে গিয়ে মহাপ্রভুকে ঘিরে বসেন। তাঁদের ভাব দেখেই গৌরাঙ্গ বুঝতে পারেন তাঁদের কোন অভিপ্রায় আছে। মুখ তুলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নিত্যানন্দের মুখের ওপর। নিতাই বলেন—তোমাকে বলার কথা নয় কিন্তু না বললে-ও চলে না; তাই তোমাকে জানাতে এসেছি। রাজা তোমার চরণ-দর্শনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি সার্বভৌমকে যে চিঠি লিখেছেন তা পাঠ ক'রে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, তোমার চরণ-দর্শনে বঞ্চিত হ'লে তিনি রাজ্যভার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবেন। তোমার চরণ-দর্শনই এখন তাঁর একমাত্র অভীষ্ট।



গৌরাঙ্গের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে, কণ্ঠে ব্যঙ্গের আভাষ। নিত্যানন্দকে বলেন—আমাকে কটকে নিয়ে যাওয়াই কি তোমাদের অভিপ্রায়? তোমরা কি মনে করো, এতে তোমাদের ভালো হবে? লোকে কি বলবে? দামোদর পর্যন্ত নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করার জন্য আমার নিন্দা করবে। তোমরা দামোদরের মত করাও দেখি, তার অনুমতি হ'লে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

নিত্যানন্দ বিনয় ক'রে বলেন—তোমাকে রাজ-দর্শন করতে বলে এমন সাধ্য কারো নাই। তবে রাজা যখন তোমার কৃপা না পেলে প্রাণত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প, এরূপ অবস্থায় তোমার কৃপাচিহ্ন-স্বরূপ তোমার একখানা বহির্বাস রাজার কাছে পাঠাতে অনুমতি দাও।

দামোদর বলেন—প্রভু, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি তোমাকে বিধি দেব কেমন ক'রে! তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে তোমার ওপর যদি রাজার অকপট ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমার কৃপা লাভ করবেন।

ভক্তদের অনুরোধে মহাপ্রভু কিছুটা কোমল হয়েছেন, বলেন—তোমরা যদি বহির্বাস পাঠাতে চাও, তাতে আমার আপত্তি নাই।

বহির্বাস পাঠানো হয় রাজার কাছে। তাঁর প্রতি অনুগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। ভক্তিভরে বহির্বাসখানি মাথায় স্থাপন ক'রে রাজা নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। নদী যেমন পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগর অভিমুখে প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ আয়তনে বাড়তে থাকে, রাজার প্রেম-আর্তিও তেমনি ক্রমশঃ প্রবল হ'তে লাগল। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপালাভ না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নাই।

এই সময়ে রামানন্দ রায় কটকে পৌঁছে রাজার কাছে কার্য থেকে অবসর প্রার্থনা করলেন। রামানন্দ বিশ্বস্ত, যোগ্য কর্মচারী। তাঁর ওপর এক অঞ্চলের শাসন-ভার অর্পণ ক'রে রাজা নিশ্চিন্ত ছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখন রাজকার্য থেকে অবসর কামনা করো কেন?

রামানন্দ উত্তর দেন—বিষয়-সংস্রবে আর থাকব না স্থির করেছি; মহাপ্রভুর চরণ-সেবায় নিযুক্ত হ'তে চাই। দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণে গেলে তাঁর কৃপাস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁর সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছুই কাম্য নাই আমার।

রামানন্দ পরম বিচক্ষণ, রসিক ভক্ত। মহাপ্রভুর প্রেমাকর্ষণে তিনি জাগতিক সম্পদ, প্রতিপত্তি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন দেখে রাজা মুগ্ধ হন। বলেন—তুমি ভাগ্যবান, তুমি ধন্য, তুমি প্রভুর কৃপালাভ করেছ। আমি ছার, আমি তাঁর কৃপা পাওয়ার যোগ্য নই। প্রভুকে আমি যাতে দর্শন করতে পারি তুমি তার জন্য একটু চেষ্টা ক'রো।

রামানন্দ বলেন—মহাপ্রভু ভক্তবৎসল। প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হ'লে তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা রামানন্দের ধর্মানুরাগে প্রসন্ন হয়ে বলেন—তোমার পূর্ব বেতনের দ্বিগুণ অর্থ এখন থেকে তোমাকে নিয়মিত দেওয়া হবে; তুমি অবসর নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর ভজনা কর।

*   *   *   *

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বিষয়-পরিচালনার দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হয়ে রামানন্দ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু আস্বাদনের নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ এখন আসবে; আনন্দিত মনে তিনি ছুটে চলেন মহাপ্রভুর কাছে। জগন্নাথ-মন্দিরের কথা, তাঁর পিতা ও ভাইদের কথা মনে পড়েনি। তিনি সোজা চলে এসেছেন গৌরাঙ্গের সম্মুখে। এসে প্রণাম করতেই মহাপ্রভু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর উভয়ে গলাগলি ক'রে রোদন। নিত্যানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণের কাছে রামানন্দ অপরিচিত। তাঁর সঙ্গে গৌরাঙ্গের আত্মীয়তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন।

রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলেন—প্রভু, আমি বিষয়-মুক্ত হয়ে এসেছি। রাজার কাছে গিয়ে আমার অভিপ্রায় জানাতেই তিনি সানন্দে আমাকে রেহাই তো দিলেনই, বেতনের দ্বিগুণ ভাতাস্বরূপ দেবার ব্যবস্থা করলেন যাতে আমি নিরুদ্বেগে তোমার চরণ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারি। তোমার প্রতি তাঁর যে প্রেমভক্তি দেখলাম, তার কণামাত্র-ও আমার নাই।

রাজার ব্যবহারে মহাপ্রভু মনে মনে খুশি হন, বলেন—তুমি প্রধান কৃষ্ণভক্ত। তোমাকে যে আনুকূল্য করে, সেই ভাগ্যবান। রাজার যখন তোমার ওপর এমন প্রীতি, তখন তিনি অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপাভাজন হবেন।

পুরীতে আগমন-প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—জগন্নাথ দর্শন ক'রে এসেছ তো?

—না, আমার শ্রীমুখ-দর্শন হয়নি, রামানন্দ উত্তর দেন।

মহাপ্রভু বলেন—সে কি! শ্রীক্ষেত্রে এসে দেবতা দর্শন না ক'রেই এখানে চলে এসেছ! অন্যায় করেছ।

রামানন্দ উত্তর দেন—প্রভু, চরণ রথ, হৃদয় সারথি। সারথি যেদিকে নিয়ে যায় দেহ সেই দিকেই যায়। মন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, অন্য চিন্তা মনে ওঠেনি।

মহাপ্রভু তাঁকে জগন্নাথ দর্শন ক'রে পিতা ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

*   *   *   *

রথযাত্রার আগে রাজা পুরীতে এসেছেন। মহাপ্রভুর দর্শন এখনও তিনি লাভ করেননি। সার্বভৌম ও রামানন্দ প্রতিদিন বহুক্ষণ মহাপ্রভুর নিকটে

থাকেন। তাঁদের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হ'লেই জিজ্ঞাসা করেন—আমার ব্যবস্থা কি হ'ল? আর কত দেরী?

সার্বভৌম রাজার কাতরতা উপলব্ধি করেন, মলিনমুখে বলেন—এখনও প্রভুর অনুমতি হয়নি।

রাজার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। বলেন—এত লোক তাঁর কৃপায় ধন্য হ'ল, তিনি বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রতাপরুদ্র ছাড়া অন্য সকলের ওপর কৃপা বর্ষণ করবেন! আমি-ও প্রতিজ্ঞা করছি, আমাকে দর্শন না দিলে এ-জীবন আমি রাখব না।

সার্বভৌম ও রামানন্দ উভয়েই রাজাকে আশ্বাস দেন—আপনার যেমন দৃঢ় নিষ্ঠা ও সঙ্কল্প আপনার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে, তবে হয়ত কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

রামানন্দ একদিন মহাপ্রভুকে বললেন—প্রভু, রাজার সঙ্গে দেখা করা যে সমস্যা হয়ে উঠলো। তোমার দর্শনের জন্য তাঁর আকুলতা দেখে ব্যথায় মন ভরে যায়। কেবল বলেন—আর কত দেরী! পাগলের মতো হয়েছেন, দর্শন না পেলে তিনি বুঝি বাঁচবেন না।

গৌরাঙ্গ বললেন—দেখ, রাজার কথা শুনে আমারও দুঃখ হয় কিন্তু নিয়ম-বিরোধী কাজ করি কেমন ক'রে, বলো?

রামানন্দ রাজার পক্ষ সমর্থন ক'রে বলেন—রাজা তোমার ভক্ত, তাঁর কায়মন তোমাতেই সমর্পণ করেছেন। ভক্তকে দুঃখ দেওয়া উচিত কিনা তুমিই বিচার ক'রে দেখ।

গৌরাঙ্গ তখন বললেন—আচ্ছা, এক কাজ কর। শাস্ত্রে বলে—আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। নিজের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। রাজার পুত্রের সঙ্গে মিলিত হ'লে তাঁরই সঙ্গে মিলন হ'ল। তুমি বরং রাজাকে ব'লে রাজ-পুত্রকে নিয়ে এস।

রামানন্দ আনন্দিত মনে রাজাকে সব কথা ব'লে রাজকুমারকে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে আসেন। কিশোর বয়স, শ্যামলসুন্দর আকৃতি, লম্বা টানা-টানা চোখ, পরণে পীতবসন, দেহে রত্ন আভরণ। রাজকুমারকে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ণস্মৃতি জেগে ওঠে। প্রেমাবেশে তিনি রাজপুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। গৌরাঙ্গের স্পর্শে রাজপুত্র পুলকে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। তাঁকে শান্ত ক'রে মহাপ্রভু বলেন—তুমি প্রতিদিন আমার কাছে এসো।

রাজকুমার যখন রাজভবনে ফিরে যান, তখন তাঁর দেহ-মনে মহাপ্রভুর স্পর্শসঞ্জাত আনন্দ তরঙ্গিত হচ্ছে। আবেগভরে রাজা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং তার ভিতর দিয়ে গৌরাঙ্গের দেবতনুর স্পর্শ যেন অনুভব করেন। চন্দনবনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হাওয়ায় চন্দনের সুবাস ভেসে আসে; সে হাওয়ায় অন্য সাধারণ গাছ-ও চন্দনগন্ধী হয়ে যায়। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে যেন মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্নিগ্ধতা ও সৌরভের আস্বাদন করেন। গৌরাঙ্গ-দর্শনের জন্য তাঁর আকুলতা আরো বেড়ে ওঠে।

রথযাত্রার সময় সমাগত। মহাপ্রভুর বাঙালী ভক্তগণ নবদ্বীপ থেকে পুরীতে এসে সমবেত হয়েছেন। তাঁরা সবাই প্রফুল্ল। গৌরাঙ্গও নিজের অনুরাগী-জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত। রথযাত্রার সময় ভক্তদের নিয়ে কোন সেবাকার্যে রত হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন মনে মনে। একদিন কাশী মিশ্রের ভবনে মহাপ্রভু সার্বভৌম, কাশী মিশ্র এবং প্রধান পরিছার নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হাসিমুখে বললেন—গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনের ভার আমার ওপর দাও, তোমাদের কাছে এই আমার নিবেদন।

পরিছা বলেন—আমরা সব তোমার সেবক। তোমার যা ইচ্ছা তাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষ ক'রে রাজার আজ্ঞা হয়েছে—প্রভু যা ইচ্ছা করবেন শীঘ্রই তা করতে হবে। মন্দির-মার্জন তোমার যোগ্য সেবা নয়, তবু তোমার যা অভিরুচি তাই হবে।

গৌরাঙ্গের অনুমতি নিয়ে পরিছা একশত ঘট এবং কয়েক শত নূতন সম্মার্জনী এনে হাজির করলেন। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা-মন্দিরে এসে নয় দিন অবস্থান করেন। তারপর সারা বৎসর তা খালি প'ড়ে থাকে; তাই সেখানে ধূলাবালি জঞ্জাল জমে। ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সমগ্র মন্দির, সিঁড়ি, দেওয়াল, প্রাঙ্গণ ধুয়ে ঝাঁট দিয়ে মুছে তকৃতকে ঝকৃঝকে ক'রে ফেললেন। প্রেম ও প্রীতিতে হৃদয় যেখানে ভরপূর সেখানে কোন কাজই হেয় মনে হয় না। প্রিয়জনের সেবায় ক্লান্তি নাই, আছে আত্মসুখের উপলব্ধি।

* * * *

রথযাত্রার পূর্বে রাজা পুরীতে এসেছেন। এবার গৌরাঙ্গ প্রথম রথযাত্রা দর্শন করবেন; তাই রাজার আদেশে বিশেষ সজ্জার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র রথখানিকে দূর থেকে স্বর্ণমণ্ডিত মনে হয়। রথের প্রতি চূড়ায় লাল নীল

হলদে প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের নিশান ; প্রতি চূড়ায় একটি ক'রে ঘণ্টা বাঁধা। যে পথ দিয়ে রথ টানা হবে তার উভয় পাশে ফুলের বাগান। বেল, মল্লিকা, যূথী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পে স্থান সুরভিত। রাজা নিজে স্বর্ণময় সম্মার্জনী হাতে নিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে চন্দনজলের ছিটা দিচ্ছেন। রথে মহাপ্রভু অংশগ্রহণ করবেন, রথ টেনে নেওয়ার সময় তিনি কীর্তন করতে করতে সঙ্গে চলবেন—এ চিন্তাতেও রাজা পুলকিত।

রথে দেব-বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে। পথ লোকে লোকারণ্য। মহাপ্রভু তাঁর কীর্তনে সঙ্গীদের সাতটি দলে ভাগ ক'রে দিয়েছেন—চার দল রথের আগে, দুই দল রথের দুই পাশে, এক দল পিছনে। প্রতি দলে ছয়জন ক'রে গাইয়ে, দুইটি ক'রে মাদল। গৌরাঙ্গ স্বয়ং ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দলে যোগদান করছেন। কীর্তনকারীদের অঙ্গ চন্দনে লেপিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য। মহাপ্রভুর হাতে জপমালা।

একসঙ্গে সাত দলে চৌদ্দ মাদল বেজে ওঠে, সুকণ্ঠে গীত কীর্তন আর মধুর নৃত্য চলতে থাকে। জনগণের সম্মিলিত আকর্ষণে রথ এগিয়ে চলে। গৌরাঙ্গ প্রেমে বিভোর। উদ্দাম নৃত্য করতে করতে কখনো আছাড় খেয়ে পড়েন ; অঙ্গে কদম্বকেশরের মতো পুলক-রোমাঞ্চ, অশ্রুধারা ছুটে পিচকারির মতো। মহাপ্রভু ঘুরে ঘুরে নাচেন আর তাঁর চারিধারের লোক তাঁর অশ্রুবর্ষণে সিঞ্চিত হয়। একবার চলমান রথের চাকার সামনে পড়েন মূর্ছিত হয়ে। একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি তুলে সরিয়ে নেন, একটু দেরী হ'লে চাকা উঠতো বুকের ওপর।

মূর্ছা ভঙ্গ হ'লেই আবার নৃত্য। পথে লক্ষ লোকের সমাবেশ ; সকলেরই দৃষ্টি গৌরাঙ্গের ওপর। রাজা দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুকে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর সুমনোহর অঙ্গকান্তি, অপূর্ব সৌষ্ঠবময় দেহ, মধুর নৃত্য ও প্রেমাবেশ দেখে রাজা আত্মহারা হয়েছেন। দর্শন ক'রে যেন চোখের তৃষ্ণা মেটে না। এক সময় রাজার সম্মুখে এসে মহাপ্রভুকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছেন শ্রীবাস। শ্রীবাস স্থূলদেহ। রাজা ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছেন না। রাজার অমাত্য হরিচন্দন শ্রীবাসকে এক পাশে ঠেলে দিলেন যাতে রাজা ভালভাবে দেখতে পান। শ্রীবাস প্রেমে বিভোর, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই ; আবার সরে এসে রাজার সম্মুখে দাঁড়ান। অবশেষে বিরক্ত হয়ে হরিচন্দন জোর ক'রে শ্রীবাসকে সেখান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলেন। শ্রীবাস অমনি তাঁর গালে ঠাস্

ক'রে এক চড় ক'ষে দিলেন। রাজার সম্মুখে রাজার অমাত্যের অপমান! হরিচন্দন শ্রীবাসকে উচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন মহাপ্রভুর ভাবে মুগ্ধ, বলেন—হরিচন্দন, করো কি! উনি যে মহাপ্রভুর গণ। তোমার ভাগ্য ভালো ওঁর হাতের প্রসাদ পেয়েছ; আমি পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেম। ক্ষুব্ধ হরিচন্দন নীরবে মনের ক্রোধ মনেই চেপে রাখেন।

গৌরাঙ্গ নৃত্য করছেন। বিভিন্ন কীর্তনের দলে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছেন। একবার রাজার সামনে প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন পথের ওপর। এমন সুকোমল সুদর্শন তনু লুটিয়ে পড়ে শক্ত মাটির ওপর, দেখে রাজার মন ব্যথায় ভ'রে যায়। তিনি এগিয়ে গিয়ে মহাপ্রভুকে ধরেন। ভাবাবেশের সময় মহাপ্রভুর দেহ থেকে স্নিগ্ধ জ্যোতি নির্গত হতে' থাকে, সর্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত। এরূপ অবস্থায় নিত্যানন্দ ও স্বরূপ ছাড়া অন্য কেহ তাঁকে স্পর্শ করতে সাহসী হন না। রাজার সে-সব বিষয় জানা নাই; গৌরাঙ্গের প্রতি নিবিড় আকর্ষণবশতঃ তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে সেবার জন্য তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর মূর্ছা ভঙ্গ হ'ল, চোখ মেলে তাকিয়েই বললেন—এ কি হ'ল! এমন হ'ল কেন? নিশ্চয়ই আমাকে কোন বিষয়ী লোক স্পর্শ করেছে।

এই কথা ব'লে মহাপ্রভু অন্য দলে গিয়ে আবার নৃত্য সুরু করলেন। রাজার মন দুঃখে জ্বলে যেতে লাগল। মহাপ্রভু তাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি তো করলেনই না, তাঁর স্পর্শে প্রেমাবেশ ভঙ্গ হওয়ায় কষ্ট পেলেন। রাজা রোদন করতে করতে পাশে দণ্ডায়মান রামানন্দ ও সার্বভৌমকে বলেন—আমার ভাগ্যে যখন প্রভুর কৃপা নাই, তখন আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি?

সার্বভৌম রাজাকে সান্ত্বনা দেন; আশ্বাস দেন যে, তাঁর ভক্তি ও ধৈর্য নিশ্চয়ই সফল হবে। মহাপ্রভু এখন উদ্দাম নৃত্যের পরিবর্তে মধুর লীলায়িত নৃত্য আরম্ভ করলেন। রথে উপবিষ্ট কৃষ্ণমূর্তির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে তিনি কখনো নাচতে নাচতে এগিয়ে আসেন, আবার কখনো পিছিয়ে যান। নিজেকে মনে করেন শ্রীরাধিকা; হাতের জপমালা যেন মালতীর মালা। কৃষ্ণের গলায় মালা পরাণোর বাসনা হয় মনে, জপমালাগাছি আঙুলে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেন। মালা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে রথের ওপরকার কৃষ্ণের মূর্তির গলা বেষ্টন ক'রে পড়ে। অমনি লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। জগন্নাথের পাণ্ডারা সেই মালা এনে মহাপ্রভুর হাতে দেন।

আবার মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে লীলায়িত ভঙ্গীতে মালা নিক্ষেপ করেন কৃষ্ণের গলদেশে। এমনিভাবে নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে রথ এগিয়ে চলে। ভাবের গাঢ়তায় গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গন করেন, ঘন ঘন মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এইভাবে রাজার সম্মুখে আবার তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অভিমান ভুলে, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে রাজা আবার গৌরাঙ্গের পদযুগল নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে পদসেবা করতে লাগলেন। এবার বিষয়ীর স্পর্শে মহাপ্রভুর মূর্ছা ভঙ্গ হ'ল না। রাজা যেন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে গৌরাঙ্গ উঠে আবার নৃত্যগীত সুরু করলেন। ক্রমে রথ বলগণ্ডী নামক স্থানে এসে উপনীত হ'ল। এখানে রাজারাণী, পাত্রমিত্র, অমাত্য, বিদেশী প্রভৃতি নিজ নিজ ইচ্ছামতো জগন্নাথের ভোগ দিয়ে থাকেন ; এখানে ভিড় অসাধারণ। এখানে মহাপ্রভুর নৃত্যে ব্যাঘাত হবে আশঙ্কা ক'রে ভক্তগণ তাঁকে নিকটবর্তী এক উপবনে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরের বারান্দায় উপবেশন করালেন। এখানে এসেই গৌরাঙ্গ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কেবল পদযুগল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'তে লাগল।

রাজার সাহস বেড়েছে, মনে আশার সঞ্চার-ও হয়েছে। সার্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শমতো তিনি রাজকীয় বেশ পরিত্যাগ ক'রে ধুতি-চাদর পরলেন এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে উপবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে ছিলেন, সর্বদেহ ঘর্মাক্ত। অতি বিনয়ের সঙ্গে দীনভাবে রাজা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গের দিকে, জোড়হাতে ভক্তবৃন্দের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে সেবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তারপর অতি যত্নসহকারে মহাপ্রভুর পদযুগল নিজের কোলে তুলে নিলেন। পদসেবা করতে করতে রাজা রাসলীলার সময় গোপীগণ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে-কথা বলেছিলেন, তারই একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। রামানন্দ আগে থেকেই রাজাকে এরূপ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শ্লোক শুনেই মহাপ্রভুর মুখ প্রফুল্ল হ'ল। রাজা উৎফুল্ল হয়ে দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করলেন। গৌরাঙ্গ এবার হর্ষ প্রকাশ ক'রে চক্ষু নিমীলিত অবস্থাতেই বললেন—বল, বল, তারপর গোপীগণ কি বললেন, বল।

রাজাকে সম্বোধন ক'রে মহাপ্রভুর এই প্রথম কথা। রাজা পুলকিত হয়ে পর পর শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকেন। এইভাবে রাজা ষষ্ঠ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন :

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

[ গোপীগণ বললেন—হে নাথ, তোমার অপূর্ব কথামৃত সন্তপ্ত জনগণের জীবন-স্বরূপ ও পাপ-বিনাশন ; তোমার অমৃতময়ী কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল ও শান্তি প্রদান করে; এইজন্য ব্রহ্মাদি মহানুভবগণ তোমার লীলাকথাই সর্বোত্তম ব'লে গণ্য করেছেন। ধরাতলে যাঁরা সেই কথামৃত প্রচার করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বহু জন্মের সুকৃতিসম্পন্ন, কারণ তাঁরা লোককে অভীষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে দান করছেন। ]

এই শ্লোক-আবৃত্তি শেষ হ'তেই মহাপ্রভু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে 'তুমি আমাকে বহু দান করেছ, বহু দান করেছ' ব'লে রাজাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বারংবার শ্লোকটি পাঠ করতে লাগলেন। দুজনের দেহ পুলকে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, চোখে নামল আনন্দাশ্রুধারা।

কিছুকাল পরে অনুগৃহীত রাজা পরিপূর্ণ মন নিয়ে নিজ ভবনে ফিরে গেলেন। তাঁর অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

অপরাহ্ণকালে এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিল। রাজার কাছে খবর পৌঁছল—রথ পথের ওপর অচল হয়েছে, শত চেষ্টাতেও একচুল নড়ানো যাচ্ছে না।

—কোন অনিয়ম হ'ল ? সেবার কোন ত্রুটি হ'ল ? পরিচালকদের কোন অপরাধ হ'ল ? জগন্নাথ কি রুষ্ট হয়েছেন কোন কারণে ?—রাজা চিন্তাকুল হয়ে ছুটে এলেন রথের স্থানে। বহুলোকের টানে যখন রথ নড়ে না, তখন হাতী জুড়ে দেওয়া হ'ল রথ টানার জন্য। মাহুতের হাতে অঙ্কুশ-আঘাত খেয়ে হাতীর দল আর্তনাদ ক'রে শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কিন্তু রথ অচল, যেন পর্বতের চূড়া। অজানা আশঙ্কায় রাজার বুক দুরুদুরু কাঁপে। নিরুপায় হয়ে তিনি মনে মনে শরণ নেন মহাপ্রভুর, তাঁর দিকে কাতরনয়নে চেয়ে থাকেন। গৌরাঙ্গ এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে রথ চালানোর প্রয়াস লক্ষ্য করছিলেন। রাজার দিকে চোখ পড়তেই তাঁর উদ্বেগ ও অনুনয় উপলব্ধি ক'রে মৃদু হাসিতে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর ভক্তবৃন্দকে সম্মুখদিকের রশি ধরতে নির্দেশ দিয়ে নিজে রথের পিছন দিক থেকে রথে

মাথা ঠেকিয়ে ঠেলতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে অচল রথ সচল হয়ে উঠলো ; রাজা যেন প্রাণ ফিরে পান। লক্ষ কণ্ঠের হর্ষধ্বনিতে মহাপ্রভুর এই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ অভিনন্দিত হ'ল—জয় জগন্নাথদেবের জয়, জয় মহাপ্রভুর জয়।

* * * *

আটদিন পরে রথ পুনরায় নীলাচলে ফিরে চললো। এবারও পথে গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনে সকলকে মোহিত করলেন। এই সময় রথ চলতে চলতে পট্টডোরী ছিঁড়ে গেলে তার একখণ্ড নিয়ে কুলীনগ্রামবাসীদের দিয়ে মহাপ্রভু বললেন—তোমরা এই পট্টডোরী গ্রহণ কর, প্রতি বৎসর রথের পট্টডোরী তোমরা যোগান দেবে। তোমরা এর যজমান হ'লে।

রথযাত্রা উৎসব শেষ হ'লেও বাঙালী ভক্তগণ প্রায় চার মাস নীলাচলে অবস্থান ক'রে মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ উপলব্ধি করলেন। তাঁরা অধিকাংশই গৃহী। গৌরাঙ্গ তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়ে একে একে প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন দান করলেন। গৌরাঙ্গের সান্নিধ্যে তাঁরা যে নির্মল আনন্দ-সুধা পান করলেন, তা পরিত্যাগ ক'রে যেতে তাঁদের গভীর দুঃখবোধ হ'তে লাগল।

শ্রীবাস পণ্ডিত শান্ত, একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি গৌরাঙ্গের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন, গৃহও একই পাড়ায়। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবী শচী-মাতার সখীস্থানীয়া। শ্রীবাসকে বিদায় দেবার সময় তাঁর গলা ধরে কাঁদতে কাঁদতে মহাপ্রভু বললেন—শ্রীবাস, আমার মা বেঁচে আছেন তো ?

গৌরাঙ্গের মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা আসে না। তাঁকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে শুনে ভক্তগণ কেউ অশ্রু রোধ করতে পারেন না। অশ্রুরুদ্ধ গদগদকণ্ঠে মহাপ্রভু বলেন—কৃষ্ণপ্রেম জীবনের পরম পুরুষার্থ। এজন্য আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে মাতৃচরণ-সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। মায়ের আমার স্নেহের অবধি নাই। সে-স্নেহের কণামাত্র-ও শোধ দেবার সাধ্য আমার নাই। বাড়ীতে শালগ্রাম-বিগ্রহের ভোগের জন্য একটু বেশী আয়োজন হ'লে মা আমার নাম ধ'রে কাঁদতে থাকেন। তাঁর আকুল ক্রন্দনে আমি নীলাচলেও স্থির থাকতে পারিনে। তাঁর আহ্বানে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সামনে বসে যখন ভোজন করি, তিনি আনন্দে অধীর হন কিন্তু আমার অদর্শনেই মনে করেন সব স্বপ্ন।

গত বিজয়া দশমীর দিনেও আমি মায়ের কাছে ভোজন ক'রে এসেছি। শ্রীবাস, তুমি মাকে এ-সব কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আমার হয়ে তুমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রো—আমি তাঁর অবোধ শিশু; তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে আমি মহা অপরাধ করেছি; তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি তো তাঁরই আদেশে নীলাচলে বাস করছি।

এই সব কথা ব'লে গৌরাঙ্গ 'মা মা' ব'লে শিশুর মতো আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন।

যাত্রাকালে শ্রীবাসের হাতে মায়ের জন্য বহুবিধ প্রসাদ দিয়ে একখানি বহুমূল্য শাড়িকাপড় দিলেন। শাড়িখানা রাজা রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুকে উপহার দিয়েছিলেন। শাড়ি দিয়ে শচীমাতা কি করবেন? ওটি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীর নাম উল্লেখ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাপ্রভু পত্নীকে ত্যাগ ক'রে গেলেও তাঁর প্রতি করুণার ক্ষীণ স্রোতরেখা যে অন্তরে ছিল, তারই পরিচয় পাওয়া গেল। এই উপহারের মধ্যে ব্যথা ও আনন্দের অনুভূতি নিবিড়ভাবে মিশানো।

## অমোঘ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। হরিনাম বিলানোর দায়িত্বভার নিয়ে নিত্যানন্দ-ও গেছেন। এই সময় একদিন সার্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণের নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বাসনা গৌরাঙ্গকে বিবিধ সামগ্রী দিয়ে নিজের তৃপ্তিমতো ভোজন করাবেন। বহুবিধ আয়োজন করেছেন। রান্না করেছেন সার্বভৌমের গৃহিণী। তিনিও মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিমতী।

ভোজনের সামগ্রী পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘৃতসিক্ত সুগন্ধি অন্নের ওপর তুলসী-মঞ্জরী। সমস্ত দ্রব্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামে নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গ ভোজনের আয়োজন দেখে বিস্মিত হন। সার্বভৌম বলেন—এ সামান্য কৃষ্ণের প্রসাদ; তুমি এই কৃষ্ণের আসনেই উপবেশন কর।

মহাপ্রভু ভোজনে বসেন; সার্বভৌম কাছে বসে অনুনয় ক'রে, অনুযোগ ক'রে, একান্ত আপনজনের মতো ক'রে ভোজন করান। মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে এসে দেখে যান কেউ এসেছে কিনা।

সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ। জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। শ্বশুরালয়েই থাকে। নানা দোষে দুষ্ট, কোন গুণ নাই—কেবল হিংসার আগুন জ্বলে তার বুকে। এরূপ চরিত্রের জন্য সার্বভৌম জামাতার ওপর বিরূপ; কেবল কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃই তাকে গৃহে স্থান দিয়েছেন। তিনি জানেন অমোঘ দুর্জন; কখন হয়ত গৌরাঙ্গের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে আসেন অমোঘ ওদিকে আসে কিনা।

ভট্টাচার্যের এত সতর্কতা সত্ত্বেও অমোঘ একবার কোন্ ফাঁকে এসে মহাপ্রভুর ভোজন-গৃহের দরজায় উঁকি মেরে ব'লে উঠলো—ওরে বাবা! সন্ন্যাসী এত খায়!

সার্বভৌম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়া করলেন জামাতাকে। অমোঘ ছুটে পালাল গৃহ থেকে। কিন্তু সার্বভৌম ও তাঁর গৃহিণীর মনের সন্তোষ নষ্ট ক'রে দিতে ওই একটি কথাই যথেষ্ট!

অমোঘের মন্তব্য শুনে মহাপ্রভু মৃদু হাসি হাসলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য জামাতার আচরণে মনে নিদারুণ আঘাত পেয়ে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অমোঘের প্রতি শাপ বর্ষণ করতে করতে তিনি ফিরে এসে মহাপ্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। গৌরাঙ্গের আচমন করার পর সার্বভৌম তাঁর মুখশুদ্ধির জন্য তুলসী-মঞ্জরী, এলাচ লবঙ্গ দিলেন এবং পরে তাঁর অঙ্গে চন্দন লেপন ক'রে পুষ্পমাল্য দান করলেন। অবশেষে মহাপ্রভুর চরণ ধ'রে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন—প্রভু, তোমাকে গালি খাওয়ানোর জন্য আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আমার জামাতা তোমাকে কটুবাক্য বললো—এর চেয়ে আমার মৃত্যুই ভালো।

মহাপ্রভু হাসিমুখে বললেন—অমোঘের কোন দোষ নাই। আমার এত খাওয়া সত্যিই তো উচিত হয়নি ; বেশী খাওয়ায় সন্ন্যাসীর ধর্মনষ্ট হয়—এ কথা তো ঠিকই।

মহাপ্রভু অমোঘের কথা হেসে উড়িয়ে দেন কিন্তু সার্বভৌম ও তাঁর গৃহিণী প্রবোধ মানেন না। সার্বভৌম-পত্নী এতই মনোব্যথা পেয়েছেন যে, কাঁদতে কাঁদতে বলেন—আমার মেয়ে বিধবা হোক্। প্রভুকে আমাদের বাড়ীতে যে অপমান করে, তার মুখ দেখতে চাইনে।

গৌরাঙ্গ তাঁর বাসস্থানে ফিরে আসেন। সার্বভৌম আসেন সঙ্গে সঙ্গে। ফিরে যাবার সময় আবার মহাপ্রভুর চরণযুগল ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু তাঁকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি ভাবেন—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেদিন উপবাসে কাটানো স্থির করলেন। তাঁর ভগিনীপতি গোপীনাথ অনেকভাবে বুঝালেন কিন্তু তাঁরা শান্ত হলেন না।

অমোঘ বাড়ী থেকে পালিয়ে আর সারা দিনরাত্রি বাড়ীতে ফেরেনি। যেখানে রাত্রিতে ছিল সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রাতঃকালে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। অমোঘের মৃত্যু আসন্ন এই খবর সার্বভৌমের নিকট পৌঁছাল। তিনি বললেন—ভালোই হয়েছে ; ভগবানের নিকট সে অপরাধী, তার ফল সদ্যসদ্যই ফললো। আমি কি করবো! আমার সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্বশুর জামাতার প্রতি বিরূপ। মরণাপন্ন অমোঘের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা কিংবা তাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা পর্যন্ত

সার্বভৌমের হ'ল না। আপন দেহের বিষাক্ত অংশ কেটে ফেলে দিতে যেমন লোকে কুণ্ঠিত হয় না, ভট্টাচার্যের মনে অমোঘ তেমনি দোষ-দুষ্ট অঙ্গস্বরূপ। তিনি ভাবলেন—সবই ভগবানের কার্য ; তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি হবে।

অমোঘের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা হ'ল না দেখে গোপীনাথ ছুটে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে। সার্বভৌম ও তাঁর পত্নীর উপবাসের কথা এবং অমোঘের কলেরায় মৃতপ্রায় হওয়ার কথা তাঁকে জানালেন।

মহাপ্রভু করুণাময়। অমোঘের বিপদে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, বললেন—ভট্টাচার্য যখন তাকে দেখতে গেলেন না, তখন আমি-ই একবার দেখে আসি। আমায় শীঘ্র তার কাছে নিয়ে চল।

অমোঘ রোগশয্যায় মূর্ছিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন, দেহ শীতল ; মৃত্যু আসন্ন। মহাপ্রভু তার পাশে উপবেশন ক'রে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—এই বক্ষস্থল শ্রীকৃষ্ণের আসন ; হিংসা এখানে বাসা বেঁধেছে কেন ? হে দ্বিজ, তুমি উঠ। সার্বভৌমের সংস্পর্শে থেকে তোমার পাপরাশি ক্ষয় হয়ে গেছে। পাপ ক্ষয় হ'লে জীব কৃষ্ণনাম নেয়; তুমিও উঠে কৃষ্ণনাম করো। ভগবান তোমাকে অবশ্য কৃপা করবেন।

মহাপ্রভু এই কথা ব'লে হুহুঙ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মুমূর্ষু অমোঘ যেন ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াল এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নৃত্য করতে লাগল ; তার চোখে নামল অশ্রুর বান। গৌরাঙ্গ একপাশে দাঁড়িয়ে অমোঘের নৃত্য দেখছেন ; তাঁর মুখে স্মিতহাসি। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে হতবাক্।

খানিক পরে অমোঘ শান্ত হ'ল। মনে তার অনুশোচনা জেগে উঠেছে। সে ভাবছে—আমার মতো অপরাধী জগতে আর কেউ নাই, আমি প্রভুকে দুর্বাক্য বলেছি।

অমোঘ তখন মহাপ্রভুর চরণে লুটিয়ে প'ড়ে নিজের হাতে নিজের গালে সজোরে চপেটাঘাত করতে লাগল, গাল ফুলে উঠলো। গৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে গোপীনাথ অমোঘের হাত ধ'রে আত্ম-শাস্তি-গ্রহণ থেকে বিরত করলেন ; অমোঘ বালকের মতো কাঁদতে লাগল।

মহাপ্রভু তখন তার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—অমোঘ, তুমি ভট্টাচার্যের জামাতা, পুত্রস্থানীয় ; কাজেই আমারও স্নেহপাত্র। তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণনাম করো।

এর পর মহাপ্রভু সার্বভৌমের গৃহে উপনীত হলেন। অলৌকিকভাবে অমোঘের প্রাণলাভের কথা শুনে ভট্টাচার্য বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। গৌরাঙ্গকে দেখেই ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বলেন—ভট্টাচার্য, অমোঘ বালক, তার ওপর রাগ করো কেন? তার কোন অপরাধ নিও না। এখন স্নান-আহ্নিক কর, শ্রীমুখ দর্শন ক'রে এসে আহার কর; তবে আমি খুশি হব।

ভট্টাচার্য বলেন—অমোঘ দুরাচার। তার পাপের উচিত শাস্তি হচ্ছিল, কেন তুমি তাকে অনুগ্রহ করলে?

মহাপ্রভু ভট্টাচার্যকে বলেন—অমোঘ বালক, সে তোমার পুত্র। হাজার অপরাধ করলেও পুত্রের দোষ ক্ষমার যোগ্য। এখন তো সে পরম বৈষ্ণব। তার প্রতি প্রসন্ন হও, এই আমার অনুরোধ।

মহাপ্রভুর কথায় সার্বভৌম শান্তিলাভ করেন। তাঁর গৃহে ও মনে আবার আনন্দ বিরাজ করতে থাকে।

*　　　*　　　*　　　*

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনা। পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি তাঁকে সমীহ করেন। পুরী গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তিমান। তিনি মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের জন্য নীলাচলে এসে মহাপ্রভু-নির্দিষ্ট একটি বাসায় বাস করছেন। বাসার ভিতরে একটি কূয়া খোঁড়া হয়েছে কিন্তু জল কর্দমময় এবং পানের অযোগ্য। একদিন গৌরাঙ্গ পুরীর বাসায় গিয়েছেন, কূয়া দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কূয়ার জল কেমন?

পুরী বলেন—জল নয় তো, কর্দম। একান্ত অপেয়।

মহাপ্রভু বিস্মিত হয়ে বলেন—কি আশ্চর্য! জগন্নাথের সমস্ত কৃপণতা বুঝি এখানেই! পুরী-গোস্বামীর বাসায় কূপের জল হবে পবিত্র নির্মল; তা পান ক'রে সর্বসাধারণ হবে পবিত্র। তা না হয়ে এখানে হ'ল কাদামাটি, যা দেখে লোকে ঘৃণা করবে!

তারপর ধীরপদক্ষেপে গৌরাঙ্গ কূয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন—হে জগন্নাথ, আমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে তুমি গঙ্গাদেবীকে এই কূপে প্রবেশ করতে বল।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর কথায় উল্লাসে হরিধ্বনি ক'রে উঠলেন। তারপর গৌরাঙ্গ ফিরে এলেন নিজ বাসস্থানে, ভক্তগণ গেলেন নিজ নিজ আবাসে।

পরদিন প্রাতঃকালে কূয়ার কাছে গিয়েই পুরী-গোঁসাই পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন, দেখেন—নির্মল জলে কূয়াটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। খবরটি অল্প সময়ের মধ্যেই মহাপ্রভু এবং ভক্তদের কাছে পৌঁছে। গৌরাঙ্গ সঙ্গীদের নিয়ে আসেন পুরী-গোস্বামীর বাসায়, পবিত্র-জলপূর্ণ-কূপ ঘিরে চলে আনন্দ-কীর্তন।

* * * *

জগন্নাথদেবের মন্দিরের লিখন-অধিকারী ছিলেন শিখি মাহিতী। একাধারে ভক্ত ও ঐতিহাসিক। মুরারি ভাই ছোট ভাই, মাধবী ভগিনী। লোকে তাঁদের তিন ভাই বলতো। মাধবী স্ত্রীলোক হ'লেও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন আর ভাইদের মতোই ভজন-সাধন করতেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে প্রেমদান ক'রে একেবারে নূতন মানুষ করেছিলেন; যিনি ছিলেন শুষ্ক জ্ঞানের জ্বলন্ত শিখা, তিনি হয়েছিলেন প্রেমসিক্ত ভক্তির নির্ঝর। মহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণে গেলে শ্রীক্ষেত্রে তাঁর অলৌকিক মহিমা ও শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যখন নীলাচলে ফিরে এলেন তখন তাঁর দর্শনের জন্য, তাঁর কৃপাকণা লাভের জন্য নীলাচলবাসীদের মধ্যে উৎসাহ জেগে উঠলো। এই সময় শিখি মাহিতী ও মুরারি প্রভুর দর্শন লাভ করেন; মাধবী দূর থেকেই গৌরাঙ্গের জ্যোতির্ময় ভুবনমোহন রূপ দর্শন করলেন। মহাপ্রভুর নিকটে স্ত্রীলোকের যাওয়া বারণ। মুরারি ও মাধবী গৌরাঙ্গের পদে আত্ম-সমর্পণ করলেন মনে মনে। গৌরাঙ্গ জপ, গৌরাঙ্গ ধ্যান হ'ল তাঁদের নিত্য ভজন-সাধনার অঙ্গ। শিখি পূর্ববৎ জগন্নাথ-ভক্তই রইলেন। শুধু তাই নয়, ভাই-বোনের মধ্যে মনান্তর ঘটে গেল। মুরারি আর মাধবী মহাপ্রভুকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন। শিখি বলেন, তোমরা ভুল পথ ধ'রে চললে, তোমাদের গতি কী? চৈতন্য পরম সন্ন্যাসী, শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু মানুষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা—এ তো মহাপাপ!

মুরারির অন্তর গৌরাঙ্গ-ভক্তিতে কোমল হয়েছে। বলেন—তা বটে! সার্বভৌম-ও এক সময় এমনি বলেছিলেন। তিনি তো বড় কম পণ্ডিত নন। তোমার পাণ্ডিত্য-অভিমান এখনো পূরামাত্রায় রয়েছে; তাই গৌরাঙ্গের স্বরূপ বুঝতে পারছ না।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। রাত্রিতে শিখি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেন। দেখেন—তিনি জগন্নাথ-দর্শন করতে গেছেন; এক পাশে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ-ও

জগন্নাথ দর্শন করছেন। তাঁর চোখের সামনে চৈতন্য জগন্নাথ-শরীরে মিশিয়ে গেলেন আবার বের হয়ে এলেন। এমনি কয়েক বার চললো জগন্নাথ-বিগ্রহের সঙ্গে গৌরাঙ্গের দেহ-বিলয়। তারপর তাঁর দিকে নজর পড়তেই কমললোচন গৌরাঙ্গ মৃদু হেসে বললেন—তুমি শিখি, মুরারি-মাধবীর ভাই না? এস তোমায় আলিঙ্গন দিই, এই ব'লে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্বপ্ন-শেষে শিখি হর্ষপুলকিতদেহে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে স্বপ্ন বর্ণনা করেন তাঁর ছোট ভাই ও বোনের কাছে। তাঁর মনের সংশয় দূর করার জন্য লীলাময় গৌরাঙ্গ কি বাস্তব-সদৃশ স্বপ্নজাল রচনা করলেন! শিখির কাছে জাগ্রত অবস্থা-ও স্বপ্নময় মধুর ব'লে মনে হ'তে থাকে। নূতন ভাবের দোলায় অন্তর তাঁর উদ্বেলিত।

প্রভাতে তিনজন চলেন জগন্নাথ-দর্শনে। দেখেন আগের মতোই শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের নিকটে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চেয়ে আছেন, বিগলিত ধারায় অশ্রু পড়ছে; স্নিগ্ধ, ভাস্বর তেজোময় রূপ। দর্শন-শেষে মহাপ্রভু তাকালেন শিখি মাহিতীর দিকে। চোখে যেন করুণা ও কৌতুক। ইসারায় ডাকলেন তাঁকে। শিখি তাঁর নিকটে এগিয়ে যেতেই প্রভু বললেন—তুমি না মুরারি ও মাধবীর ভাই? এস তোমায় আলিঙ্গন দিই।

এই ব'লে মহাপ্রভু শিখি মাহিতীকে বক্ষে ধারণ করলেন। ভাবাবেশে উভয়েই ভূমিতে পতিত হলেন, শিখির সর্বদেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। স্বপ্ন হ'ল বাস্তব। সংশয়ের কুয়াশা কেটে গেল অরুণ আলোর প্রকাশে। পণ্ডিত শিখি মাহিতী পরে হয়েছিলেন রাম রায় ও স্বরূপ-দামোদরের মতোই রসজ্ঞ ভক্ত।

## নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ

বৎসরান্তে আবার রথযাত্রার সময় এল। নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভুর ভক্তদল মহা উৎসাহে আসছেন গৌরাঙ্গ ও জগন্নাথ-দর্শনে। তাঁরা এই মহা-লগ্নের জন্য উৎসুক হয়ে দিন গুণেছেন। এবার বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের গৃহিণীরাও এসেছেন ; এ-দলে আছেন শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবী, নীলাম্বর আচার্যের স্ত্রী, শিবানন্দ সেনের পরিবারবর্গ। ধনবান ভক্ত শিবানন্দ সেন যাত্রীদের পাথেয়ের ব্যবস্থা করেন। পথের বিপদ অনেক কিন্তু গৌরাঙ্গ-প্রেমে মাতোয়ারা যাত্রীদের কাছে কোন বিঘ্নই বিঘ্ন নয়। নিত্যানন্দ ফিরে এসেছেন। গৌরাঙ্গগত-প্রাণ, নীলাচলে এসে তিনি পুলকিত।

আগের বারের মতোই রথযাত্রার ধুমধাম। তেমনি উল্লাসকর কীর্তন, তেমনি মধুর নৃত্য, তেমনি মন্দির-মার্জন, তেমনি জগন্নাথ-দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। উৎসব-শেষে মহাপ্রভু নিতাইয়ের ওপর এক গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। সমাজে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রেমভক্তি-ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। কেমন ক'রে এ-কাজ সম্ভব? গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকে লোকে যতখানি ভক্তি করে, গৃহী ভক্তকে ততখানি করে না। সত্যি কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়াই যদি সকলের আদর্শ হয়, তবে সমাজ চলবে কেমন ক'রে? গৌরাঙ্গ নিজে সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ উদাসী-সন্ন্যাসী, দামোদর স্বরূপ, গদাধর—এঁরাও গৃহবিবাগী। এ থেকে সাধারণ মানুষের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী না হ'লে কৃষ্ণভক্তি হবে না। কিন্তু প্রকৃতই তা তো নয়। সংসারে থেকে সৎ জীবন-যাপন, সমাজের প্রতি, আপনজনের প্রতি কর্তব্যপালন ক'রেও লোকে ভক্তিময় পুণ্যজীবন যাপন করতে পারে। যতদিন এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা না হবে, ততদিন গৃহী বৈষ্ণবগণ নিজেদের মনে করবে হেয়, ধর্মজীবন যাপনের অযোগ্য।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে একান্তে ডেকে বললেন—তোমার ওপর জীব-উদ্ধারের কাজ ন্যস্ত রয়েছে। সে-কাজ ফেলে এখানে এসে থাকলে আমি বড়ই দুঃখ পাব।

নিতাই ক্ষুণ্ন হন, বলেন—বৎসরের মধ্যে একবার তোমায় দেখতে আসব, তাতে-ও বারণ! এ নিষেধ মানবো না।

প্রভুর প্রতি নিত্যানন্দের মমতা অত্যধিক ; গৌরাঙ্গ নিজে-ও তা জানেন। তবু বলেন—শ্রীপাদ, তোমার কাছে আমার এই মিনতি তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে গৃহী হও ; হয়ে লোককে দেখাও যে, ভক্তিধর্ম আচরণের জন্য সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি এ-কাজে সহায় না হও তবে মানুষের মনে আস্থার ভাব আনবে কে? প্রতি বৎসর নীলাচলে না এসে গৌড়ে থেকেই তুমি আপনি আচরি' অপরে শিখাবে ; এতেই আমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

এই মহা আদেশ শুনে নিত্যানন্দ নীরবে নতশিরে বসে থাকেন। চিন্তা-রাশি ঘনীভূত হয়। এ কী মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি! গৌরাঙ্গ-প্রেমের উদার নীলাকাশে তিনি মুক্ত বিহঙ্গমের মতো আনন্দে বিরাজ কর-ছিলেন ; আজ কি তাঁর পক্ষচ্ছেদ হবে? তিনি সংসারধর্ম পালন আর ভক্তিধর্ম পালনের সামঞ্জস্য করতে পারবেন? সমাজ কি বলবে? তাঁর প্রাণের গৌরাঙ্গ থেকে দূরে সরে পড়বেন না তো? এমনি চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠেন তিনি। অবশেষে মনের ভিতর থেকেই এর সমাধান আসে—প্রভুর যা ইচ্ছা তাই আমার শিরোধার্য ; ভাল-মন্দের বিচারে আমার কী প্রয়োজন! সামর্থ্য অসামর্থ্যের প্রশ্ন-ও অবান্তর। যাঁর কাজ তিনিই করাবেন—আমি নিমিত্তমাত্র।

* * * *

নিত্যানন্দ ফিরে এলেন নবদ্বীপে। মহা আদেশ তাঁকে পালন করতে হবে। সংসারী হয়ে, সংসারীর কর্তব্য পালন ক'রে লোকশিক্ষা দিতে হবে ; দেখাতে হবে পদ্মপত্র জলের ওপর অবস্থান ক'রেও জলের থেকে পৃথক, সংসারে বাস ক'রেও ঈশ্বর-আরাধনা সম্ভব। ঈশ্বর-অনুরাগী ভক্তি অন্তরে পোষণ ক'রে সংসারে বাস করা চলে। নিতাই কৌপীন ছেড়ে সংসারীর বেশ পরিধান করেছেন; অধরে তাম্বুল, পায়ে নূপুর। ভক্তি-ভাবে হৃদয় আন্দোলিত। প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ভাগীরথীর তীরে তিনি গান গেয়ে ফেরেন ; তাঁর হৃদয়হরণ আহ্বান ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ॥

সমুদ্রে জোয়ার এলে উচ্ছ্বসিত জলরাশি নদী-নালা দিয়ে উজান দিকে ধেয়ে আসে, কূল ভাসায়, প্রাণের সাড়া আনে মরা গাঙে। চৈতন্যের ভক্তি-ভাবের

জোয়ার তেমনি বাংলার সমাজ-নদীতে জীবনের সাড়া এনেছিল। চৈতন্যের ভাবে ভাবিত হয়ে নিত্যানন্দ সেই ভক্তিধারা গ্রামে গ্রামে প্রবাহিত করলেন। সমাজের সর্বস্তরে লাগল দোলা। জীর্ণ সংস্কার, বাধানিষেধের বেড়াজাল, ছোট-বড়-র গণ্ডিভেদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হ'ল। মানুষ উঠলো জেগে, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। মানুষ হিসাবে একজন তো অপরের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ভক্তির অধিকারী সবাই ; ভক্তের জাতিভেদ নাই। যে সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব এতদিন ধ'রে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, যেখানে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির লোক নিকৃষ্ট ব'লে অবজ্ঞার পাত্ররূপে বিবেচিত হ'ত, সেখানে এই গণতন্ত্রী ধর্ম সমাজের সাধারণ মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করলো। যে অন্যের চোখে ছিল পতিত সে যেন নিজের মধ্যে সন্ধান পেল নূতন আলোকের, নূতন পবিত্র ভাবের ; অনুভব করলো সে অবহেলার যোগ্য নয়। মানুষের দীপ্ত মহিমায় তার সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হিন্দু-সমাজে নূতন শক্তির সঞ্চার হ'ল। জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা কমিয়ে দিতে নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়কে হিন্দু-সমাজের মধ্যে গ্রহণ করলেন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সমাজের মধ্যে বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে প্রতিকূলতা জেগে উঠলো। অনেকেই নিত্যানন্দের জাতিভেদহীন ভক্তিধর্মের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, হয়েছেন গৃহী। এতেই তিনি যেন লোকচক্ষে পতিত হয়েছেন ; তার ওপর ঈশ্বর-আরাধনার সহজ পথটি দেখিয়ে দিয়ে তিনি যখন দেশের সকল শ্রেণীর লোককে মাতিয়ে তুললেন, তখন ব্রাহ্মণগণ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য বুঝি যায়! সংসার-বিরাগী ভক্ত নিতাই প্রভুর আদেশে সংসারী হয়ে ভক্তিধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

## মাতৃদর্শনে

দক্ষিণ-দেশ সফর ক'রে ফিরে মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করছিলেন। এবার তিনি নবদ্বীপে মায়ের চরণ দর্শন ক'রে বৃন্দাবন গমন করবেন স্থির করলেন। গৃহত্যাগ করার পরে সন্ন্যাসীকে একবার গিয়ে জন্মস্থান দর্শন ক'রে শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে আসতে হয়। সে কর্তব্য বাকি রয়েছে। বিজয়া দশমীর পর গৌরাঙ্গ নীলাচল ছেড়ে গৌড় অভিমুখে রওনা হবেন। নীলাচলের ভক্তবৃন্দের মন গৌরাঙ্গের বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুল। যাঁর সান্নিধ্যে অপূর্ব প্রেমানন্দের আস্বাদ পেয়েছেন, যাঁর দর্শন আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ করে, তাঁকে দীর্ঘদিন না দেখে কেমন ক'রে জীবনধারণ করবেন এই চিন্তায় তাঁরা বিষণ্ণ। বিদায় দিতেই হবে, তবে তাঁর যাত্রাপথ যতখানি সুগম করা যায় সে চেষ্টার কোন ত্রুটি হ'ল না।

ভক্তবৃন্দের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গ চললেন জন্মভূমির উদ্দেশ্যে। সঙ্গে চলেছে অগণিত লোক। হরিনামের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। প্রভু ভাবে বিভোর হয়ে চলেছেন, মুখে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি। কৃষ্ণ তাঁর অন্তর-বাহির জুড়ে বিরাজিত। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেইদিকেই যেন দেখেন কৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ। অন্তরের প্রতিফলন বাইরের বস্তুতে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল পথের পাশের একটি গাছের ডালে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন, তাঁর রূপে দিক আলোকিত। ছুটে চললেন সেই গাছের কাছে, গাছে উঠতে চেষ্টা করতে লাগলেন, গাছের ডাল চুম্বন করলেন গভীর প্রেমভরে। দেখেন কৃষ্ণ রয়েছেন পাশের গাছে ; ছুটে যান সেদিকে। যেদিকে নজর পড়ে সেদিকেই কৃষ্ণের ছবি। অন্তর তাঁর কৃষ্ণময়, কাজেই বাহির-ও।

গৌরাঙ্গ চলেছেন পদব্রজে। তাঁর সঙ্গের লোকেরাও তেমনি। রাম রায় পায়ে হাঁটার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। তিনি চলেছেন দোলায় চ'ড়ে সকলের পিছে পিছে। যেখানে যেখানে গৌরাঙ্গ রাত্রি যাপন করবেন সেখানে আগে থেকেই নূতন ঘর তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। রাম রায়ের ভাই বাণীনাথের তত্ত্বাবধানে মহাপ্রভুর সেবার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। দ্রুতগামী দূতের মারফৎ সদ্যঃপক্ক মহাপ্রসাদ এনে হাজির করা হয় মহাপ্রভু ও তাঁর

সঙ্গীদের জন্য। বিশ্রামস্থলে রাম রায় এসে গৌরাঙ্গের সঙ্গে যোগ দেন; কীর্তনে ও কৃষ্ণকথায় রাত্রি অতিবাহিত হয়।

মহাপ্রভু পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন; কণ্ঠে তাঁর কৃষ্ণনাম, মন কৃষ্ণ-ভাবে পরিপূর্ণ। সঙ্গে চলেছেন ভক্ত সঙ্গী-জন। ভুবনেশ্বর দর্শন ক'রে তিনি উপনীত হলেন কটকে। সেখানে গোপীনাথের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করলেন; তারপর রামানন্দ রায়ের বাসভবন-সংলগ্ন বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে বাগানে ছিল একটি প্রকাণ্ড বকুলগাছ। গৌরাঙ্গ সে বৃক্ষচ্ছায়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। রামানন্দ গেলেন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রাজা গজপতি চৈতন্যের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন; তাঁর রাজ্যে অবস্থান ক'রে তাঁকে কৃতার্থ করেছেন ব'লে তিনি আনন্দিত। গৌরাঙ্গ-দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন; রামানন্দের সঙ্গে এসে মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। রাজপরিচ্ছদ-শোভিত দেহে, মুকুটভূষিত মস্তকে তিনি বকুলবৃক্ষতলে চৈতন্যের চরণ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে সাগ্রহে মাটি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন দান করেন। রাজা বিষয়ী হ'লেও ভগবৎপ্রেমে হৃদয় তাঁর ভরপূর, গৌরাঙ্গ-ভক্তিতে তাঁর চিত্ত হয়েছে কুসুমের মতো কোমল ও পবিত্র। বৃন্দাবন দর্শন ক'রে গৌরাঙ্গ আবার নীলাচলে ফিরে আসবেন এই আশ্বাস দিলে রাজা তাঁকে বিদায় দেন। তাঁর মন্ত্রীদের প্রতি আদেশ দেন তাঁরা দুজন যেন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করেন। আর আদেশ দেন, উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে যেখানে স্নান করবেন সে স্থান হবে পবিত্র তীর্থ; সেখানে যেন একটি ক'রে স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

কটক ছেড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রেমুনায় এসে উপস্থিত হন। এখান থেকে রামানন্দ ফিরে যাবেন। উভয়ের বিচ্ছেদ-চিন্তায় উভয়ে আকুল। কৃষ্ণকথার রসাস্বাদনে উভয়ে একত্রে কত রজনী যাপন করেছেন। মহাপ্রভুকে ছেড়ে যেতে রামানন্দের মন চায় না কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে ফিরতেই হবে। ভাব যেখানে কণ্ঠ অবধি ফেনিয়ে ওঠে ভাষা সেখানে স্তব্ধ। বিদায় নেবার সময় রামানন্দ কোন কথাই বলতে পারলেন না, ভাবের আবেগে মূৰ্ছিত হয়ে পড়লেন ভূমিতে। ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু রামানন্দের অচেতন দেহ তুলে নিলেন নিজের কোলের ওপর; তাঁর আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল অবিরাম ধারায়।

কিছুক্ষণ পরে রামানন্দকে ঐ অবস্থায় রেখে তিনি যাত্রা করলেন। কোন বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হ'তে পারেন না।

উড়িষ্যা রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে তিনি এসে উপনীত হয়েছেন। একটি নদী হ'ল উড়িষ্যা ও গৌড়ের সীমানা। নদী পার হয়ে মুসলমান রাজার অধীন বাংলা রাজ্যে উপস্থিত হ'তে হবে। সে সময় দুই রাজ্যের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল না; যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার দরুন সীমান্তের নদী পারাপার সহজসাধ্য ছিল না। উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজকর্মচারী নদীর পূর্বপারের মুসলমান ঘাট-রক্ষকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে শ্রীচৈতন্যের পারের ব্যবস্থা করবেন, স্থির করলেন। গৌরাঙ্গ পশ্চিমপারে অবস্থান করতে লাগলেন।

সৎসঙ্গ এবং হরিনামের এমনি মহিমা যে লোক জুটতে দেরী হয় না। গৌরাঙ্গকে দর্শনের জন্য হাজার হাজার লোকের সমাগম। ঘন ঘন হরিধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠলো। নদীর অপর পারের মুসলমান ঘাটিয়াল ব্যাপার কী দেখার জন্য একজন গুপ্তচর পাঠালেন; তাঁর আশঙ্কা হয়েছে উড়িষ্যার হিন্দু নরপতি কি বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছেন? নতুবা এত লোকের সম্মেলন হবে কেন? হিন্দুর বেশ ধ'রে মুসলমান গুপ্তচর নদী পার হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে এল। সে ধারণা করতে পারেনি, একজন মানুষকে নিয়ে এত লোকের সমাবেশ আর তাঁর সঙ্গে সবাই হরিনাম-কীর্তনে মেতে উঠেছে। বিস্মিত চর লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলতে লাগল সেই আকর্ষণের বস্তু দর্শনের জন্য। দেখে সুদর্শন, সুগঠিত দেহ, যেন কাঁচা সোনায় নির্মিত এক মহাপুরুষ। আজানুলম্বিত বাহু; দীর্ঘ পদ্মপলাশ নয়ন থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে; কণ্ঠে সুমধুর কৃষ্ণনাম ধ্বনি। বাহ্যজ্ঞানরহিত। অপূর্ব দ্যুতিতে তাঁর সর্বাঙ্গ এবং সে-স্থান যেন আলোকিত হয়ে গেছে। সে-দৃশ্য দেখে চরের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, দেহে জাগে পুলক রোমাঞ্চ। নূতন জীবনের নূতন আস্বাদ যেন সে লাভ করে। ফিরে আসে মুসলমান অধিকারীর নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানানোর জন্য। চরের মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনে অধিকারীর ইচ্ছা হ'ল তিনি গিয়ে তাঁর দর্শন-লাভ করবেন। লোক পাঠিয়ে উড়িষ্যার অধিকারীর নিকট তিনি তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। বিস্মিত হলেন উড়িষ্যার রাজপুরুষ। তিনি চিন্তা করছিলেন কেমন ক'রে প্রভুকে নদী পারের ব্যবস্থা করবেন;

মুসলমান অধিকারী নিজেই প্রভুর চরণ-দর্শন-মানসে এ-পারে আসতে চান! তিনি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

সাতজন নিরস্ত্র দেহরক্ষী সহচর নিয়ে মুসলমান অধিকারী নদী পার হয়ে পশ্চিমপারে এসে উপনীত হলেন। উড়িষ্যার রাজকর্মচারী তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করেন। তারপর সঙ্গে নিয়ে যান মহাপ্রভু-দর্শনে। গৌরাঙ্গের দেবকান্তি দেখেই পুলকে বিবশ হয়ে তিনি ধরণীতে লুটিয়ে পড়েন। উড়িষ্যা-অধিকারী তাঁকে সযত্নে তু'লে নিয়ে যান চৈতন্যের নিকটে। তাঁকে দর্শন ক'রেই মুসলমান রাজপুরুষ স্বেচ্ছায় হরিধ্বনি ক'রে ওঠেন; গৌরাঙ্গের দৃষ্টিপাতে তাঁর সর্বশরীর পুলকরোমাঞ্চিত, চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে। মনে করেন, এই পরমপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ ক'রে তাঁর জীবন ও জনম সার্থক হ'ল।

মহাপ্রভু নদী পার হয়ে বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছা করেন শুনে মুসলমান অধিকারী আনন্দিত হন। সানন্দে তিনি তাঁর পারের ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজী হলেন। গৌরাঙ্গের জন্য একখানা নূতন নৌকা এবং সঙ্গীদের জন্য দশখানা নৌকা আনানো হ'ল। মুসলমান রাজকর্মচারী নিজে সঙ্গে থেকে নদী পার ক'রে মহাপ্রভুকে পিছলদহে নিয়ে পৌছিয়ে দেন। মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ ক'রে ভক্তিভরে বিদায় নিয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। গৌরাঙ্গ সহচরবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে চললেন নবদ্বীপ অভিমুখে।

পথে কুমারহট্ট গ্রাম। গৌরাঙ্গ-ভক্ত শ্রীবাসের বাড়ী এখানে। মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভক্ত শ্রীবাস কৃতার্থ বোধ করেন নিজেকে। পরিবার তাঁর ধন্য হ'ল, পবিত্র হ'ল তাঁর গৃহ। কুমারহট্ট থেকে গৌরাঙ্গ এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাসভবনে। প্রাণের নিমাই ফিরে এসেছেন; সকলের মনে আসে আনন্দের জোয়ার। শান্তিপুরে একদিন অবস্থান ক'রে গৌরাঙ্গ আসেন কুলিয়া নগরে। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপের ঘাটে এসে নামলেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোরের পরিচিত ঘাট। তাঁর আনন্দ-বিলাসের সাক্ষী এই গঙ্গার ঘাট। কত দিন কত রাত্রি তিনি এখানে সঙ্গীদের সঙ্গে যাপন করেছেন; আনন্দ-উল্লাস করেছেন; শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। গঙ্গার সঙ্গে তাঁর পরিবারের নিবিড় যোগ। পিতৃদেব প্রতিদিন এখানে স্নান-তর্পণ করতেন। এই সেই ঘাট। নিমাই এসে নামলেন ঘাটে। হাজার হাজার লোক সাগ্রহে দাঁড়িয়েছিল তীরে। আনন্দে উচ্চধ্বনি ক'রে

ওঠে সবাই। তাঁদের পরিচিত চঞ্চল নিমাই এখন শান্ত জ্যোতির্ময়। পরিচিত স্থান দর্শন করতে করতে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন নিজ বাড়ীর দিকে, সঙ্গে চলে জনতা। মনে মনে তিনি পরিচিত স্থান, গাছপালা সকলের কাছ থেকেই বোধ হয় বিদায় নিলেন। গৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মুণ্ডিতমস্তক, গেরুয়া-বস্ত্র দোপাট্টি ক'রে বুকের ওপর দিয়ে ভাঁজ দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা, কাঁচা সোনার দেহ, সুবলিত দীর্ঘ বাহু, পায়ে খড়ম। গৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই জনতার মধ্যে ক্রন্দনের রোল প'ড়ে গেল। শেষবারের মতো দর্শন। জননী এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে, প্রণাম করলেন গৌরাঙ্গ। বিদায়-ব্যথা যেন নূতন ক'রে সকলকে আকুল ক'রে তোলে।

গৌরাঙ্গ বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের বাসকক্ষ, গৃহ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করছেন। সকলের মনেই এক চিন্তা—শেষ দর্শন। এমন সময় মলিন বস্ত্র-পরিহিতা, বিশীর্ণ দেহা এক রমণী এসে পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলেন। স্বর্ণপ্রতিমার মতো অবয়ব কিন্তু শোকে দুঃখে বিবর্ণ। মহাপ্রভু অবগুণ্ঠনে-ঢাকা স্ত্রীলোক দেখে কয়েক পা পিছিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি?

—আমি তোমার দাসীর দাসী।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শনের জন্য যখন সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হয়েছে, তখন তিনি একাকী গৃহকোণে লুকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। তাঁর স্বামী জগৎপূজ্য কিন্তু তাঁর কি পূজা-নিবেদনেরও অধিকার নাই? গৌরাঙ্গের কৃপা সকলের ওপর বর্ষিত হয় কিন্তু তাঁর নিজের বেলাতেই কি হবে এর ব্যতিক্রম? নিজের মনেই নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি জানেন গৌরাঙ্গ স্ত্রীলোক দর্শন করেন না। তবে তিনি কি স্বামী-দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেন চিরদিনের জন্য? অনেক চিন্তা ক'রে অবশেষে মরীয়া হয়েই তিনি সহস্র লোকের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই সুযোগ হারালে জীবনে আর সুযোগ পাবেন না তিনি।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঐ অবস্থায় দেখে গৌরাঙ্গের অন্তরে দুঃখ জেগে ওঠে। আত্ম-সম্বরণ ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কী প্রার্থনা তোমার?

আবেগমিশ্রিত মধুর কণ্ঠে উত্তর হয়—প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করলেন, আমি একাই কি শুধু প'ড়ে থাকব?

জনতা স্তব্ধ। বাতাস স্থির। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি ওঠে প্রত্যেকের মনে। নীরবে অপেক্ষা করেন সবাই গৌরাঙ্গের উত্তরের জন্য।

সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর জীবনের এই ঘটনাটি গৌতম বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতোই। বুদ্ধদেব পরমজ্ঞান লাভ করার পর রাজধানীতে ফিরে এসেছেন পিতা ও পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। পুত্র রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে গোপা এসে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালেন—প্রভু, আমাকে তোমার সংঘে যোগদানের অনুমতি দাও। তোমার করুণায় জগৎ প্লাবিত হ'ল, বঞ্চিত থাকব শুধু আমি? ভগবান তথাগত শুধু স্মিতহাসি হাসলেন, বললেন—সংঘে স্ত্রীলোকের স্থান নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রশ্ন শুনে গৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন। পরে বলেন—তুমি তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন করো। তুমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া হও।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন—আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাউকে যে দেখতে পাইনে। আমার অন্তর সবখানিই তুমি-ময়।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। গৌরাঙ্গ বলেন—আমি সন্ন্যাসী। তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছু নাই; শুধু আছে আমার পাদুকা-জোড়া। তুমি এইটি গ্রহণ করো। এইটিই তোমার কাছে আমার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হয়ে থাকুক।

সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যে দান পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে পাদুকা-জোড়া মাথায় তুলে নেন তিনি। তারপর বুকের ওপর স্থাপন ক'রে অধর দিয়ে স্পর্শ করেন সেই স্মারক নিধি। ক্ষণেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ধীরে ধীরে ফিরে যান নিজের গৃহের অভ্যন্তরে। নীরব জনতা এই অপূর্ব মধুর, আনন্দ ও বেদনাপূর্ণ বিদায়-দৃশ্য অবলোকন করে। তারপর ওঠে গগনভেদী হরিধ্বনি। অন্ধকার ঘর থেকে একটি ক্ষীণ প্রদীপ দিনের আলোয় বেরিয়ে এসেছিল; আবার ফিরে গেল অন্ধকার ঘরে। তার করুণসুন্দর চিত্র মানুষের মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রইলো।

# দবির খাস ও সাকর মল্লিক

নবদ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গ চললেন বৃন্দাবন অভিমুখে। গঙ্গার তীর ধ'রে যাত্রা সুরু হ'ল। সঙ্গে অগণিত লোকজন। বৃন্দাবন গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দর্শন করবেন সেই আনন্দে, কৃষ্ণ-ভাবে অন্তর পরিপূর্ণ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে চলেন। তাঁর এমনি আকর্ষণ যে, সঙ্গীদল ক্রমে বেড়েই চলে। এইভাবে গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। দিবানিশি হরিনাম-সংকীর্তন, আনন্দ মহোৎসব। যে স্থানে গৌরাঙ্গ অবস্থান করেন তা বহুলোকের কল-কোলাহলে পূর্ণ।

গৌড়ের মুসলমান রাজা হুসেন শাহ। তাঁর রাজধানীর কাছাকাছি হাজার হাজার লোকের সমাবেশের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কেশব ছত্রি নামে এক মন্ত্রীকে আদেশ করলেন। পাছে গৌরাঙ্গের কোন ক্ষতি হয় এই ভয়ে মন্ত্রী রাজাকে জানালেন—ব্যাপার কিছুই নয়, একজন সন্ন্যাসীর আগমন ঘটেছে, চলেছে বৃন্দাবনের দিকে ; সঙ্গে আছে কিছু ভক্ত। তাদেরই কল-কোলাহল।

কেশব ছত্রির কথায় রাজার কৌতূহল আরো বেশী হ'ল। তিনি মনে মনে বিচার করলেন—এই সন্ন্যাসী কি সামান্য ? যাঁর দর্শনের জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হয়, যাঁর আজ্ঞা পালনের সুযোগ পেলে লোকে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, যাঁর সেবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে দিবারাত্রি তাঁর কাছে কাছে রয়েছে, তিনি কি সামান্য ? বেতন নিয়ে রাজার কর্মচারীরা তাঁর কাজ করে ; এক মাসের বেতন না দিলে তাদের মধ্যে জেগে ওঠে অসন্তোষ। অথচ এই সন্ন্যাসী কপর্দকহীন, কাকেও এক পয়সা দেবার সামর্থ্য তাঁর নাই। তবু কিসের আকর্ষণে এত লোক তাঁহার আজ্ঞাবহ ? ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন এমন সামর্থ্য সাধারণ মানুষের হ'তে পারে না। এই সন্ন্যাসীর কী সে ঐশ্বর্য যার বলে তিনি রাজার চেয়েও বড় ? রাজা হুসেন শাহ তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রী দবির খাস ও সাকর মল্লিককে ডেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

দবির খাস ও সাকর মল্লিক দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। কর্মনিষ্ঠ, বিচক্ষণ, বিশ্বাসী। মুসলমান রাজার অধীনে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ ক'রে মন্ত্রীর পদ লাভ করেছেন। মুসলমানী নাম রাজারই দেওয়া। বিধর্মী রাজার অধীনে কাজ করতে অনেক সময় তাঁদের হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে, হিন্দুদের পক্ষে অপ্রীতিকর কাজ-ও করতে হয়েছে। রাজকার্যে তাঁদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট, অর্থোপার্জনও প্রচুর। সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা সবই আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ নাই; তাই ব'লে তাঁরা যে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন তা নয়। অন্তরে তাঁরা হিন্দু, হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলার কথা তাঁরা শুনেছেন, মন উৎসুক হয়েছে তাঁর দর্শনের জন্য কিন্তু সুযোগ হয়নি। চিঠি লিখে তাঁরা মহাপ্রভুর কাছে নিজেদের মনের কথা জানিয়েছেন গোপনে। এবার প্রেমের ঠাকুর এসেছেন বাড়ীর কাছে। তাঁরা সঙ্কল্প করেছেন গোপনে একদিন গিয়ে তাঁর চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করবেন। এই সময়ে রাজা তাঁদের কাছে সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চাইলেন।

মন্ত্রী দুজন গৌরাঙ্গের আসল পরিচয়ই দিলেন রাজার কাছে। বললেন—নবদ্বীপের পরম পণ্ডিত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি। প্রেমভক্তির উৎস তিনি। পতিতকে উদ্ধারের জন্যই তাঁর এ লীলা। ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে কে কাকে মানে! আর্থিক ঐশ্বর্য এ সন্ন্যাসীর নাই কিন্তু তিনি সেই অমূল্য সম্পদের অধিকারী যার কাছে জগৎ-সংসারের সব-কিছুই তুচ্ছ।

হুসেন শাহ বুঝতে পারেন, এ সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ নন। তিনি আদেশ দেন—কেউ যেন কোন প্রকারে এ সাধুর বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। তাঁর যতদিন খুশি এ রাজ্যে থাকুন, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই ঈশ্বর-ভজনা করুন।

*　　*　　*　　*

গভীর রাত্রি। গৌরাঙ্গকে ঘিরে হরিনাম-কীর্তন চলেছে। কারো যেন ক্লান্তি নাই। অপূর্ব উদ্দীপনায় সকলের অন্তর পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত। দুজন মলিন বেশধারী ব্যক্তি প্রভুর চরণ-দর্শন-মানসে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ পান না। অবশেষে নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিজেদের পরিচয় দিলেন, জানালেন মনের বাসনা। দবির খাস ও সাকর মল্লিক। নিত্যানন্দ তাঁদের সাদরে

নিয়ে যান মহাপ্রভুর পাশে, পরিচয় করিয়ে দেন। মন্ত্রীদ্বয় মাটিতে লুটিয়ে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। অপূর্ব সুন্দর তনু, প্রেমাশ্রুতে টলমল পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেইদিকেই যেন অমৃত বর্ষণ হয়। চন্দন-লেপিত বক্ষ, পরণে সুন্দর কৌপীন, চরণ দুটি পদ্মের কোরকের মতো মনোহর, দশ নখ যেন দশটি নির্মল দর্পণ। নবনীত কোমল দেহ মধুরভাবে সদাই উৎফুল্ল ; কাঁঠালের কাঁটার মতো দেহে পুলকরোমাঞ্চ। কখনো অট্ট অট্ট হাসি, কখনো অশ্রুধারায় ভূমি হয় সিক্ত ; কখনো বা গভীর মূর্ছায় দেহ অসাড় কিন্তু জ্যোতির্ময়।

দন্তে তৃণ ধরি, দুই ভাই গৌরাঙ্গের নিকটে মাটিতে দীঘল হয়ে পড়েন, বলেন—দয়ার অবতার তুমি। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার ক'রে তোমার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছ। আমরা তাদের চেয়েও বেশী পাপী, কারণ আমরা অন্যায় করেছি সজ্ঞানে নিজেদের স্বার্থের জন্য। কাজেই আমাদের মতো দয়ার পাত্র আর তুমি পাবে না, প্রভু। শ্রীউমাশংকর সরকার

অনুশোচনায় অন্তর তাঁদের পুড়ে যায়। জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে চেয়ে কোন আনন্দ ও শান্তির উপাদান মেলে না। কৃতকর্মের জন্য মর্মবেদনা বোধ করেন ; তাই গৌরাঙ্গের কাছে এসেছেন পবিত্র পুণ্য জীবনের সন্ধানে। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি তাঁদের কাছে আর আকর্ষণের বস্তু নয়।

দুই ভাইয়ের দীনতা দেখে, অন্তরের আকুতি উপলব্ধি ক'রে মহাপ্রভুর দয়ার সঞ্চার হয়েছে। স্নেহ-সম্ভাষণে বলেন—তোমাদের দুঃখে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়। ওঠ, তোমরা আত্ম-সম্বরণ করো। তোমাদের মন আমি জানি ; যে চিঠি লিখেছিলে তাতেই তোমাদের অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই গৌড়দেশে এসেছি। কৃষ্ণ তোমাদের অচিরে কৃপা করবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ থেকে তোমরা দু'ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হবে।

মন্ত্রী দুজন নিজেদের ধন্য মনে করেন। বহু ক্লেদযুক্ত মলিন বসন ফেলে দিয়ে নূতন পবিত্র বসন পরিধান করলে মনে যে সন্তোষ ও পবিত্রতার পরশ লাগে, মুসলমানের-দেওয়া নামের পরিবর্তে গৌরাঙ্গের-দেওয়া নাম গ্রহণ ক'রে দবির খাস ও সাকর মল্লিক তেমনি পূত-স্নিগ্ধতা অনুভব করেন। নোংরা শুঁয়াপোকা যেন খোলস পরিত্যাগ ক'রে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে।

বিদায় নিয়ে আসার সময় সনাতন গৌরাঙ্গকে বলেন—এত লোকজন সঙ্গে নিয়ে কি বৃন্দাবন যাওয়ায় সুখ হবে? আর স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার কাছাকাছি না থাকাই ভালো।

মহাপ্রভু নিজের মনে বিচার ক'রে দেখেন কথা দুইটি ঠিক। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। সেই ভাবে ভাবিত হয়েই সেখানে যাওয়া উচিত; দলবল নিয়ে বিজয়ী সেনাপতির মতো গমন অসার্থক এবং অশোভন। আর সত্যই রাজসন্নিধানে সন্ন্যাসীর অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষমতাপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী বিধর্মী রাজার কখন কোন্ মতিগতি হয় কে জানে!

পরদিন প্রভাতে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাওয়ার অভিলাষ পরিত্যাগ ক'রে নীলাচল অভিমুখে ফিরে চললেন। ভক্তদের জানালেন, শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে ফিরে যাবেন; পরে সেখান থেকে বৃন্দাবন-যাত্রা করবেন। জন-তরঙ্গ আবার ফিরে চললো শান্তিপুরের দিকে। শচীমাতা নিমাই-দর্শনের জন্য দোলায় চ'ড়ে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাসভবনে। সেখানে আনন্দের মহোৎসব প'ড়ে গেল। শান্তিপুর থেকে গৌরাঙ্গ ফিরে এলেন নীলাচলে; মহাপ্রভুকে ফিরে পেয়ে সেখানকার ভক্তবৃন্দের মধ্যে আবার আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠলো। ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করা হ'ল বর্ষার চার মাস নীলাচলে অবস্থান ক'রে শরৎকালে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাত্রা করবেন, এবার আর দলবল নিয়ে নয়, একজন কি দুজন সঙ্গী নিয়ে।

## বৃন্দাবন অভিমুখে

নবদ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মহাপ্রভুর মনে বৃন্দাবন-দর্শনের বাসনা প্রবল হ'তে থাকে। প্রথমবারে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরই তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন, ছুটে চলেছিলেন সঙ্গীদের পিছনে ফেলে কিন্তু যাত্রা সফল হয়নি। নিত্যানন্দ পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শান্তিপুরের দিকে। দ্বিতীয়বার মাতৃদর্শনের পর যাত্রা করেছিলেন বৃন্দাবন অভিমুখে। সঙ্গে লোকজন জুটে গেল অনেক ; তাদের কল-কোলাহলে পথ মুখরিত। সেবার-ও যাত্রা সফল হ'ল না। ফিরে এলেন শ্রীক্ষেত্রে। এখন বৃন্দাবনের ভাবে তিনি সদাই তন্ময় হয়ে থাকেন। সেই কামনার স্থান, স্নিগ্ধ সুধামণ্ডিত লীলাক্ষেত্র কি তাঁর কাছে মরীচিকার মতো সদাই দূরেই থাকবে। সেখানে কি সত্যিই যাওয়া সম্ভবপর হবে ? যতই ভাবেন ততই গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। লীলাময় কৃষ্ণের চরণস্পর্শে যে-স্থানের ধূলিকণা পবিত্র হয়েছে, তাঁর অঙ্গসৌরভে যেখানকার বাতাস সুরভিত হয়েছে, বৃক্ষলতা শোভাময় হয়েছে, সেই বাঞ্ছিত স্থানের জন্য মন অধীর হয়ে ওঠে। ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেন—আমার কি বৃন্দাবন যাওয়া হবে ? তোমরা বল, আমার কি বৃন্দাবন-দর্শন হবে ?

শরৎকাল। প্রাচীনকালে রাজারা শরৎকালে বিজয়-উৎসবে বের হতেন। শরৎকাল নাতিশীতোষ্ণ। অতিবৃষ্টি নাই ; সূর্যের তাপ-ও অত্যধিক নয়। দূরদেশে পদব্রজে যাওয়ার পক্ষে এই সময়ই প্রশস্ত। মহাপ্রভু স্থির করেছেন বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে জগন্নাথ-ক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করবেন। স্বরূপ-দামোদর এবং রাম রায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয়েছে, তীর্থপর্যটনকামী বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁর এক ভৃত্য মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকবেন। দীর্ঘ পথ। বনভূমি অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। সঙ্গে কেউ না থাকলে পথে তাঁর খাদ্য-পানীয় জুগিয়ে দেবে কে ? কৃষ্ণভাবে ভাবিত মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানরহিত। জলাশয় দেখলে কালিন্দী মনে ক'রে হয়ত তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন, সবুজ পত্রাচ্ছাদিত তরুণ বৃক্ষ দেখলেই হয়ত কৃষ্ণভ্রমে তাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যাবেন !

নবমী তিথির শেষরাত্রিতে মহাপ্রভু দুজন সঙ্গী নিয়ে যাত্রা করলেন। লোক-চলাচলের নির্ধারিত পথ পরিত্যাগ ক'রে ছোট বনপথ দিয়ে চললেন।



১৬

কটক ডানদিকে রেখে তাঁরা ঝারিখণ্ডের বনের ভিতর প্রবেশ করলেন। বনপথ নির্জন। অনেক দূরে দূরে কদাচিৎ ছোট লোকালয়। নিবিড় অরণ্যের শোভা মন মুগ্ধ করে। পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছেন বলভদ্র ; প্রভু চলেছেন আপনভাবে বিভোর হয়ে, কণ্ঠে তাঁর মধুর কৃষ্ণনাম। বর্ষান্তে বৃক্ষরাজি সবুজ সতেজ। লতায় পল্লবে, ফুলে মুকুলে অরণ্য সজ্জিত। আবেগবিহ্বল কণ্ঠে মধুর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়। বনভূমিতে যেন পুলক-শিহরণ জাগে।

নিবিড় অরণ্য, বন্য জীবজন্তুর আবাস। দলে দলে হরিণ চরে ; ময়ূর-ময়ূরী পেখম ধ'রে নাচে। নদীর স্রোতে বন্য হাতীর দল স্নান করতে আসে, জল ছিটিয়ে তারা করে জলকেলি। পথের মধ্যে বিশালকায় বাঘ। তারই রাজ্য ; ভয় করবে কাকে! হিংস্র জীব দেখে বলভদ্র ভীত হয়ে পড়েন কিন্তু মহাপ্রভুর আনন্দকৌতুক যেন এতে বেড়ে যায়। উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করেন, জীবজন্তুর সঙ্গে কৌতুক করেন, বলেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। বুনো হাতীর দল স্নান করছে ; শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে স্নান করতে যেয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে তাদের গায়ে জলের ছিটা দেন। সঙ্গীদের আশঙ্কা হয়—এই বুঝি কোন বিপদ ঘট্‌লো! পথ জুড়ে বাঘ শুয়ে আছে। কী উপায় হবে, ভাবেন বলভদ্র ও তাঁর সঙ্গী। প্রভু আনন্দে মাতোয়ারা। বাঘের কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করেন। স্বর্ণকান্তি দেহ পুলকে উদ্ভাসিত। পদ্মদলসদৃশ নয়ন প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত। বাঘ পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়ায়, কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে চলে যেন পোষা আদরের প্রাণী। হরিণ-হরিণী এসে প্রভুর গা চেটে সোহাগ দেখায় ; কলকণ্ঠ পাখী সঙ্গীত দিয়ে বন্দনা করে। মনুষ্য-বর্জিত স্থানে এরাই যেন মহাপ্রভুর যত্ন পরিচর্যা অভ্যর্থনার ভার নিয়েছে।

পথে কোন পল্লীতে গিয়ে উপনীত হ'লে প্রভুকে দর্শনের জন্য গ্রামবাসীরা এসে সমবেত হয়। তাঁর কণ্ঠে কৃষ্ণনাম শুনে সবাই নামকীর্তনে মেতে ওঠে। যেদিন যেখানে অবস্থান করেন সেখানেই যেন মহোৎসব পড়ে যায়। লোকালয় না থাকলে বনের ভিতরই তাঁরা অবস্থান করেন। বলভদ্র বন্য শাক ফল মূল দিয়ে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। ভৃত্য বস্ত্র, জলপাত্র, তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য বহন করে। প্রভু কখনও স্নিগ্ধ শীতল ঝরনার জলে স্নান করেন ; কোনদিন বা নির্ঝরের উষ্ণ জলে স্নান। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আগুন জেলে তার পাশে

বসে বিশ্রাম। বনপথ পরিক্রমা নূতন পরিবেশে, নূতন অভিজ্ঞতায়, অন্তরের আনন্দরসে মধুময় হয়ে ওঠে।

পরম সন্তোষ প্রভু বন্য-ভোজনে,
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জনে।

*   *   *   *

নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার
দুই সন্ধ্যা অগ্নি-তাপে, কাষ্ঠ অপার।
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন,
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন—
শুন ভট্টাচার্য! আমি গেলাম বহুদেশ
বনপথে সুখের সম কাঁহা নাহি লেশ॥

*   *   *   *

বৃন্দাবনের পথে ঝারিখণ্ড পার হয়ে মহাপ্রভু কাশীধামে এসে উপনীত হয়েছেন। মধ্যাহ্ন কাল। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানে নেমেছেন তিনি। তাঁর ভুবনমোহন রূপে স্থান যেন আলোকিত হয়ে যায়। যে দেখে তার চোখের তৃপ্তি হয় না। আকর্ণবিস্তৃত শিশিরসিক্ত পদ্মদলের মতো চক্ষু, তিলফুলের মতো সুদৃশ্য নাসা, আজানুলম্বিত বাহু, কনক-গৌর দেহকান্তি। সর্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব ; তার ওপর ভাবাবেশে প্রায়ই আত্মস্থ থাকেন। অপূর্ব দ্যুতিতে সর্বশরীর ঝল্‌মল্ করে। সেই স্নানের ঘাটে তপন মিশ্র স্নান করছিলেন। নয়ন-বিমোহন সন্ন্যাসীকে দেখেই তিনি চিনলেন—ইনি নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গ হবেন। প্রভু স্নান সমাপন ক'রে তীরে উঠলেই তপন মিশ্র তাঁর চরণ বন্দনা ক'রে নিজের পরিচয় দিলেন এবং ভক্তিভরে অভ্যর্থনা ক'রে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন।

প্রভুর নির্দেশে তপন মিশ্র এবং তাঁর বন্ধু চন্দ্রশেখর বারাণসীতে এসে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা এতদিন প্রভুর আগমনের পথ চেয়ে দিন যাপন করেছেন। তাঁরা জানতেন ভক্তবৎসল মহাপ্রভু একদিন তাঁদের প্রতি দয়া প্রকাশ ক'রে দর্শন দেবেনই। মিশ্র চন্দ্রশেখরকে আগমন-বার্তা জানাতেই তিনি এসে প্রভুর চরণে পতিত হলেন। তাঁদের অনুরোধে প্রভু বারাণসীতে দশদিন অবস্থান ক'রে বৃন্দাবন যাত্রা করবেন স্বীকার করলেন।

*   *   *   *

এই সময়ে কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বহু শিষ্য নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। শিষ্যদের নিকট তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিবাদে তাঁর আস্থা নাই। মায়াবাদী, ব্রহ্ম-উপাসক তিনি। নিজেকে ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী তিনি। প্রভু যখন তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন জনৈক মারাঠী ব্রাহ্মণ তাঁকে দর্শন করতে আসেন। প্রকাশানন্দের শিষ্য তিনি। মহাপ্রভুর জ্যোতির্ময় দেহ, তাঁর ভাব-সমাধি, তাঁর ভক্তির আকুলতা, তাঁর মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত অবয়ব দেখে তিনি মুগ্ধ হন। মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম; যে শোনে তার মরমে গিয়ে দোলা দেয়। মারাঠী ব্রাহ্মণ গিয়ে তাঁর গুরুদেব প্রকাশানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবরণ জানালেন। আজানুলম্বিত বাহু, দেহে ঈশ্বর-লক্ষণ বিরাজিত; যে তাঁকে দর্শন করে সে-ই কৃষ্ণকীর্তনে মেতে ওঠে। নাম কৃষ্ণচৈতন্য। যেমন সুন্দর নাম, রূপ-ও তাদৃশ।

আপন শিষ্যের মুখে ভক্তপ্রেমিক গৌরাঙ্গের বর্ণনার মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার ভাব ফুটে ওঠে, তাতে প্রকাশানন্দের অহংবোধ দীপ্ত হয়ে ওঠে; অন্তরে কিছুটা ক্ষুব্ধ হন তিনি। বাইরে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলেন—জানি, জানি, চৈতন্য নামে একজন নবদ্বীপবাসী আছে। কিন্তু তাকে সন্ন্যাসী বলে কে? সে তো একজন ঐন্দ্রজালিক। কেশব ভারতীর শিষ্য; বহু লোকজন সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে নেচে গেয়ে কেঁদে বেড়ায়। লোকে নাকি তাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে! শুনেছি পণ্ডিত সার্বভৌম-ও নাকি তার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তার ভাব-কালী কাশীতে বিকাবে না। তোমরা বেদান্তের ওপর আস্থা রাখো, বেদান্ত শ্রবণ কর, ও-সব ভেলকি দেখার জন্য যেও না।

মারাঠী বিপ্র অনুভব করেন, কোথায় যেন দীনতা রয়েছে। তাঁর গুরুর বাক্য যুক্তি ও বিচারের পথ ধ'রে না চ'লে যেন আত্ম-সঙ্কোচনের প্রয়াসী। গৌরাঙ্গদেব তো অপরের প্রতি কটূক্তি, কটাক্ষ করেন না। খাঁটি জিনিস সব সময়েই খাঁটি, অন্যে তার অপবাদ দিলেও গ্রাহক তা ঠিকই চিনে নেয়। মারাঠী প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে প্রকাশানন্দের কথাগুলি তাঁকে বলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রকাশানন্দের যে অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে তিনি লজ্জিত, ব্যথিত। কিন্তু সর্বংসহ মহাপ্রভু স্মিতহাসি হাসেন শুধু। তাঁর ভাব-কালী কাশীতে বিকাবে না ব'লে প্রকাশানন্দ যে দম্ভ করেছেন, তা

শুনে তিনি মৃদু হাসি হেসে বলেন—ভারী বোঝা নিয়ে এসেছি, না বিকায় বিলিয়ে দেব।

প্রকাশানন্দ শিষ্যদের কাছে প্রভুর কথা বলার সময় অবজ্ঞাভরে কেবল চৈতন্য ব'লে অভিহিত করেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেননি। এ-কথা শুনে প্রভু বলেন—প্রকাশানন্দ যে রাগের বশে ওরূপ করেছেন তা নয়; মায়াবাদীরা নিজেদের ব্রহ্ম ব'লে জ্ঞান করে। কাজেই তাদের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আসে না।

* * * *

কাশীতে দশদিন অবস্থান ক'রে মহাপ্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন, সঙ্গী সেই দুজন ব্রাহ্মণ। কাশী থেকে আর কাউকে সাথী করলেন না। বৃন্দাবনের দিকে যতই এগিয়ে চলেন মন ততই আকুল হয়ে উঠতে থাকে, বহুদিনের বাঞ্ছিত আনন্দময় স্থানের সৌরভ যেন বাতাসে ভেসে আসে। প্রয়াগে উপস্থিত হয়ে এবার সত্যসত্যই যমুনার দর্শন পেলেন, যমুনা এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; তার নীল স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলধারা গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এই তো সেই যমুনা যার কূলে নীলকান্তমণি রূপের হাট আলো ক'রে বিহার করতেন! এরই জলে অবগাহন ক'রে ক্রীড়া করেছেন বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর অঙ্গ-সৌরভে যে জল হ'ত সুরভিত তার রেশ কি এখনও আছে? উল্লাসে আত্মহারা হয়ে মহাপ্রভু ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নদীতে; অনেকক্ষণ ডুবে থাকেন। সঙ্গী বলভদ্রের ভয় হয় অচেতন হয়ে পড়লেন না তো! জলে নেমে ধ'রে টেনে তোলেন। পথে এগিয়ে যেতে যেতে যখনি যমুনা দেখা যায়, প্রভু ভাবে বিভোর হয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শীতকাল। তীব্র কন্কনে শীত কিন্তু তাঁর দেহবোধ নাই। বলভদ্রের কষ্ট হয় বারংবার। এইভাবে মথুরায় এসে উপনীত হলেন। বিশ্রামঘাটে স্নান ক'রে প্রভু আনন্দে ভাব-নৃত্য সুরু করলেন। সোনার অঙ্গ থেকে কোমল সূর্যকিরণ ঠিক্‌রে পড়ে; ভাবে ঢুলুঢুলু কমল আঁখি, অবিরল ধারায় জল পড়ে অঙ্গ বেয়ে, দেহে পুলকরোমাঞ্চ। নবীন সন্ন্যাসীকে ঘিরে দর্শকের সমাবেশ হয়, যে দেখে সে চোখ ফিরাতে পারে না। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য কৃষ্ণদাস এসে এখানে গৌরাঙ্গের চরণে প্রণিপাত করেন। ভক্ত-সাধকের ভক্ত-শিষ্য, প্রভু তাঁর হাত ধ'রে প্রেমানন্দে নৃত্য করতে থাকেন।

মথুরা থেকে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সেই বৃন্দাবন যার মানসরূপ ধ্যান ক'রে তিনি কত দিবস-রজনী আকুল আগ্রহে অশ্রুপাত করেছেন ; আজ সেই পুণ্যক্ষেত্রের ভূমি স্পর্শ করতে পেরে আনন্দে তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। এই বৃন্দাবনের ধূলিকণা শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে ; এখানকার বৃক্ষলতা, ফুল, পাখী কৃষ্ণের বারতা জানে ; যে যমুনা দূর্বাদলশ্যাম কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ বক্ষে ধারণ করেছে আজ তিনি সেখানে অবগাহন ক'রে সেই আনন্দ শিরায় শিরায় অনুভব করছেন, সেই শীতল জল পান ক'রে হৃদয় পরিতৃপ্ত করছেন। বৃন্দাবনের পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে ঘোরেন, সর্বত্রই তিনি অনুভব করেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের স্পর্শ। কৃষ্ণনাম বলতেই যাঁর চোখে নামে প্রেমাশ্রুর বন্যা, কৃষ্ণের লীলাস্থলে এসে তিনি ভাবের সাগরে ডুবে থাকেন। এমন অবস্থায় অন্তরে এই কথাটিই ধ্বনিত হ'তে থাকে :

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হ'য়েছে মগন।

* * * *

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্মের নামে লোক মেতে ওঠে, সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শনের জন্য ভারতবাসীর অন্তরে আকুলতা সকল যুগেই দেখা গেছে। মহাপ্রভুর নিজের আকর্ষণ অসাধারণ। যে তাঁর দেবদুর্লভ কান্তি দেখে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না, যে তাঁর কণ্ঠে ভাবের আবেগ-মাখা কৃষ্ণনাম শোনে তার কানে তা বরাবরই ধ্বনিত হ'তে থাকে। বৃন্দাবনে তাঁর আনন্দবিহ্বল নৃত্য আর কৃষ্ণনাম কীর্তন শুনে হাজারে হাজারে লোক নিত্য তাঁর দর্শনের জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন প্রেমে ডুবুডুবু হয়।

বৃন্দাবন দর্শন-শেষে গৌরাঙ্গ ফিরে যাত্রা করেন ; সঙ্গে তাঁর দুই সঙ্গী বলভদ্র ও ব্রাহ্মণ-ভৃত্য কৃষ্ণদাস ও একজন রাজপুত। পথে এক গাছের নীচে সবাই বসেছেন পথের ক্লান্তি দূর করতে, অদূরে কতকগুলি গাভী চরছে। প্রান্তরে গাভীদলকে বিচরণ করতে দেখে প্রভুর মনে কৃষ্ণের গোচারণের

লীলাকথা জেগে ওঠে। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন সেদিকে। অকস্মাৎ রাখাল-বালকের বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসে বাতাসে। এ কার বংশীধ্বনি? গৌরাঙ্গের ভাব উথলিয়ে ওঠে। বর্তমান জগৎ তাঁর চোখে লুপ্ত হয়ে যায়, মন তাঁর চলে গেছে সেই কৃষ্ণলীলার ভাবযুগে। অচেতন হয়ে পড়েন তিনি; মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হ'তে থাকে, দেহ কদমফুলের মতো রোমাঞ্চ-কণ্টকিত। সঙ্গীরা তাঁর চেতনা-বিধানের চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু কোন ফল হয় না।

এমন সময়ে সে-পথ দিয়ে চলেছেন এক পাঠান রাজপুত্র, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অস্ত্রধারী সৈনিক। সুদর্শন এক সন্ন্যাসীকে গাছের নীচে অচেতন অবস্থায় দেখে তাঁর মনে হ'ল—সঙ্গীরা বোধ হয় কোন কিছু খাইয়ে সাধুকে অজ্ঞান ক'রে রেখে তাঁর টাকাকড়ি কেড়ে নেবার মতলব করেছে। সৈন্যদের হুকুম দিলেন সাধুর সঙ্গীদের হাত-পা বেঁধে রাখতে; সাধুর জ্ঞান ফিরে না এলে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে।

সাথীরা অনুনয় ক'রে জানালেন প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু মুসলমান রাজপুরুষ সে-কথা বিশ্বাস করলেন না। গৌরাঙ্গের অনুগত সঙ্গীরা পড়লেন মহা ফাঁপরে। এমন সময় প্রভুর চেতনা ফিরে এল, আনন্দে হুঙ্কার ক'রে উঠে তিনি মধুর প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন।

রাজকুমার ও পাঠান সৈন্যগণ গৌরাঙ্গের এই ভাবান্তর দেখে বিস্মিত ও ভীত হয়েছেন। তাঁর সাথীদের বন্ধন মোচন ক'রে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুকে শান্ত ক'রে উপবেশন করালে মুসলমান রাজপুত্র তাঁর সঙ্গিগণসহ গৌরাঙ্গের চরণে প্রণত হয়ে বললেন—গোঁসাই-ঠাকুর, এই দুষ্ট পথিকেরা আপনার অনিষ্ট করার মতলবে ছিল; মনে হয় আপনার টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে আপনাকে কিছু খাইয়ে সংজ্ঞাহীন করেছিল।

স্মিত হাসি হাসেন শ্রীগৌরাঙ্গ—না, এঁরা আমার অনিষ্টকারী নয়, এঁরা আমার হিতকামী সঙ্গী। আমার মূর্ছারোগের উপশমের জন্য সদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

অপ্রতিভ হন রাজকুমার। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজধর্ম। অন্যায় দমন করতে তিনি নিজেই এক অন্যায় কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলেন ভেবে লজ্জিত হন। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যোতির্ময় অঙ্গকান্তি ও দেবভাব লক্ষ্য

ক'রে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন। প্রভুর করুণাঘন নীল-পদ্মদলসম নয়নযুগল হ'তে স্নিগ্ধ দ্যুতি বর্ষিত হ'তে থাকে।

* * * *

কৃষ্ণদেহকে বক্ষে ধারণ ক'রে যমুনা ধন্য হয়েছে। যমুনা দেখে তাই সদাই যমুনাবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে। যমুনা প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; প্রয়াগ ছেড়ে গেলে যমুনা-দর্শন আর হবে না—তাই যমুনার কাছে কয়েকদিন অতিবাহিত ক'রে বিদায় নেবেন এই মানসে গৌরাঙ্গ প্রয়াগে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে রূপ গোস্বামী এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রেম ও ভক্তির মিলন ঘট্‌লো, গঙ্গা-যমুনার মিলনের মতোই।

দুই ভাই। বিচক্ষণ এবং কর্মদক্ষ। গৌড়ের মুসলমান নৃপতির অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। মুসলমান রাজার-দেওয়া নাম দবির খাস ও সাকর মল্লিক; গৌরাঙ্গ এঁদের নাম দিয়েছিলেন রূপ ও সনাতন। ধন, যশ, প্রতিপত্তি সবই ছিল এঁদের, সংসারের মোহ-আবর্তে সর্বাঙ্গ নিমজ্জিত ক'রে হিতাহিত-বোধ ভুলে দিনযাপন করছিলেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বস্তু সবই ছিল কিন্তু মন তবু ছিল অতৃপ্ত। বৃন্দাবন-দর্শন-মানসে প্রভু যখন প্রথমবার যাত্রা করেছিলেন, তখন দুই ভাই গোপনে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সেইটি হয়েছিল তাঁদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। নূতন জীবনের আলো প্রবেশ করেছিল তাঁদের মনের নিবিড় কালো গুহায়। অধীর হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা ধন-সম্পদের বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে সংসারের কলুষ আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে বৈরাগ্য ও ভক্তির নির্মল উদার আকাশতলে শুদ্ধ জীবন যাপনের কামনায়। গৌরাঙ্গ রামকেলী গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর রূপ গৌড়ের নবাবের মন্ত্রীর পদ ত্যাগ ক'রে গৃহে চলে যান। সনাতন তখনও গৌড়ে। তিনি-ও উন্মনা; রাজকার্যে মন বসে না। অসুস্থ হয়েছেন এই কথা ব'লে রাজসভায় উপস্থিত হন না। রাজা হুসেন শাহ গুণগ্রাহী। তিনি এই যোগ্য কর্মচারীকে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছুক নন। নিজের চিকিৎসক সনাতনের বাসভবনে পাঠিয়ে খোঁজ নেন সত্যই তিনি অসুস্থ কিনা। বুঝতে পারেন সাকর মল্লিক অসুখের ভান ক'রে রয়েছেন, মতলব বোধ হয় দবির খাসের মতো কার্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যাওয়া। রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে কার্য পরিত্যাগ না করতে অনুরোধ করেন কিন্তু নূতন জীবনের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, রাজার সম্মুখেই তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন।

তখন রাজার আদেশে সনাতন কারারুদ্ধ হলেন। মন তাঁর সংসার ছেড়ে চলে গেছে; বিষয়-কথা আর ভাল লাগে না, কৃষ্ণনাম-কীর্তন শুনলে হৃদয় পুলকিত তৃপ্ত হয়, অথচ নিজে ছাড়লেও সংসার তাঁকে ছাড়ে না! কিন্তু মন যার উদাসী হয়ে গেছে তাকে বেঁধে রাখতে কে পারে!

* * * *

রূপ গৃহে গেছেন; রাজকার্যে আর ফিরে আসবেন না। সংসারে তাঁর এবং সনাতনের পুত্রকন্যা ছিল না। ছোট ভাই অনুপমের এক পুত্র, নাম শ্রীজীব। বড় দুই ভাইয়ের অর্থ-সম্পত্তি যা ছিল তা শ্রীজীবকে কিছু এবং দীনদুঃখীদের মধ্যে অবশিষ্ট বিতরণ ক'রে দিলেন। মন বৈরাগ্যে পূর্ণ। ধন-সম্পদের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন; মন প্রস্তুত, পরিবেশ-ও প্রস্তুত। অন্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যোতির্ময় রূপ ধ্রুবনক্ষত্রের মতো পথের দিশারী হয়ে বিরাজ করতে থাকে। একদিন খবর আসে প্রভু বৃন্দাবন-দর্শনে যাত্রা করেছেন। গৃহে আর মন বসে না। উতলা হয়ে রূপ ছোট ভাই অনুপমের সঙ্গে প্রভু-দর্শনে যাত্রা করেন। দীর্ঘ পথ পদব্রজে পার হয়ে যেতে হবে, গৌরাঙ্গের নাম সম্বল। সনাতনকেও এ সংবাদ জানিয়ে দেন। গোপনে খবর পাঠান—গৌড়ে মুদির নিকট যে দশহাজার মুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছেন তা দিয়ে নিজের কারামোচনের ব্যবস্থা ক'রে তিনি যেন বৃন্দাবনে গমন করেন।

* * * *

দুই ভাই—রূপ ও অনুপম—সংসার, পরিজন, পার্থিব জীবন পিছনে ফেলে অজানার সন্ধানে যাত্রা করেন। পরণে ছিন্ন মলিন বসন, শীত নিবারণের জন্য আছে বহুমূল্য শাল নয়, ছেঁড়া কাঁথা। চক্ষু মাটির দিকে নিবদ্ধ। আত্মীয়-স্বজন, অনুগত-জনেরা অশ্রুচোখে এঁদের দিকে চেয়ে থাকেন। জগৎশুদ্ধ লোক যে ধন-সম্পদের জন্য লালায়িত, এঁরা তা হেলায় তুচ্ছ ক'রে কোন্ মহামূল্যবান সম্পদের সন্ধানে চলেছেন! পথের কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না, পরের দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে লজ্জাবোধ হয় না। অহমিকা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে; নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য হয়েছে উজ্জ্বল।

মহাপ্রভু প্রয়াগে কয়েকদিন অবস্থান করছিলেন। রূপ ও অনুপম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। গৌরাঙ্গকে ঘিরে হাজার হাজার লোকের উল্লাসধ্বনি, কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত। দীনবেশে দুই ভাই

এসে লুটিয়ে পড়লেন মহাপ্রভুর চরণে। সাদর আলিঙ্গন দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—সনাতনের খবর কি ?

—সনাতন গৌড়ে, রাজার আদেশে কারাগারে আবদ্ধ।

গৌরাঙ্গ বলেন—না, মুক্তিলাভ করেছেন তিনি; শীঘ্রই এসে মিলিত হবেন।

বিষয়ত্যাগী, অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান অনুরাগী ভক্তের প্রয়োজন প্রভু অনুভব করেছেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত গরিমা জাগিয়ে তুলতে হবে, বৈষ্ণব ধর্মের নীতি ও স্বরূপ লিপিবদ্ধ করতে হবে যাতে অনুগামীরা এ থেকে আলো এবং পথের নির্দেশ পেতে পারে। রূপ এবং সনাতন-ই এই কঠিন কাজের যোগ্য পুরুষ। প্রয়াগে দশদিন অবস্থানকালে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করলেন। মন তাঁর কর্ষিত, বিষয়-বাসনারূপ আগাছা টেনে তুলে ফেলা হয়েছে; জ্ঞান-বীজ বপন ক'রে স্নেহ ও প্রেমবারি সিঞ্চনে চিত্ত-কর্ষক গৌরাঙ্গ রূপের মানসক্ষেত্র সমৃদ্ধ ক'রে তুললেন। পতিত মানব-জমীন আবাদ করার কৌশল তিনি জানেন।

প্রয়াগে রূপ দশদিন ধ'রে মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করলেন। আরাধ্য কে, ভক্তির স্বরূপ কি, ভক্তের লক্ষণ কি, বৈষ্ণবের পালনীয় কি—নানা বিষয়ের গভীর তত্ত্ব ও তথ্য তিনি সূত্রাকারে গেঁথে নিলেন নিজের মনের মধ্যে। এ-সব গ্রন্থাকারে তাঁকে লিখতে হবে। শিক্ষা সমাপন হ'লে গৌরাঙ্গ কাশী অভিমুখে রওনা হবেন। রূপ সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করেছেন মহাপ্রভুর চরণে। তাঁর অদর্শনে তিনি কেমন ক'রে জীবনধারণ করবেন ? প্রভু যখন তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ দেন, রূপ কেঁদে আকুল। বলেন—তোমার চরণছাড়া হয়ে আমি বাঁচব না, প্রভু।

গৌরাঙ্গ কুসুমের চেয়ে কোমল আবার ক্ষেত্রবিশেষে বজ্রের চেয়েও কঠোর। কর্তব্যভার যার ওপর অর্পণ করা হয়েছে তাকে তা পালন করতেই হবে। প্রিয় অনুগামী রূপ গোস্বামীর আকুতিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচালত হন না, বরং কঠোরভাবেই বলেন—আজ্ঞা পালন করো; বৃন্দাবনে যাও, জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দাও। এখন বৃন্দাবনে তোমার প্রয়োজন আছে। পরে ইচ্ছা হয় নীলাচলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো।

আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে রূপ ও অনুপম বৃন্দাবন যাত্রা করেন; মহাপ্রভু ফিরে আসেন কাশীধামে।

## প্রকাশানন্দ

জগন্নাথ-ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বভৌম যেমন পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন, কাশীতে তেমনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী। বরং প্রকাশানন্দ আরো বেশী খ্যাতিমান এবং প্রতাপশালী। বহু শিষ্যের গুরু তিনি। বেদান্ত-দর্শনে তাঁর অধিকার অপরিসীম ; অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে হীনচক্ষে দেখেন। আত্ম-পাণ্ডিত্য, আত্ম-প্রভাব ও আত্ম-মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তাঁর ভক্তিধর্মের কথা তিনি শুনেছেন ; তাঁর নামকীর্তনে উল্লাস ও ভাব-নৃত্যের কথা শুনে তিনি বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন। তিনি মনে করেছেন নিমাই একজন সাধারণ সন্ন্যাসী, শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত। হয়ত কোন যাদুবলে তিনি সার্বভৌমের মতো নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে বশ করেছেন।

বৃন্দাবন যাওয়ার পথে যখন গৌরাঙ্গ কাশীতে আসেন তখন প্রকাশানন্দের মারাঠী-শিষ্য এঁর কথা বলেছিলেন। তখন অবজ্ঞাভরে গৌরাঙ্গের পরিচয় দিয়ে প্রকাশানন্দ তাঁর শিষ্যদের এই নৃত্যপরায়ণ তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছিলেন। গৌরাঙ্গ এখান থেকে চলে যান বৃন্দাবনে ; তখন প্রকাশানন্দ আত্ম-প্রাধান্য প্রচারের আরো সুযোগ পেয়েছিলেন, শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন—গৌরাঙ্গ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে ; এখানে আর ফিরে আসবে না।

শিষ্যরা অনেকে হয়ত এ-কথাই বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বৃন্দাবন থেকে যখন মহাপ্রভু ফিরে এলেন কাশীধামে, তখন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার মৃদু গুঞ্জন সুরু হ'ল, মানসিক আলোড়ন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। প্রকাশানন্দ শাস্ত্রজ্ঞানের শক্তিতে নিজেকে মনে করেন জগৎগুরুতুল্য। দম্ভের প্রতিমূর্তি তিনি। গৌরাঙ্গ প্রেম ও বিনয়ের অবতারস্বরূপ। প্রকাশানন্দ মনে করেন নিমাই সীমাবদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তে সাহসী হবেন না। শিষ্যদের কাছে হুঙ্কার দিয়ে আত্মশক্তি প্রকাশ করেন তিনি, চৈতন্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন শ্লেষ-মাখা বাক্যবাণ।

উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটানোর উপায় কী? অন্তত সাক্ষাৎকার ও আলোচনা? গর্বিত প্রকাশানন্দ নিজেকে মনে করেন কাশীর পণ্ডিতেশ্বর।

চৈতন্যদেবকে তিনি আমন্ত্রণ জানাবেন না। উপযাচক হয়েই বা গৌরাঙ্গ তাঁর কাছে যান কিরূপে? অবশেষে উপায় নির্ধারিত হ'ল।

প্রকাশানন্দের মারাঠী-শিষ্য, যিনি গৌরাঙ্গকে দর্শন ক'রেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, দুই সন্ন্যাসীর মিলনের সেতু রচনা করলেন। কাশীর সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর গৃহে এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য গৌরাঙ্গকে-ও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। প্রভু বুঝলেন কি উদ্দেশ্য, মৃদু হেসে সম্মতি দিলেন তিনি।

বিরাট চন্দ্রাতপতলে কয়েক সহস্র সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়েছে। উচ্চ বেদীতে প্রকাশানন্দ উপবিষ্ট। সবাই উৎসুকভাবে গৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় চারজন শিষ্যসহ তিনি ধীরে ধীরে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। প্রভু যেন কিছুটা লজ্জিত। মাথা নীচু ক'রে হরিনাম জপ করতে করতে তিনি হেঁটে চলেছেন। তাঁর দীর্ঘ সুবলিত দেহ, যেন কাঁচা সোনায় গড়া। সর্বাঙ্গ দিয়ে অপরূপ ছটা নির্গত হয়। সমবেত দর্শকজন তাঁকে দেখেই মৃদু হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠেন। আকাশে যেন অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। দিক আলোকিত, মানুষের মন-ও আলোকিত হয়।

গৌরাঙ্গ সোজা সভামধ্যে প্রবেশ করেন না। পদ-প্রক্ষালনের জন্য যে স্থান নির্ধারিত ছিল সেখানে গিয়ে পদধৌত ক'রে তার কাছাকাছি এক জায়গায় উপবেশন করলেন। বেদীতে উপবিষ্ট প্রকাশানন্দ দূর থেকে গৌরাঙ্গকে অবলোকন করছিলেন। এমন অনিন্দ্যসুন্দর তেজোময় আকৃতি দেখে তিনি গৌরাঙ্গের প্রতি শত্রুভাব বিস্মৃত হলেন। নিমাইকে দর্শনের আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতি যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিলেন, তা যেন সহসা অন্তর্হিত হ'ল, মনের ভিতর প্রীতির সঞ্চার হ'ল। প্রভু যখন সভামধ্যে গর্বভরে না এসে পদ-প্রক্ষালনের স্থানেই উপবেশন করলেন, তখন তাঁর দীন ভাব দেখে প্রকাশানন্দ বিস্মিত হলেন। নিজে উঠে গিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন, বললেন—শ্রীপাদ, সভার মধ্যে আসুন; এমন অপবিত্র স্থানে উপবেশন ক'রে আমাদের ক্লেশ দেবেন না।

বিনয়ের অবতার গৌরাঙ্গ বলেন—মহাশয়, আমি অতি হীন সম্প্রদায়-ভুক্ত; আপনাদের মধ্যে আমার উপবেশন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রকাশানন্দ গৌরাঙ্গের বিনয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। সাদরে হাত ধ'রে তাঁকে সভার মধ্যে নিয়ে এসে উপবেশন করান। প্রভুর আগমনে সবাই

সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। দর্শকজন উপবিষ্ট হ'লে প্রকাশানন্দ গৌরাঙ্গকে কিছুটা স্নেহ এবং অনুযোগের স্বরে বলেন—শুনেছি আপনার নাম কৃষ্ণচৈতন্য, আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য, আমাদের এক আশ্রমভুক্ত। আপনি এখানেই এসে অবস্থান করছেন, অথচ এতদিন আমাদের দর্শন দেননি কেন?

সভাস্থ সন্ন্যাসিগণ গৌরাঙ্গের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। মহাপ্রভু নিরুত্তর; মাথা নীচু ক'রে সলজ্জভাবে অবস্থান করেন। প্রকাশানন্দের অন্তরে গৌরাঙ্গের প্রতি বাৎসল্যভাব জেগে উঠতে থাকে, বলেন—আপনার তেজ ও প্রভাব দেখে মহাপুরুষ ব'লে বোধ হয়। আপনি সন্ন্যাসী অথচ আমাদের সঙ্গে মিলিত হন না, আপনার মধ্যে সন্ন্যাসীর সকল লক্ষণ দেখতে পাই অথচ আপনি সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম বেদপাঠে অনুরক্ত নন; সন্ন্যাসীর পক্ষে যা অনুচিত কর্ম সেই নৃত্য-গীতে বিশেষ আসক্ত। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, শাস্ত্রানুগ ধর্মসঙ্গত কার্য পরিত্যাগ ক'রে আপনি ধর্মবিরুদ্ধ পন্থায় চলেন কেন?

প্রকাশানন্দের ধারণা গৌরাঙ্গ সুদর্শন বিনয়ী সন্ন্যাসী; পাণ্ডিত্য নাই, শাস্ত্রজ্ঞান কম, তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত আছেন। বুঝিয়ে দিলে হয়ত এ-কাজ ত্যাগ ক'রে প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতো আচরণে অভ্যস্ত হ'তে পারেন।

গৌরাঙ্গ এবার ধীরে ধীরে উত্তর দেন—শ্রীপাদ, আমি যখন গুরুর শরণ নিয়েছিলাম তিনি আমাকে মূর্খ বিবেচনা ক'রে একটি শ্লোক মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। সেটি হ'ল—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে মধুক্ষরা কণ্ঠে তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন। সভাজন নিস্তব্ধ। একটি নূতন সহজ সুন্দর জীবনের তোরণ যেন ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। গৌরাঙ্গের অভিজ্ঞতার কথা শোনার জন্য সবাই উন্মুখ। তিনি বলতে থাকেন—গুরুদেব এই মন্ত্র জপ করতে দিয়ে বলেছিলেন এতে কর্মবন্ধ ক্ষয় পাবে, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হবে। গুরুর উপদেশমতো এই মন্ত্র জপ করতে করতে আমার যেন কেমন পরিবর্তন ঘটে গেল। কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নৃত্য করি। নিজেরই আশঙ্কা হ'ল উন্মাদ হয়ে পড়ছি কিনা। গুরুর কাছে গেলাম। তিনি দেখে শুনে সহাস্যে বললেন—তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে, তুমি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছ। সেই অবধি আমি একান্তমনে কৃষ্ণনাম

জপ করি। কখন কখনও ভাবান্তর ঘটে, আপন মনেই হাসি কাঁদি, নাচি গান করি। ইচ্ছাপূর্বক এমন করি না, নামের শক্তিতেই ক'রে থাকি।

সহস্র চক্ষু গৌরাঙ্গের দিকে নিবদ্ধ, সহস্র কর্ণ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত বাক্য গ্রহণ করে। সাধুমণ্ডলী এমন একজনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছেন যিনি জপ-মন্ত্রের সার্থকতা প্রমাণ করছেন, সত্যকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত তার স্পর্শে যাঁর দেহ-মন পুলকিত উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রকাশানন্দ মনে মনে নিজেকে গৌরাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি মহাপ্রভুর মতো ভক্তির অধিকারী নন কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি শ্রেষ্ঠ; তাঁর মতো বেদজ্ঞ আর কে আছে! যে-ক্ষেত্রে তিনি গৌরাঙ্গের বেশী প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। জিজ্ঞাসা করেন—আপনি বেদান্ত পাঠ করেন না কেন?

গৌরাঙ্গ সবিনয়ে বলেন—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তবে যদি অপরাধ না নেন, উত্তর দিতে পারি; জানি, উত্তর শুনলে আপনি হয়ত বিরক্তই হবেন।

—আপনার বাক্য অমৃততুল্য। তা শুনে কি কেউ বিরক্ত হ'তে পারে? আপনি বলুন। আপনার কথায় আমরা পরম প্রীত হয়েছি।

আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ সুস্পষ্ট কণ্ঠে গৌরাঙ্গ বলেন—বেদান্তের সূত্র আমি মানি কিন্তু শঙ্কর যে অর্থে তার ব্যাখ্যা করেছেন তাই মানি না। বেদান্ত-সূত্র সহজ এবং সহজেই বোধগম্য হয় কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্য সহজ অর্থকে জটিল ক'রে তুলেছে। এই ভাষ্য মানি না।

শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিকট জগদ্‌গুরুর মতো পূজ্য। তাঁর বেদান্ত-ভাষ্য সর্বজনগ্রাহ্য। তাঁর ভাষ্যে দোষারোপ করতে শুনে প্রকাশা-নন্দের পাণ্ডিত্যের অভিমানে আঘাত লাগে। তিনি তো এই ভাষ্যকেই অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। তবে গৌরাঙ্গ কি পাণ্ডিত্যেও তাঁকে অতিক্রম ক'রে গেছেন? দীপ্তকণ্ঠে প্রকাশানন্দ বলেন—শঙ্কর-ভাষ্য যদি মেনে না নেন, তবে তার দোষ দেখিয়ে আপনার মত প্রতিষ্ঠা করুন।

শান্তস্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর হয়—শঙ্কর নমস্য বটে কিন্তু ঈশ্বর শঙ্কর অপেক্ষাও বড়। বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য। বেদান্তের যে অর্থ তা সরল, মনকে সহজেই স্পর্শ করে; তা-ই ঈশ্বরের অর্থ। শঙ্করের-দেওয়া অর্থ সরল নয়, জটিল।

মহাপ্রভু এবার শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে বক্তৃতা দিয়ে শঙ্কর-ভাষ্যের দোষ প্রদর্শন করলেন এবং নিজের মত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য, গৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি এবং কৃষ্ণচৈতন্যের ভাব-অনুভূতির সমন্বয় ঘটেছে। সমবেত সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং তাঁদের গুরু প্রকাশানন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুভব করলেন, এই সুচারুদর্শন বিনয়নম্র সন্ন্যাসী শুধু পরম ভক্তই নন, তিনি পরম পণ্ডিত এবং পরম যোগী। শ্রদ্ধায় সকলের শির নত হ'ল। ম্লান হ'ল অন্য পণ্ডিতদের প্রতিভা ; মাটির প্রদীপ যেমন সূর্যোদয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে তেমনি।

প্রকাশানন্দের মনে অনুতাপ জেগে ওঠে। তিনি অযথা গৌরাঙ্গের নিন্দাবাদ করেছেন ; তাঁকে না জেনেই তাঁকে হেয় মনে করেছেন। সরলভাবে অনুতাপ প্রকাশ ক'রে বলেন—শ্রীপাদ, বিদ্যার গৌরবে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার প্রতি নিন্দা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করেছি। এখন জানতে পেলাম আপনিই গুরু। আপনার নিকটই বেদের প্রকৃত অর্থ বোঝা গেল। আপনি শিক্ষা দিলেন—শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের প্রাণ এবং তাঁর চরণ-সেবাই পরমধর্ম।

দুইটি বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-প্রবাহ একত্রিত হ'লে আলো জ্বলে ওঠে। এখানে দুই সাধকের অন্তরের সমন্বয় ঘট্‌লো। যে ছিল উদ্ধত সে হ'ল নম্র, যে ছিল বিরোধী সে হ'ল অনুগত। জ্ঞানের তীক্ষ্ণতায় যে অন্তর ছিল শাণিত, ভক্তির স্নিগ্ধ-প্রলেপে তা হয়ে উঠ্‌লো কোমল আর্দ্র।

সমবেত সন্ন্যাসিগণ আরাধনার সহজ পথটির প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁরা মনে করেন কলিকালে হরিনাম ভিন্ন গতি নাই। হরিনামের কীর্তনে তাঁরা নূতন আনন্দ ও পুলক অনুভূতি লাভ করেন। গৌরাঙ্গ আহারান্তে শিষ্যগণসহ ফিরে আসেন কিন্তু সন্ন্যাসীবৃন্দের নিকট হরিনামের যে মূলমন্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে তাঁদের চিত্ত-ক্ষেত্রে বপন ক'রে আসেন, তা ক্রমে অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। কৃষ্ণনামের কোলাহল ও সংকীর্তনে কাশীধাম মুখরিত হয়ে ওঠে।

কাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম গ্রহণ করেছেন শুনে দলে দলে লোক আসে শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভে। তাঁকে ঘিরে দর্শন ক'রে কারো তৃপ্তি হয় না। এমন ভুবনবিজয়ী মনোহর রূপ, এমন ভক্তি, এমন ভাব আগে আর কেউ দেখেনি।

* * * *

দুই-তিন দিন পরের ঘটনা। গৌরাঙ্গ বিন্দুমাধব হরি দর্শনে গমন করেছেন। অন্যদিনও এরূপ করেছেন কিন্তু আজ আর ভাব গোপন রাখতে পারলেন না। বিন্দুমাধব দর্শন ক'রেই প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য সুরু করলেন। সঙ্গে ছিলেন চারজন ভক্ত-শিষ্য। তাঁরাও যোগ দিয়ে হাততালি দিয়ে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' এই পদ গাইতে লাগলেন। ভাবের আবেশে মনোহর ভঙ্গীতে গৌরাঙ্গ নৃত্য করতে লাগলেন; দেহে কদম্ব-কেশরের মতো পুলকরোমাঞ্চ, নয়নযুগল দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ। যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়, প্রেম-তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রভুর কণ্ঠে হরিনাম শুনেই লক্ষ কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি তোলে মুগ্ধ দর্শকজন।

প্রকাশানন্দ শোনেন গৌরাঙ্গ ভাব-নৃত্যে বিভোর হয়ে কীর্তন করছেন। এরূপ নৃত্যের কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু পূর্বে দেখেননি। দেখার আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। অপর সকলের মতোই তিনি সেই মনোমোহকর নৃত্য দেখবার জন্য ছুটে চলেন। নিজের পদমর্যাদার কথা, পাণ্ডিত্যের কথা বিস্মৃত হয়েছেন তিনি। প্রথম দর্শনের দিন থেকেই তিনি গৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁর সুন্দর আনন হয়েছে সন্ন্যাসীর ধ্যানের বস্তু। গৌরাঙ্গ দ্বিতীয়বার আসেননি। তিনি-ও অনাহূত হয়ে তাঁর কাছে যেতে পারছেন না কিন্তু মন হয়েছে গৌরাঙ্গময়। এখন এই সুযোগ পেয়ে উৎফুল্লহৃদয়ে ছুটে চললেন। এখন গৌরাঙ্গের যে রূপ দর্শন করলেন, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা গৌরাঙ্গের সে রূপ নয়। ভাবে নিমীলিত নেত্র; অন্তরস্থ আলোকে দেহ হয়েছে আরো দীপ্তোজ্জ্বল, বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, পূর্ণচন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ আভায় অনুরঞ্জিত। সুঠাম দেহের লীলায়িত ভঙ্গী দেখে প্রকাশানন্দ মুগ্ধ হন। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে এই মনোহর নৃত্য দেখছিলেন। তাঁর দেহের শিরায় শিরায় যেন এর দোলা লাগে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি গৌরাঙ্গের সঙ্গে অনুরূপ অঙ্গভঙ্গী করতে থাকেন। নিজেকে তিনি প্রায় মিশিয়ে দিয়েছেন গৌরাঙ্গ-প্রেমের সমুদ্রে।

বহু লোকের কল-কোলাহলে চৈতন্যের আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে। ভাব সম্বরণ ক'রে তিনি সম্মুখে দেখতে পান প্রকাশানন্দকে। স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে প্রণাম করেন তাঁকে। প্রকাশানন্দ এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হতবুদ্ধি হয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে তিনি গৌরাঙ্গের চরণযুগল ধারণ ক'রে প্রণত

হলেন। প্রভু তাঁকে সাদরে উঠিয়ে বলেন—আপনি জগৎ-গুরু, আমি আপনার শিষ্যস্থানীয়। প্রণাম ক'রে আমাকে অপরাধী করেন কেন?

প্রকাশানন্দ বলেন—আমার অন্তরাত্মা বলছে আপনি ভগবান।

গৌরাঙ্গ সঙ্কোচ-বোধ করেন, বলেন—এমন কথা বলবেন না। জীবে ভগবৎ-জ্ঞান অতি দোষাবহ। এতে উভয়েরই ক্ষতি।

—আমি আপনাকে চিনেছি এবং এজন্যই আপনার কৃপাপ্রার্থী। প্রকাশানন্দের কণ্ঠ ভক্তিতে কোমল, বিশ্বাসে দীপ্ত।

*　　　*　　　*　　　*

উত্তমরূপে কর্ষিত শুষ্ক জমিতে বিছন ছিটিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলে যেমন দ্রুত বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, প্রকাশানন্দের মানস-ক্ষেত্রেও তেমনি ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো। বিষয়-বাসনা আগেই রহিত হয়েছিল, জ্ঞানের চর্চায় অন্তর হয়েছিল কর্ষিত। গৌরাঙ্গের সংস্পর্শে আসায় সেখানে প্রেম-ভক্তির সঞ্চার হ'ল। প্রভুর ভাব-নৃত্য দেখার পর তিনি মনে মনে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। কয়েকদিন গৌরাঙ্গের ধ্যানে অতিবাহিত ক'রে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকটে গিয়ে আত্ম-নিবেদন করলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে উভয়েই অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আত্ম-সমর্পণ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকাশানন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, বললেন—প্রভু, তোমার অদর্শন আমি সহ্য করতে পারব না। অনুগ্রহ ক'রে আমায় তোমার সঙ্গে নাও।

গৌরাঙ্গ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে আদেশ করলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন—তুমি বৃন্দাবন থেকে আমাকে স্মরণ করলেই আমার দর্শন পাবে।

প্রকাশানন্দের কাশীবাসের অবসান হ'ল। গৌরাঙ্গ তাঁর নাম দিলেন প্রবোধানন্দ। গৌরাঙ্গ কাশী থেকে নীলাচল অভিমুখে ফিরে যাত্রা করলেন, প্রবোধানন্দ-ও বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। তিনি এখন ভক্তিমার্গের সাধক, চৈতন্যগত প্রাণ।

*　　　*　　　*　　　*

দুই মাস ধ'রে সনাতনের শিক্ষাদান চললো। এখান থেকে সনাতন যাবেন বৃন্দাবনে। সেখানে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দুই ভাই লুপ্ত

বৃন্দাবন উদ্ধার এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করবেন। তাঁদের ওপর প্রভুর এই আদেশ। কাশীর কাজ শেষ হ'লে গৌরাঙ্গ ফিরে চললেন নীলাচল অভিমুখে আগের সেই বনপথ দিয়ে। সঙ্গী সেই তুজন—বলভদ্র এবং তাঁর পরিচর।

নির্জন বনপথে গৌরাঙ্গ আগে আগে চলেছেন আপন মনে হরিনাম জপ করতে করতে। সঙ্গীরা পিছনে পিছনে আসেন। পথের শোভা নয়নান্দদায়ক। বনভূমি ফুলে-পল্লবে মনোরম। পাখীর কূজনে ভ্রমর-গুঞ্জনে গুঞ্জরিত। পথে এক গোপ-যুবক এক কলসী ঘোল নিয়ে বিক্রি করতে চলেছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত, গোপের ওপর কৃপাপরবশ-ও হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পান করেন সবখানি ঘোল। দামের কথা তাঁর মনে নাই। যাওয়ার উপক্রম করতেই গোপ-যুবক ঘোলের দাম চায়—তার মা ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয় তাকে, কাজেই বিনামূল্যে সে কেমন ক'রে সবখানি ঘোল দিয়ে দেবে? ঈষৎ হেসে গৌরাঙ্গ বলভদ্র ও তাঁর ভৃত্যকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—ওদের কাছে চাইলে তোমার জিনিসের মূল্য পাবে।

এগিয়ে চলেন তিনি। গোপ-যুবক বলভদ্র ও তাঁর সঙ্গীর জন্য পথে অপেক্ষা করে। তাঁরা কাছে এলে বলেন—ঐ আগে যে সন্ন্যাসীঠাকুর গেলেন উনি আমার এক কলসী ঘোল খেয়েছেন, বলেছেন—আপনারা দাম দেবেন। তাই আমি এখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

গৌরাঙ্গের এই ব্যঙ্গ-কৌতুক দেখে বলভদ্র বিস্মিত হন। তিনি বলেন—দেখ গোয়ালা-ভাই, উনি সন্ন্যাসী, পয়সা কোথায় পাবেন। আমরা-ও তাঁরই অনুচর, আমাদের কাছেও টাকাকড়ি নাই। তোমার জিনিস উনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন তোমার মঙ্গলই হবে। তুমি ভাই প্রসন্নমনে বাড়ী যাও।

গোপ-যুবক মাটির ভাঁড় তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এ কী, ভাঁড় এত ভারী কেন! সে যে তুলতেই পারে না। চেয়ে দেখে স্বর্ণমুদ্রায় ঘোলের কলসী পরিপূর্ণ। বিস্মিত গোয়ালার জ্ঞানোদয় হ'ল। যিনি তার কাছ থেকে ঘোল চেয়ে পান করেছেন, তিনি সাধারণ মানুষ নন। কলসী সেখানে ফেলে সে ছুটে যায় সেই সন্ন্যাসীর কাছে, লুটিয়ে পড়ে তাঁর চরণে, কাতরে করুণা ভিক্ষা করে, বলে—প্রভু, বৃথা ধন আমি চাই না, তুমি এইমাত্র করো তোমার চরণে যেন আমার মতি থাকে। আমি মূর্খ; আমায় ভুলাবেন না প্রভু।

গৌরাঙ্গ তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেন—যা পেয়েছ ঘরে নিয়ে যাও। মঙ্গল হবে তোমার।

ভাগ্যবান গোপ-যুবক। সৎভাবে জীবিকার্জনের পথে সে চলেছিল। গৃহে তাঁর ওপর নির্ভরশীলা জননী এবং পত্নী। তাঁদের ভরণপোষণ করতে হবে। গোপের কথায় গৌরাঙ্গের-ও মনে পড়ে তাঁর জননী ও পত্নীর কথা। ক্ষণেকের জন্য অনুকম্পা জেগে ওঠে মনে। গোয়ালার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। অর্থ ও পরমার্থ দুই-ই লাভ হয় তার।

অবশেষে বন পার হয়ে মহাপ্রভু আঠারনালায় গিয়ে উপনীত হলেন। নীলাচলের ভক্তগণ তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে আনন্দে কোলাহল করতে করতে এসে তাঁরা তাঁদের প্রাণের ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। এবারে উত্তর ভারত পরিক্রমা শেষ হ'ল।

## সনাতন

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আদেশে সনাতন কারাগারে আবদ্ধ। তাঁর অপরাধ—সংসারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এসেছে ; রাজকার্য আর করতে তিনি ইচ্ছুক নন। বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রাজা রেহাই দিতে রাজী নন। তিনি জোর ক'রেই তাঁকে কাজে বহাল রাখবেন।

কারাগারের ভিতরে সনাতন রূপের চিঠি পান। তিনি মুক্তির জন্য টাকার ব্যবস্থা করেছেন ; দুই ভাই—রূপ এবং অনুপম বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর-ও মন চলে গেছে সেই পথে। কারাগার থেকে মুক্তির উপায় কি ?

মুসলমান কারা-রক্ষককে নিভৃতে পেয়ে সনাতন বলেন—মিঞা সাহেব, আপনি আলেম ; কোরাণহাদিস আপনি পড়েছেন। আপনি জানেন অর্থের বিনিময়ে বন্দীকে মুক্তি দিলে আপনি পুণ্য কাজই করবেন। পাঁচ হাজার টাকা আপনার পারিতোষিক, আমার মুক্তির উপায় ক'রে দিন। তাছাড়া, আমি আপনার উপকার-ও তো করেছি। যদি কিছু শোধ করতে চান এখনি তার উপযুক্ত সময়।

টাকার কথায় কারাধ্যক্ষ কোমল হন কিন্তু সাহস হয় না। বলেন—মুক্তি দিতে পারি কিন্তু সুলতানকে ভয়।

—সুলতানকে ভয় করবেন না। তিনি উড়িষ্যায় গেছেন। যখন ফিরে আসবেন তখন বলবেন—একদিন সনাতনকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে সে হাতে শিকল-বাঁধা অবস্থাতেই জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে ডুবে যায়। তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। আপনার ভয় নাই ; আমি এদেশে আর বাস করবো না, দরবেশ হয়ে মক্কার দিকে চলে যাব।

মুসলমান কর্মচারী সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান। মনঃস্থির করতে পারেন না। সুলতান ব্যাপারটা জানতে পেলে বিপদ হবে।

সনাতন কারাধ্যক্ষের মানসিক দ্বন্দ্ব বুঝতে পারেন। তাঁর সম্মুখে সাত হাজার মুদ্রা স্তূপ ক'রে রাখেন। এত টাকা! লোভ হয়। বিপদের ঝুঁকি নেওয়া স্থির করেন তিনি। রাজী হন সনাতনের প্রস্তাবে। রাত্রিতে তাঁর

লোক আসে। কারাগারের দরজা খুলে যায়। কামার রেত দিয়ে লোহার শিকল কেটে দেয়; ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। সনাতনকে গঙ্গা পার ক'রে নামিয়ে দেয় ওপারে। সনাতনের সঙ্গে পরিচারক ঈশান।

কর্মের নাগপাশ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু যে-কোন সময়ে সুলতানের লোকজন তাঁকে আবার বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে পারে। ছিন্ন মলিন বসন পরিধান ক'রে, দিনে লুকিয়ে রাত্রিতে পথ চলতে লাগলেন। মনে মনে গৌরাঙ্গের নাম জপ, অন্তরে তাঁরই রূপ ধ্যান। বিহারে যাওয়ার সাধারণের ব্যবহৃত তেলিয়াগড়ির পথ দিয়ে না গিয়ে তিনি পাত্রাপাহাড়ের পথে চললেন। পাহাড়ের দুর্গম অচেনা পথ। তাঁকে পাহাড় পার ক'রে ওপারে পৌছিয়ে দেবার জন্য একজন গ্রাম্য জোতদারের শরণাপন্ন হলেন।

জোতদারের মনে সন্দেহ জাগে। পথিক দুজনের মলিন দরিদ্র বেশ কিন্তু অবয়ব দেখে ভিক্ষুক ব'লে মনে হয় না। সর্বসাধারণ যে পথে যাতায়াত করে তা পরিত্যাগ ক'রে দুর্গম পথেই বা চলতে চায় কেন? এরা কি ছদ্মবেশী কোন ধনবান ব্যক্তি? না, রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পালিয়ে চলেছে অন্য দেশে? ওদের নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা হয়। জোতদারের সঙ্গে ছিল এক গণক। সে বলে—এদের সঙ্গে আটটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। খুশিতে জোতদারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে-যুগে এক-একটি স্বর্ণমুদ্রা বহু মূল্যবান সম্পদ।

জোতদার সানন্দে রাজী হয়, বলে—আপনি স্নানাহার করুন, বিশ্রাম করুন, রাত্রিতে আমার ভৃত্যরা আপনাকে পাহাড় পার ক'রে নিরাপদ পথ দেখিয়ে দেবে।

পথিকদের রান্নার যোগাড় ক'রে দেয়; চাল ডাল, রান্নার সরঞ্জাম সবই সরবরাহ করে। সনাতন দুদিন অনাহারে আছেন, স্নান হয়নি; ভালো ক'রে বিশ্রাম-ও হয়নি। স্নানাহার শেষ ক'রে তিনি চিন্তা করেন—এই অপরিচিত ব্যক্তি এত যত্ন-আদর করছে কেন? তাঁর কেমন সন্দেহের উদ্রেক হয়; ঈশানকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে নাকি?

—হ্যাঁ, সাতটি মোহর আছে। লুকিয়ে এনেছি; কাজে লাগবে।

সনাতন ঈশানকে তিরস্কার করেন। বলেন—অর্থই অনর্থের মূল। তুমি কেন এই মারাত্মক জিনিস সঙ্গে এনেছ? কাঞ্চন বিপদ ডেকে আনে।

তিনি মোহর সাতটি নিয়ে জোতদারকে দিয়ে বললেন—ভাই, এইগুলি তুমি নাও এবং আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থাটি ক'রে দাও। আমি সুলতানের কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি ; সোজা পথে যাওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা, কাজেই এ-পথে আসতে হয়েছে। তুমি যদি আমাকে পাহাড় পার হ'তে সাহায্য করো তবে তুমি পুণ্য সঞ্চয় করবে।

জোতদার বিস্মিত হয়, বলে—তোমার ভৃত্যের কাছে যে আটটি মোহর আছে তা আমি আগেই জেনেছি। আমার মতলব ছিল রাত্রিতে তোমাকে হত্যা ক'রে মোহরগুলি কেড়ে নেওয়া। তুমি যে আগেই টাকার কথা ব'লে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ এতে আমার নরহত্যার পাপ থেকে অব্যাহতি হ'ল। আমি ভাই তোমার সততায় মুগ্ধ হয়েছি ; তোমার মোহর ফেরৎ নাও। তোমার উপকারের জন্যই আমি বিনা পারিশ্রমিকে তোমাকে পাহাড় পার করিয়ে দেব। কোন চিন্তা ক'রো না।

সনাতন বলেন—টাকার জন্যই চিন্তা। তুমি ভাই মোহর কয়টি গ্রহণ করো এবং আমাদের জীবন রক্ষা করো, নতুবা অন্য কেউ এই অর্থের জন্যই আমাদের খুন করবে।

জোতদার অবশেষে সম্মত হয়। রাত্রিতে তার চারজন অস্ত্রধারী প্রহরী সনাতন ও তাঁর অনুচরকে বনের ভিতর দিয়ে পাহাড় অতিক্রম ক'রে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। গিরি অতিক্রম ক'রে গিয়ে সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সঙ্গে বুঝি আরো একটি মোহর আছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অর্থের আসক্তি রয়েছে তোমার পূরামাত্রায়। ঐ মোহরটি নিয়ে তুমি ফিরে যাও। আমার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নাই।......

ঈশানকে বিদায় দিয়ে সনাতন একাকী পথ চলতে থাকেন। যশ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হেলায় পিছনে ফেলে এসেছেন। পার্থিব সম্পদ মনে হয় জ্বলন্ত অঙ্গার-তুল্য, ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে তার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নির্মল উদার আকাশতলে নিজেকে মনে হয় মুক্ত বিহঙ্গমের মতো। গায়ে জীর্ণ কাঁথা, পরণে ছেঁড়া কাপড়, হাতে ভিক্ষাপাত্র। সম্বলহীন ভিক্ষুকের দস্যু-তস্করের ভয় কি ? নির্ভয়ে তিনি পথ চলতে থাকেন।

*    *    *    *

রাজার মন্ত্রী। পায়ে হাঁটার অভ্যাস ছিল না। শারীরিক কষ্ট স্বীকার করারও অভ্যাস নাই। তবু নূতন জীবনের প্রবেশ-পথে কোন কষ্টই কষ্ট ব'লে মনে হয় না। অতীতের ভোগবিলাস বেদনাদায়ক দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ক্লেদাক্ত সে জীবনের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলে যেন শান্তি মিলবে। পদব্রজে সনাতন গিয়ে উপনীত হন হাজীপুরে। গঙ্গার উত্তর-পাড়ে সমৃদ্ধ শহর। এখানে এক উদ্যানে উপবেশন ক'রে তিনি চিন্তা করতে থাকেন কেমন ক'রে নদী পার হয়ে বারাণসীর দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

হাজীপুরে সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত বাস করতেন। গৌড়ের স্থলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী তিনি। তাঁর কাজ ছিল এ অঞ্চল থেকে উৎকৃষ্ট ঘোড়া কিনে গৌড়ে পাঠানো। দূর থেকে সনাতনকে দেখে শ্রীকান্ত চিনতে পারেন। কিন্তু তাঁর এরূপ বসন কেন? প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রীর এ ভিখারীর দশা কেন? সনাতন হয়ত আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। তাই রাত্রিতে শ্রীকান্ত একজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে আসেন সনাতনের কাছে, জিজ্ঞাসা করেন—ব্যাপার কি?

সনাতন কারাগার থেকে পালিয়ে আসার বিবরণ দেন; জানান যে তিনি আর দেশে ফিরে যাবেন না।

শ্রীকান্ত বলেন—দুই-একদিন এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে ভদ্র পোষাক পরিধান করুন।

বাইরের প্রসাধন বা সাজ-পরিচ্ছদের প্রতি সনাতনের কোন মোহ নাই। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন না। বলেন—আমি এখানে আর এক মুহূর্ত-ও থাকতে চাইনে। আমার গঙ্গাপারের ব্যবস্থা ক'রে দাও; আমি এখুনি এখান থেকে চলে যাব।

শ্রীকান্তের অনুরোধ-উপরোধে কোন ফল হয় না। সনাতন তাঁর সঙ্কল্পে অটুট। ভিখারীর পরিচ্ছদ পরিবর্তন করতে-ও তিনি রাজী নন। তবে শ্রীকান্তের একান্ত অনুরোধে তাঁর ভোট কম্বলখানি গ্রহণ করলেন। তীব্র শীত। শীতের কষ্ট লাঘবের জন্যই দামী কম্বলখানি তিনি সনাতনের অঙ্গে জড়িয়ে দেন। নদী পার হয়ে তিনি গৌরাঙ্গ-ধ্যান করতে করতে কাশী অভিমুখে প্রস্থান করেন।

* * * *

মহাপ্রভু এই সময় কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করছিলেন। কাশীতে পৌঁছে সনাতন তা শুনে হৃষ্ট হলেন; মনে তাঁর আনন্দ ও সঙ্কোচ, উল্লাস ও ভয়। প্রেমের ঠাকুরকে দেখতে পাবেন এই চিন্তায় আনন্দ জেগে ওঠে মনে কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের কৃতকর্মের কথা চিন্তা ক'রে সঙ্কোচ ও দুর্বলতা দেখা দেয়। কত অন্যায়, অনাচার তিনি করেছেন; তাঁর মতো পাপীর ওপর কি মহাপ্রভুর কৃপা হবে? চন্দ্রশেখরের গৃহের সম্মুখে গিয়ে তাঁর আর পা ওঠে না। ভিতরে প্রবেশ করার সাহস হয় না। দরজার পাশে বসে একমনে গৌরাঙ্গ-স্মরণ করতে থাকেন।

ভিতরে মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসে কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করছিলেন। অন্তর্যামী তিনি। চন্দ্রশেখরকে বললেন—দেখ, বাইরের দরজার কাছে একজন বৈষ্ণব এসেছেন; তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস।

চন্দ্রশেখর ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে যান অভ্যর্থনার জন্য। স্বয়ং প্রভু যাঁকে বৈষ্ণব ব'লে সাদর আবাহন করছেন তাঁর মতো ভাগ্যবান কে! কে এই গৌরাঙ্গপ্রিয় বৈষ্ণব?

চন্দ্রশেখর বাইরে থেকে এসে বলেন—দরজায় তো কোন বৈষ্ণব নাই, শুধু একজন দরবেশ বসে রয়েছেন।

—আচ্ছা, তাঁকেই নিয়ে এস, স্মিতহাস্যে বলেন মহাপ্রভু।

চন্দ্রশেখর এবার গিয়ে দরবেশকে মহাপ্রভুর নাম ক'রে ভিতরে আসতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তাঁর বিশ্বাসই হয় না যে, মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁকে কৃপা ক'রে আহ্বান করেছেন। তিনি বলেন—আপনি হয়ত ভুল করছেন, অন্য কাউকে ডেকেছেন, আমাকে নয়। চন্দ্রশেখরের কথায় তাঁর মনের সংশয় ঘোচে, উৎফুল্লহৃদয়ে কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তিনি গৃহের ভিতরে প্রবেশ করেন। উঠানে আসতেই গৌরাঙ্গ ছুটে গিয়ে সনাতনকে আবেগভরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। মহাপ্রভুর প্রেমবিহ্বল স্পর্শে সনাতন অভিভূত হয়ে পড়েন, রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—আমায় স্পর্শ ক'রো না, প্রভু, আমায় স্পর্শ ক'রো না।

উভয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রেমানন্দে অশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন। অবশেষে প্রভু সনাতনের হাত ধ'রে বারান্দায় নিয়ে তাঁর পাশেই বসান। মহাপ্রভুর অঙ্গ চিরনির্মল, শ্বেত পদ্মের মতো সুগন্ধি, অপূর্ব আভায় দীপ্তিময়। তাঁর পাশে বসতে সনাতন সঙ্কুচিত হন; নিজেকে তিনি মনে করেন ঘোর

পাতকী। কাতরকণ্ঠে অনুনয় করেন—প্রভু, আমি নরাধম, পাতকী। আমায় স্পর্শ ক'রো না।

গৌরাঙ্গ উত্তর দেন—নিজেকে পবিত্র করার জন্যই তোমায় স্পর্শ করি। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরাগ সমগ্র জগৎ পবিত্র করতে পারে।

মহাপ্রভু তারপর সনাতনকে তপন মিশ্র ও অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রূপ এবং অনুপম যে প্রয়াগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বৃন্দাবন গিয়েছেন সে-কথাও তাঁকে জানান। গৌরাঙ্গের অনুরোধে সনাতন কি ভাবে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ক'রে কাশীতে এসেছেন তা বর্ণনা করেন। অতঃপর গৌরাঙ্গ সনাতনকে ক্ষৌরকার্য ক'রে এবং স্নান ক'রে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে আদেশ দেন।

তপন মিশ্রের সঙ্গে সনাতন গঙ্গায় গিয়ে স্নান সমাপন ক'রে আসেন। মিশ্র তাঁকে নূতন কাপড় দেন পরিধানের জন্য কিন্তু সনাতন কিছুতেই জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করতে রাজী হন না। এ-কথা শুনে গৌরাঙ্গ খুশি-ই হন। সনাতন নিষ্ঠাবান, দৃঢ়চিত্ত, বীতরাগী ভক্ত। বাহিরের বিষয় থেকে মন তাঁর অন্তরের দিকে মোড় নিয়েছে। গৌরাঙ্গ খুশি হন কিন্তু সনাতনের দামী কম্বলখানার দিকে কৌতুকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সনাতনের খেয়াল হয়—তাই ত! পরণে ছিন্নবস্ত্র কিন্তু গায়ে জড়ানো রয়েছে মূল্যবান শাল! এটি থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। দুপুরে তিনি একাকী যান গঙ্গার তীরে। দেখেন একজন বাঙালী একখানি কাঁথা শুকোতে দিয়েছে। সনাতন তাঁকে অনুরোধ করেন, ভোট কম্বলখানির পরিবর্তে সেই কাঁথাখানা দিতে। তিনি প্রথমে মনে করেন ভদ্রলোক বুঝি তাঁর সঙ্গে ব্যঙ্গ করছেন। মূল্যবান কম্বলের বিনিময়ে অতি অল্পমূল্যের ছেঁড়া কাঁথা কে নিতে চায় স্বেচ্ছায়! সনাতনের একান্ত আগ্রহ দেখে কাঁথার সঙ্গে তিনি কম্বল বিনিময় করলেন। সেখানা গায়ে জড়িয়ে সনাতন ফিরে এলেন তপন মিশ্রের বাসায়।

এবার গৌরাঙ্গ অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন, বলেন—আমি তাই ভাবছিলাম। কৃষ্ণ তোমাকে সংসারের সকল আকর্ষণের বস্তু থেকে মুক্ত করলেন অথচ সামান্য একটুর প্রতি মোহ থেকেই যাবে তা কেমন ক'রে হয়। কোন ভালো চিকিৎসক তো রোগের অবশেষ রেখে দেন না। দ্বারে দ্বারে তুমি ভিক্ষা করবে, সে-ক্ষেত্রে তোমার গায়ে কি মূল্যবান কম্বল শোভা পায়!

* * * *

আভিজাত্য, প্রতিপত্তি, বিলাসব্যসন, ঐশ্বর্য—সবই ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায়। প্রবল মানসিক শক্তিতে এদের বাধা অতিক্রম ক'রে সংসারের বন্ধন ভেঙে সনাতন মুক্তির কামনায় অধীর হয়ে ছুটে এসেছেন। পেয়েছিলেন যেমন অপরিসীম, ত্যাগ-ও করেছেন তেমনি নিঃশেষ ক'রে। বন্ধন-মুক্তির অপার আনন্দ অনুভব করেন তিনি। ত্যাগে নির্মল, ভক্তিতে দ্রব সনাতনের মন কৃষ্ণ-আরাধনার পক্ষে অনুকূল হয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত। মহাপ্রভু দুই মাস কাল কাশীতে অবস্থান ক'রে—

তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম
ভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

## আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখান

রৌদ্রদীপ্ত প্রান্তরের মধ্যে বনস্পতি শাখা-প্রশাখা প্রসারিত ক'রে বিরাজ করে। পথিকজন ছায়ায় এসে শান্তি পায়, বিহঙ্গকুল একান্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় গড়ে তোলে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গও এমনি বনস্পতিস্বরূপ। সংসারের দুঃখ-তাপে জর্জরিত শান্তিকামী ব্যক্তিরা সমবেত হয় তাঁর করুণা-কণা লাভের আশায়। যেখানেই তিনি অবস্থান করেন সে-স্থানই ভক্তজনের কল-কোলাহলে মুখরিত তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

*    *    *    *

প্রয়াগে রূপ ও অনুপমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে দশদিন রূপকে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে তিনি বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন। বৃন্দাবনে অল্পকাল অবস্থান ক'রে রূপ এবং অনুপম প্রভুর দর্শন-মানসে গৌড় হয়ে নীলাচলে গমন করেন। পথে গৌড়ে অনুপমের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। একাকী রূপ এসে নীলাচলে গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে দশ মাস অতি-বাহিত ক'রে প্রভুর আদেশে ফিরে যান বৃন্দাবনে। রূপের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির মিলন ঘটেছে ; মন হয়েছে নির্মল, নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো।

সনাতন কাশী থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে গিয়ে শোনেন রূপ এবং অনুপম প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য গৌড়ে গমন করেছেন। তিনি-ও রওনা হন নীলাচল অভিমুখে। ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে গৌরাঙ্গ-নাম জপ করতে করতে তিনি পুরীধামে এসে উপনীত হলেন। এই সময় ঝারিখণ্ডের জলপান ক'রেই হোক কিংবা যে-কোন কারণেই হোক, সনাতনের সর্বাঙ্গে কণ্ডু দেখা দিল। কুষ্ঠের সমতুল্য ; ঘা দিয়ে রস ঝরে, ঘায়ে কীড়াপোকা। এই দারুণ ব্যাধির জন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ নাই। সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করতে শিখেছেন তিনি। ভাবেন—নিজের কৃত পাপকর্মের ফলভোগ তাঁকে করতে হবে। দেহবোধ ভুলে অন্তরে ভক্তির প্রদীপ জালিয়ে তিনি দিন কাটানোর সঙ্কল্প করেন। মনে মনে স্থির করেন—নীলাচলে গিয়ে প্রভুর দর্শন-প্রাপ্তির পরই জগন্নাথের রথচক্রের তলে তাঁর অপবিত্র দেহ বিসর্জন দেবেন। দেহে জ্বলন্ত অঙ্গারের জালা, মন স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপে শান্ত।

সনাতন নীলাচলে এসে উপনীত হন। দূর থেকে চোখে পড়ে মন্দিরের চূড়া, নীল আকাশের দিকে উত্থিত শান্তির অভয়বাণী যেন। এই সেই পুণ্যস্থান যেখানে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ করুণার উৎসরূপে বিরাজ করছেন। সনাতন নগরে প্রবেশ করেন কিন্তু সোজা প্রভুর সমীপে উপস্থিত হওয়ার সাহস পান না। হিন্দু হ'লেও তিনি মুসলমানের কর্মচারীরূপে মুসলমানী পরিবেশে জীবন-যাপন করেছেন। মুসলমানের আচরণ, মুসলমানের সঙ্গ, হিন্দুধর্মের বিপরীত কাজকর্ম তাঁকে অনুষ্ঠান করতে হয়েছে। নিজের জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি স্বস্তি পান না। ভরসা কেবল জগৎতারণ গৌরাঙ্গ।

সনাতন নিজেকে একপ্রকার জাতিভ্রষ্ট মনে করেন। নীলাচলে তিনি তাই হরিদাসের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ সেখানে এলেন হরিদাসের সাক্ষাতের জন্য। সনাতন এবং হরিদাস উভয়েই ভক্তিভরে প্রণাম করেন মহাপ্রভুকে। হরিদাস বলেন—প্রভু, সনাতন তোমায় প্রণাম করছেন।

সনাতনের নাম শুনেই গৌরাঙ্গ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। সাগ্রহে তাঁকে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত হন। সনাতন পিছিয়ে যান, বলেন—প্রভু, আমায় স্পর্শ করবেন না, আমি পাপী ; সর্বাঙ্গে আমার ক্ষত থেকে ক্লেদ ঝরছে।

সনাতনের কথায় কর্ণপাত না ক'রে মহাপ্রভু তাঁকে সাদরে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কাঁচা সোনার দেহে লেগে যায় ক্ষত থেকে নির্গত রস। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। পরম আদরের বস্তু পেয়েছেন যেন এমনিভাবে উৎফুল্ল তিনি। অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর। নীলাচলে সনাতনের এই প্রথম আগমন। গৌরাঙ্গ তাঁকে হরিদাসের কাছে বাস ক'রে কৃষ্ণ-কথায় সময় অতিবাহিত করতে আদেশ করলেন।

দিন যায়। সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরে যান না। হরিদাসের মতোই তিনি-ও দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখে প্রণাম নিবেদন করেন। প্রতিদিন প্রভু একবার ক'রে এসে সনাতনকে আলিঙ্গন দিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু সময় যাপন ক'রে যান। তাঁর আন্তরিক নিষেধ সত্ত্বেও গৌরাঙ্গ তাঁকে বক্ষে ধারণ করেন ; প্রতিবারই তাঁর ব্যাধি-ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে। এতে সনাতনের মনঃকষ্টের সীমা থাকে না। তিনি সঙ্কল্প করেন শীঘ্রই দেহ বিসর্জন দেবেন, জীবনের অবসান ঘটাবেন।

একদিনের ঘটনা। প্রভু এসেছেন হরিদাসের কুটীরে সনাতনের সঙ্গে আলোচনার জন্য। সনাতনের মনোভাব জানেন তিনি। বলেন—সনাতন, তুমি দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছ। দেহত্যাগ করলে যদি কৃষ্ণকে পাওয়া যেত, তবে আমি মুহূর্তমধ্যে কোটিবার দেহত্যাগ করতাম। মৃত্যুবরণ ক'রে নয়, প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। আত্মহত্যা তমো ধর্ম। তামসিক ও রাজসিক ধর্মে কৃষ্ণ মেলে না। ভক্তি বিনা প্রেম হয় না, প্রেম বিনা কৃষ্ণকে পাওয়া অসম্ভব। আত্মহত্যা পাপ এবং তামস ধর্ম। ভক্ত কৃষ্ণ থেকে বিচ্যুত হ'লে দেহ পরিত্যাগ করতে চায় কিন্তু প্রেমের ভিতর দিয়ে সে যখন কৃষ্ণকে পায়, তখন সে মৃত্যুর চিন্তাও করতে পারে না। কীর্তন ও ভজন কৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার একমাত্র উপায়। তুমি তাই করো। পাপ-অভিসন্ধি পরিত্যাগ করো।

সনাতন বিস্মিত হন। তিনি মনের কথা নিজের মনেই চেপে রেখেছেন! তবু প্রভুর অগোচর কিছুই নাই। প্রভুর চরণ ধারণ ক'রে তিনি বলেন—তুমি অন্তর্যামী ভগবান, তুমিই সর্বস্ব! তুমি আমাদের যে ভাবে নাচাও আমরা তেমনি নাচি; আমরা তো কাঠের পুতুলমাত্র। আমার এ ছার দেহ দিয়ে তোমার যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে তবে তাই হবে।

—তোমার দেহ আমার কাছে অতি পবিত্র এবং মূল্যবান। যে কাজ আমি নিজে করতে পারিনি, তোমাকে সেই কাজ করতে হবে। আরাধনার প্রকৃতি নির্ধারণ, ভক্ত ও কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বিচার, বৈষ্ণবের কর্তব্য এবং প্রতিদিনকার আচার-নিয়ম, কৃষ্ণপ্রেম প্রচার, লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার, মথুরা ও বৃন্দাবনে ভক্তি-ভাবের প্রসার আমার একান্ত কাম্য। জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করছি। মথুরায় আমি নিজে গিয়ে কিছু করতে পারছিনে। তোমার মারফৎ আমি এ কাজ সম্পন্ন করতে চাই, আর তুমি কিনা সেই জীবন বিনাশ করার অভিপ্রায় মনে মনে পোষণ কর। কেমন ক'রে তা হ'তে পারে?

গৌরাঙ্গের কথা শুনে হরিদাস এবং সনাতন উভয়েই মনে মনে বিস্ময় অনুভব করেন। প্রভুর সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা। কাকে দিয়ে কোন্ কাজ করাবেন, তা তিনি-ই মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছেন। সনাতন ভাবেন—এই তুচ্ছ দেহ যদি প্রভুর ইচ্ছা-পূরণে কাজে লাগে, তার চেয়ে গৌরবের

আর কী আছে! বিনীতভাবে বলেন—প্রভু, আমার পাপ দেহ মন তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। তোমার যা আজ্ঞা তাই পালন করবো।

* * * *

দেহ গৌরাঙ্গে সমর্পিত হয়েছে কিন্তু সনাতনের মন খুঁতখুঁত করে—এই রোগজীর্ণ, ক্লেদসিক্ত দেহ প্রভুর পদে অর্পণ করতে হ'ল! দেহের যন্ত্রণার জন্য ক্ষোভ নাই কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত শরীর গৌরাঙ্গ তাঁর পবিত্র পদ্মগন্ধী দেহে ধারণ করেন এজন্যই মনোব্যথা। একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় ভক্তবৃন্দসহ অবস্থান করছেন। জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর সূর্যতেজে আকাশ তাম্রবর্ণ, মাটি অগ্নিবৎ তপ্ত। সনাতনকে না দেখে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। প্রভু আহ্বান করেছেন শুনে সনাতন হৃষ্টচিত্তে দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করেন—সনাতন, কোন্ পথ দিয়ে এলে?

—সমুদ্রের তীর দিয়ে।

—কেন? সিংহদ্বারের ছায়াশীতল পথ দিয়ে এলে না কেন? এই প্রচণ্ড রৌদ্রে তপ্ত বালুকার ওপর দিয়ে আসতে তোমার পায়ে নিশ্চয়ই ফোস্কা উঠেছে?

দেখা গেল সত্যই পায়ে ফোস্কা পড়েছে কিন্তু প্রভুর চিন্তায় সনাতন এমনই তন্ময় হয়ে আসছিলেন যে, দেহবোধ তাঁর ছিল না। সনাতন বলেন—আমি তো কোন কষ্ট অনুভব করিনি। একে নীচ, তাতে ব্যাধিগ্রস্ত। মন্দির-পথে আসতে কাউকে হঠাৎ স্পর্শ ক'রে অপরাধী হই, এই ভয়ে সমুদ্রতীরের পথই বেছে নিয়েছিলাম।

প্রভু স্মিতহাস্যে বলেন—তোমার যোগ্য কাজই তুমি করেছ। তোমার স্পর্শ জগৎ পবিত্র করতে পারে; তোমার বিনয় প্রকৃত ভক্তেরই লক্ষণ। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখানোর জন্যই তোমাকে এই দুই প্রহরের সময় আহ্বান করেছিলাম।

এই কথা ব'লে সকল ভক্তের সম্মুখে সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। সনাতনের দেহ-নিঃসৃত দুর্গন্ধ ক্ষতক্লেদ তাঁর দেহে লেগে যায়। চন্দন-চিহ্নের মতোই তিনি তা ধারণ করেন।

আর একদিন। যথারীতি হরিদাসের গৃহে গৌরাঙ্গ এসেছেন সনাতনকে আলিঙ্গন দিতে। দেহত্যাগের সঙ্কল্প তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে অথচ প্রভু যে প্রতিদিন দুর্গন্ধময় রোগের ক্লেদ অঙ্গে ধারণ করবেন, তা-ও সহ্য হয়

না। জগদানন্দের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করেন। এই সময়ে একদিন প্রভু এসেছেন। বলেন—বৈষ্ণবের কাছে দেহ তুচ্ছ। দেহ ধারণ ক'রেও সে দেহাতীত; ভক্তি ও আনন্দই তার প্রধান। ভক্ত কৃষ্ণের কাছে দেহ সমর্পণ করে; কৃষ্ণ সে দেহ চিৎ ও আনন্দে পূর্ণ করেন। কৃষ্ণ আমার পরীক্ষার জন্যই সনাতনের দেহে এমন রোগের সৃষ্টি করেছেন। আমি যদি ঘৃণাভরে সনাতনকে আলিঙ্গন করতে না চাই, তবে কৃষ্ণের কাছে আমি অপরাধী হব।

......এই কথা ব'লে মহাপ্রভু যেমনি প্রেমভরে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, অমনি তাঁর দেহের ক্ষত কোথায় মিলিয়ে গেল; দেহে ফুটে উঠলো স্বর্ণকান্তি!

ভক্তের জয়, ভক্তির জয়, নিষ্ঠার জয়। মহামানবের শক্তি অলৌকিক, সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। যুগে যুগে মানুষ এমনি শক্তির পরিচয় পেয়েছে। মহাপ্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান সনাতন বৃন্দাবন গমন করেন।

*　　　*　　　*　　　*

শ্রীভগবান আচার্য গৌরাঙ্গের নিষ্ঠাবান ভক্ত; বিদ্বান, ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ। স্বরূপ গোস্বামীর সহচর। মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্যই তিনি নীলাচলে অবস্থান করছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্তিভরে গৌরাঙ্গকে গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে ভিক্ষাদান করতেন। একদিন এমনি আয়োজন হয়েছে। প্রভু ভোজনে বসেছেন। সুন্দর সুগন্ধি মিহি চা'লের ভাত। দেখে তিনি প্রশংসা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন উত্তম চা'ল কোথায় পেলে?

ভগবান বিনয়সহকারে উত্তর দেন—ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে।

তখন গৌরাঙ্গ আর কোন কথা বলেন না। ভোজনান্তে গৃহে ফিরে গোবিন্দকে বলেন—আজ থেকে ছোট হরিদাসের স্থান এখানে হবে না। তাকে বলবে, সে যেন এখানে আর না আসে।

নীলাচলে প্রভুর পার্ষদের মধ্যে হরিদাস ছিলেন দুইজন। একজন মুসলমান ভক্ত। একান্ত অনুরাগী, গৌরাঙ্গগত-প্রাণ। তাঁর আশ্রয়ে এসে সনাতন কিছুকাল বাস করেছিলেন। ছোট হরিদাস সুকণ্ঠ, উদাসীন। কীর্তনে তাঁর সুমিষ্ট সুরমাধুর্য শুনে প্রভু আবিষ্ট হতেন। তিনি প্রভুর

কাছে কাছে থেকে তাঁকে কীর্তন শোনাতেন। হরিদাস সুর-সুধা ঢালতেন গৌরাঙ্গের অন্তরে। তবু তিনি তাঁর সঙ্গ থেকে নির্বাসিত হলেন দেখে ভক্তবৃন্দের মনে দুঃখ ও শঙ্কা জেগে উঠলো। হরিদাস এই আদেশ শুনে তিন দিন অনাহারে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মাটিতে লুটিয়ে অশ্রুজলে মাটি ভিজালেন কিন্তু করুণাময় গৌরাঙ্গের অন্তর বিগলিত হ'ল না। হরিদাসের প্রতি প্রভুর এই নির্মম আদেশের কারণ কি, তা কেউ জানতে পারল না। ভক্তরা সাহস-ও পান না কিছু জিজ্ঞাসা করতে। অবশেষে স্বরূপ এবং অন্য কয়েকজন প্রিয় ভক্ত গৌরাঙ্গের কাছে হরিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

প্রভু বললেন—যে বৈরাগী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলে আমি তার মুখদর্শন করতে পারি না। রিপুকে বশে রাখা অত্যন্ত কঠিন; কামনার বস্তুর দিকে সে সদাই ধাবিত হয়। এমন কি দারুময় স্ত্রীমূর্তি পর্যন্ত যোগীর চিত্ত-বিভ্রম ঘটাতে পারে।

ভক্তরা ছোট হরিদাসের পক্ষ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন—মাধবী মাহিতী বৃদ্ধা মহিলা, গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তিমতী তিনি। গৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগবশতঃই হরিদাস তাঁর কাছ থেকে সরু চাউল ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

পুরী-গোস্বামী পর্যন্ত অনুনয় করলেন কিন্তু গৌরাঙ্গ অটল। বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন—তোমরা যদি বেশী পীড়াপীড়ি কর তবে আমায় আর এখানে দেখতে পাবে না; আমি একাকী আলালনাথে গিয়ে বাস করবো। ছোট হরিদাস শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে এক বৎসরকাল নীলাচলে বাস করলেন। প্রভুর দর্শন তাঁর ভাগ্যে আর হ'ল না। অবশেষে দূর থেকে প্রণাম ক'রে তিনি নীলাচল ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন প্রয়াগে। সেখানে ত্রিবেণী-সঙ্গমে জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'রে তিনি অপরাধ ও মানসিক কষ্টের জ্বালা থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন। ভক্তের সামান্য দুঃখে যাঁর অন্তর বিগলিত হয়, সেই ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ বজ্রের মতো কঠোর হয়ে রইলেন। নিজের অনুচরের স্খলনে ক্ষমাহীন তিনি। লোকশিক্ষার জন্যই এ নির্মম কঠোরতা।

* * * *

সর্বকালে এবং সকল মানুষের সমাজেই এমন কতক লোক থাকে যারা কেবল পরের দোষ-ত্রুটি খোঁজ ক'রে বেড়ায়। নিজেদের দোষ সম্বন্ধে তারা

অন্ধ, দৃষ্টি কেবল অন্যের আচরণের প্রতি। নিজের কল্যাণ তারা সম্পাদন করতে পারে না, অন্যের কাছে তারা প্রিয়-ও হ'তে পারে না। এমনি ধরনের মানুষের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবার উপায়স্বরূপ চীনা ঋষি কন্‌ফুসিয়ন্‌ বলেছিলেন—

> যদি তুমি কোন গুণী ব্যক্তিকে দেখ, তাঁর গুণ অনুকরণ করার চেষ্টা ক'রো ;
> যদি কোন দুষ্ট অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে দেখ, নিজের অন্তর খুঁজে দেখ তার দোষ তোমার মধ্যে আছে কিনা।*

পর-ছিদ্র অন্বেষণ করার চেয়ে আত্ম-পর্যবেক্ষণ ক'রে নিজের ত্রুটি সংশোধন করাই আত্মশুদ্ধি-লাভের সর্বোত্তম পন্থা। গৌরাঙ্গ-ও ভক্তদের কাছে এমনি উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য রামচন্দ্র-পুরী ছিলেন পরদোষান্বেষী, দাম্ভিক। পরম সাধুর ভান ক'রে অন্যের কাছে ভক্তি ও বাহবা লাভের কামনা ছিল তাঁর। ব্যবহারে তিনি দেখাতে চাইতেন তাঁর মতো সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন এবং নিষ্ঠাবান যোগী সাধু আর কেউ নাই। গৌরাঙ্গ-ভক্তদের দোষ অন্বেষণ করতে লাগলেন তিনি।

রামচন্দ্র-পুরী নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বসতেন, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। একদিন জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ভোজন করালেন। নিজের খাওয়া শেষ হ'লে জগদানন্দকে বললেন—আমার পাতে অবশিষ্ট প্রসাদ রেখেছি ; তুমি খেতে বসো, আমি পরিবেশন করছি।

জগদানন্দ সরল বিশ্বাসে আহারে বসলেন। পুরী-গোঁসাই বারে বারে অনুরোধ-উপরোধ ক'রে প্রসাদ পরিবেশন ক'রে তাঁকে ভোজন করালেন। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বসে বলতে লাগলেন—আমি শুনেছিলাম চৈতন্যের ভক্তরা রীতিমত পেটুক। এখন স্বচক্ষে দেখলাম কথাটা ঠিকই। সন্ন্যাসী যদি এত

---

* **Confucius :**

**When you see a good man,**
**Try to emulate his example ;**
**And when you see a bad man,**
**Search yourself for his faults.**

খায়, তবে তার ধর্ম নষ্ট হ'তে বাধ্য। তোমরা হ'লে বৈরাগী অথচ তোমাদের খাওয়ার এই রকম বহর! এ তোমাদের সব মেকি বৈরাগ্য।

মহাপ্রভুর প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ থাকত। এক আনার খাবার তিনজন—গৌরাঙ্গ, কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ—গ্রহণ করতেন। রামচন্দ্র-পুরী মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সব খোঁজ-খবর সংগ্রহ করতেন—কেমন ঘরে থাকেন, কেমন খাদ্য গ্রহণ করেন, বিছানা কেমন, কি ভাবে চলা-ফেরা করেন, কি রকম আচরণ ; এই সবের ভিতর থেকে কোন খুঁত বের করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে গোয়েন্দার মতো অনুসন্ধান। গৌরাঙ্গের গুণগুলি তাঁর নজরে পড়ে না কিন্তু দোষ-ও তো কিছু ধরা যায় না! তবু লোকের কাছে ব'লে বেড়াতে লাগলেন—চৈতন্য সন্ন্যাসী কিন্তু তবু তিনি মিষ্টি খেয়ে থাকেন। এরূপ বিলাসিতা করলে ইন্দ্রিয় দমন হবে কেমন ক'রে?

প্রতিদিন রামচন্দ্র-পুরী গৌরাঙ্গের কাছে আসেন কেবল তাঁর দোষ সন্ধান করার জন্য কিন্তু প্রভু তাঁকে গুরুর মতো ভক্তিভরে সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা করেন। একদিন সকাল বেলা তিনি এসেছেন, দেখেন মেঝের মধ্যে কতকগুলি পিঁপড়ে চলা-ফেরা করছে। তিনি তাঁর অভিপ্রায়মতো বলার কিছু পেয়েছেন, বলেন—নিশ্চয়ই কাল রাতে এখানে মিষ্টি আনা হয়েছিল, দেখছি পিঁপড়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। আশ্চর্য ব্যাপার! সন্ন্যাসীদের কী লোভ! মিষ্টান্ন খেয়ে ইন্দ্রিয় দমন করা অসাধ্য।

এই ব'লেই তাড়াতাড়ি তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন, যেন বিপদের মধ্যে পড়েছেন এমনি ভাব! গৌরাঙ্গ রামচন্দ্র-পুরীর পর-ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের কথা শুনেছিলেন। এখন নিজে প্রত্যক্ষ করলেন কিন্তু এর ফলে তিনি পুরীর ওপর বিরূপ বা ক্রোধ প্রকাশ করা কিছুই করলেন না। বিচার করলেন নিজের মনকে। যাতে অপর কেউ কুৎসা রটানোর বা সমালোচনা করার মতো কিছু না পায়, সন্ন্যাসীর জীবন ও আচরণ এমনি হওয়া উচিত—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। গোবিন্দকে ডেকে বললেন—আজ থেকে আমার খাবার হবে এক পয়সা মূল্যের পিণ্ডাভোগ, সামান্য পরিমাণ ভাত ও তরকারি। আমার জন্য এর চেয়ে বেশী আর কিছু গ্রহণ ক'রো না। যদি এর বেশী আন, তবে আমায় আর এখানে দেখতে পাবে না।

এই সামান্য পরিমাণ খাদ্যের অর্ধেক গৌরাঙ্গ গ্রহণ করেন, বাকি অর্ধেক রেখে দেন ভৃত্য গোবিন্দের জন্য। এতে উভয়েরই সিকি আহারও হয় না। কিন্তু গৌরাঙ্গকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করাবে কে ?

কিছুদিন এই রকম অবস্থায় চললো। রামচন্দ্র-পুরী সব খবরই রাখেন। একদিন গৌরাঙ্গের কাছে এসে উপস্থিত, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ; ভাব এই যে, কেমন শিক্ষা দিলাম! হাসতে হাসতে বলেন— অতি-ভোজন সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়, নিছক শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাই খাওয়া উচিত। তোমাকে শীর্ণ দেখাচ্ছে এবং শুনছি তুমি নাকি অর্ধাহারে রয়েছ। এই শুক্‌না বৈরাগ্য-ও কিন্তু সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। সন্ন্যাসী তখনই সত্যকার জ্ঞানযোগ পালন করেন যখন তিনি ঠিক যেটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ আহার করেন, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্য উপভোগ করেন না।

গৌরাঙ্গ শান্তকণ্ঠে বলেন—আমি অজ্ঞ, আপনার ছাত্রতুল্য। আমার সৌভাগ্য যে, আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন।

রামচন্দ্র-পুরী মনে মনে খুব খুশি। গৌরাঙ্গকে শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। পরদিন ভক্তগণ পরমানন্দ-পুরীকে সঙ্গে নিয়ে গৌরাঙ্গের নিকট হাজির হন ; তাঁদের অনুরোধ—পরনিন্দুক রামচন্দ্র-পুরীর কথামতো তিনি যেন খাদ্য পরিত্যাগ ক'রে নিজেকে কষ্ট না দেন।

মহাপ্রভু বলেন—তোমরা রামচন্দ্র-পুরীর দোষ দিও না। তিনি স্বাভাবিক ধর্মের ব্যাখ্যাই করেছেন, অন্যায় কিছু করেননি। ভোজন-বিলাস তো সন্ন্যাসীর জন্য নয়। শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বল্পতম খাদ্য যা প্রয়োজন তাই হ'ল সন্ন্যাসীর উপযুক্ত আহার।

* * * *

মহাপ্রভু জ্ঞান ও বিনয়ের উৎসস্বরূপ। অপরের সমালোচনা করার পরিবর্তে তিনি নিজের অন্তর পরীক্ষা করেন। 'আপনি আচরি' তিনি অপরকে শিক্ষা দেন।

* * * *

রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর রসজ্ঞ ভক্ত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ উপযুক্ত কর্মচারী তিনি। যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, সম্পদ কোন কিছুরই অভাব নাই তাঁর। রামানন্দ এবং তাঁর চারজন ভাই সকলেই মহাপ্রভুর প্রিয়। রামানন্দ ও বাণীনাথ গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত। অপর ভাই

গোপীনাথ রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইনি ছিলেন বড়ই বিলাসী। কাজের জন্য যে বেতন তিনি পেতেন তাতে তাঁর খরচ কুলায় না; রাজার গচ্ছিত তিনি ব্যয় ক'রে ফেলেন। এইভাবে তিনি দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েন।

রাজসরকারের দেনা পরিশোধের উপায় কি? অবশেষে স্থির হ'ল, গোপীনাথের যে দশ-বারোটা উৎকৃষ্ট ঘোড়া আছে তার মূল্য নির্ধারণ ক'রে রাজাকে দেওয়া হবে; অবশিষ্ট টাকার জন্য অন্যান্য জিনিস বিক্রি ক'রে ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা হবে। রাজকুমার পুরুষোত্তম ঘোড়া সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। ঘোড়া দেখে তার গুণাগুণ তিনি নিরূপণ করতে পারতেন। রাজার আদেশে তিনি এলেন গোপীনাথের ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করতে কিন্তু যা সঙ্গত দাম হওয়া উচিত তিনি তার চেয়ে কম মূল্য বলতে লাগলেন।

প্রিয় ঘোড়াগুলির কম দাম শুনে গোপীনাথ বড়ই রুষ্ট হলেন। এমন সুন্দর এবং সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব; অথচ রাজপুত্র কিনা সেগুলির যোগ্য মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক নন। রাগান্বিত হয়ে রাজকুমারকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেন—আমার ঘোড়া তো তোমার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক চায় না, তবে এত কম মূল্য বলছো কেন?

রাজকুমারের সত্যই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকানোর মুদ্রাদোষ ছিল। ব্যক্তিগত ত্রুটির উল্লেখ ক'রে বিদ্রূপ করায় পুরুষোত্তম বড়ই ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাজার কাছে গিয়ে গোপীনাথের নামে নানা অভিযোগ ক'রে তাঁকে চাঙ্গে চড়ানোর আদেশ নিলেন। যে ব্যক্তি রাজসরকারের অর্থ আত্মসাৎ করে সে এমনিতেই অপরাধী; তার ওপর সে যদি হয় দুর্বিনীত, অশিষ্টাচারী, রাজার মর্যাদার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, তবে শাস্তি তার ন্যায়তই প্রাপ্য।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানো হবে—এ-খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং তাঁর পরিবারে নেমে এলো হাহাকার ও শোকের ছায়া। চাঙ্গে-চড়ানোর অর্থ অপরাধীর প্রাণবধ। একটি মঞ্চ তৈরি ক'রে তার ওপর থেকে অপরাধীকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় নীচে ধারালো খড়্গের ওপর ফেলে দেওয়া হয়।

রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দের কাছে-ও তিনি প্রিয়। রামানন্দ রায়ের ভ্রাতাকে এইভাবে চাঙ্গে চড়িয়ে প্রাণবধ করা হবে শুনে গৌরাঙ্গের পরিচরগণ শিউরে উঠলেন। তাঁরা সবাই গিয়ে উপস্থিত হলেন মহাপ্রভুর সমীপে। নিবেদন এই—রামানন্দ রায়ের ভাইয়ের প্রাণরক্ষা করতে হবে। রাজা নিজে-ও গৌরাঙ্গ-ভক্ত।

গৌরাঙ্গের একটি কথাতেই গোপীনাথ রক্ষা পেতে পারে, তাঁকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নাই।

ভক্তগণ প্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন কিন্তু গৌরাঙ্গ নির্বিকার। তিনি বলেন—গোপীনাথ রাজার কাছ থেকে যে বেতন পায়, তাতে তার বিলক্ষণ চলে। তবু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সে লোভের বশে রাজার অর্থ আত্মসাৎ করেছে; সে দোষী। দোষীর শাস্তি হওয়াই উচিত।

এদিকে গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানো হয়েছে। হাত-পা শক্ত ক'রে বাঁধা, নীচে শাণিত অস্ত্র। ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসন্ন। গোপীনাথ প্রাণের মায়া ত্যাগ করলেন; পরকালের চিন্তায় বিভোর হয়ে তিনি কৃষ্ণনাম জপ করতে লাগলেন। নিশ্চিত মহাবিপদের মুখে মানুষের কাছে সংসার শূন্য ব'লে মনে হয়; তখন ঈশ্বরই একমাত্র অবলম্বন।

গৌরাঙ্গের ভক্তগণ রামানন্দ রায়ের পরিবারের এই দারুণ বিপদের সময় প্রভুর পদে সকরুণ মিনতি জানাতে লাগলেন। এটি যেন মহাপ্রভুর-ও পরীক্ষা। যা তিনি নিজের মনে অন্যায় ব'লে বিবেচনা করেন সেই কাজই তাঁকে করতে হবে! তিনি বিচার ক'রে দেখলেন—গোপীনাথ রাজার কাছে অপরাধী, তিনিই তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন। এ-ক্ষেত্রে রাজসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ভক্তদের বললেন—আমি সন্ন্যাসী, রাজার নিকট গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা করা আর ঋণের অর্থ ভিক্ষা করা একই কথা। এ-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। তোমরা যদি নিতান্তই ভয় পেয়ে থাক, জগন্নাথদেবের শরণ নাও।

* * * *

গৌরাঙ্গ যখন ভক্তদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, তখন মহাপাত্র হরিচন্দন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্রুত রাজার নিকট গিয়ে তিনি এই অবস্থার বিবরণ দিলেন, বললেন—মহারাজ, গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানো হয়েছে। তার প্রাণ নিলে আপনার ঋণ শোধ হবে না, অথচ ভবানন্দ ও রামানন্দ রায়ের পরিবার দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হবে। ভবানন্দ-পরিবার আপনার কৃপায় ও অনুগ্রহে পরিপুষ্ট; শুধু তাই নয় এঁরা সবাই মহাপ্রভুর-ও কৃপাপাত্র।

গোপীনাথের শাস্তি-বিধান করলে মহাপ্রভু মনে ব্যথা পাবেন এই

আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ রাজা গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে নামানোর আদেশ দিলেন। গোপীনাথের যেন পুনর্জন্ম হ'ল; ভক্তগণ আনন্দে উৎফুল্ল হলেন, বুঝলেন, গৌরাঙ্গ না থাকলে গোপীনাথের নিস্তার ছিল না। ভক্তগণ এটি-ও উপলব্ধি করলেন—কোন অন্যায় কাজের সমর্থন গৌরাঙ্গের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, তা সে অন্যায়কারী ভক্তই হোক্ কিংবা ভক্তের পরিবারের যে কেউ-ই হোক্।

* * * *

জগদানন্দ গৌরাঙ্গগত-প্রাণ; তাঁর সেবা-যত্ন ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করেন। গৌরাঙ্গের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নাই। একাধারে তিনি যেমন অনুরাগী ভক্ত, তেমনি স্পষ্টবাদী নির্ভীক্ সমালোচক।

প্রভুর আদেশে জগদানন্দ নবদ্বীপে গিয়ে কিছুকাল বাস করলেন। সন্ন্যাসী হ'লেও গৌরাঙ্গ মায়ের কথা ভুলতে পারেননি। নবদ্বীপের গৃহের তত্ত্বাবধান করার জন্য জগদানন্দের মতো নিষ্ঠাবান লোকের প্রয়োজন। প্রভুকে ছেড়ে দূরে বাস করতে কষ্ট হ'লেও জগদানন্দ প্রভুর বাক্য শিরোধার্য করেন। নবদ্বীপে প্রভুর কথা, প্রতিদিনকার লীলা ও ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন তিনি। শচীমাতা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নবদ্বীপের ভক্তগণের কানে জগদানন্দের কথা অমৃত বর্ষণ করে। দূরে বাস করলেও তাঁরা মানসচক্ষে নীলাচলে গৌরাঙ্গের লীলা প্রত্যক্ষ করেন যেন।

গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেম ক্রমেই উদ্বেল হয়ে উঠছে। জগদানন্দ ভাবেন তাঁর বায়ু পিত্ত কফ প্রবল হয়ে উঠলে কত কষ্টই পাবেন। তাই প্রাণের প্রিয় গৌরাঙ্গের জন্য নবদ্বীপ থেকে এক হাঁড়ি চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ ক'রে দীর্ঘ পথ বয়ে আনেন। মনের একান্ত বাসনা প্রভুর মস্তকে মালিশ ক'রে দেবেন; এতে তাঁর কৃষ্ণবিরহজনিত দৈহিক তাপ কম থাকবে। জগদানন্দ ফিরে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন সুগন্ধি মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী চন্দন তৈল। কিন্তু তিনি নিজে প্রভুকে সে তেল গ্রহণ করার কথা বলতে সাহস পান না। গোবিন্দের কাছে গোপনে তেলের হাঁড়ি দিয়ে বলেন—প্রভুর মাথায় মালিশ ক'রে দিও।

সুযোগ বুঝে গোবিন্দ জগদানন্দের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; বলেন—চন্দনাদি তৈলে বায়ু পিত্ত উপশম হয় ব'লে জগদানন্দ অনেক পরিশ্রম ক'রে নবদ্বীপ থেকে তোমার জন্য এনেছে।

স্নিগ্ধ হাসিতে গৌরাঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ; বলেন—কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, তেল ব্যবহার করবো কেমন ক'রে ? বিশেষ ক'রে সুবাসিত তেল ? ঐ তেল জগন্নাথের মন্দিরে দিতে বল, প্রদীপ জ্বলবে ; তা হ'লে জগদানন্দের-ও শ্রম সফল হবে।

গৌরাঙ্গের কথা গোবিন্দের খুব মনঃপূত হয় না। জগদানন্দের-ও না। তেল আনা হয়েছে তাঁদের প্রাণের দেবতা জীবন্ত ঠাকুর গৌরাঙ্গের জন্য ; প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করতে মন সায় দেয় না। কিছুদিন পরে জগদানন্দের তাগিদে গোবিন্দ আবার কথাটি তোলেন প্রভুর কাছে। এবার তিনি বিরক্ত হলেন। তাঁর আচরণের ভিতর দিয়ে যে আদর্শ তিনি তুলে ধরতে চান ভক্তদের এবং অন্য সকলের সামনে, তাতে এরাই তো বাধা সৃষ্টি করে! ব্যঙ্গ ক'রে বললেন—বেশ কথা, সুগন্ধি তেল আনা হ'ল ; এবার একজন চাকর ঠিক ক'রে দাও তেল মালিশ ক'রে দেবে। তা হ'লে আমার এবং তোমাদের সকলের মানসম্ভ্রম খুব বাড়বে। লোকে খুব বাহবা দিবে!

গোবিন্দের আর কথা বলার সাহস হ'ল না। পরদিন জগদানন্দকে দেখেই প্রভুর চন্দন তেলের কথা মনে পড়লো। বললেন—পণ্ডিত, তেল এনেছ আমার জন্য কিন্তু সন্ন্যাসীর তো তেল মাখতে নাই। ও-তেল শ্রীমন্দিরে দাও, জগন্নাথদেবের সম্মুখে প্রদীপ জ্বলবে ; তা হ'লে তোমার শ্রম সার্থক হবে।

জগদানন্দের মনের মধ্যে যে অভিমান এতদিন রুদ্ধ হয়ে গুমরে মরছিল, আজ তা বাঁধ-ভাঙা জলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। প্রিয়জনের জন্য যে জিনিস তিনি বহন ক'রে এনেছেন তার সঙ্গে কতখানি দরদ, কতখানি আন্তরিকতা, কতখানি প্রীতি-কল্পনা মিশানো রয়েছে, তা কেউ উপলব্ধি করলো না! বরং সে-ই কিনা হ'ল ব্যঙ্গ, উপহাসের পাত্র! জগদানন্দ আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললেন—আমি তেল এনেছি এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বললো ?

ছুটে গেলেন তিনি গোবিন্দের ঘরে। কলসীটি নিয়ে এসে গৌরাঙ্গের সম্মুখে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে রাগে দুঃখে অভিমানে ফুলতে ফুলতে ফিরে গেলেন নিজের কক্ষে। কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ। ঘরের দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে রইলেন। দুদিনের মধ্যে ভূমিশয্যা ত্যাগ করলেন না ; অনাহারে দিন অতিবাহিত হ'ল। কী গভীর সেবানুরাগ!

জগদানন্দ বাড়াবাড়ি করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-ধর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নয়। জগদানন্দ সেবাপরায়ণ। কিসে প্রভু সুস্থ থাকবেন, তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা কমবে, দেহ স্নিগ্ধ থাকবে, জগদানন্দের লক্ষ্য সেই দিকে। মায়ের স্নেহ, ভগিনীর সেবা, ভৃত্যের পরিচর্যা, অভিভাবকের সস্নেহ শাসনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। গৌরাঙ্গ তা উপলব্ধি করেন। উপবাসী ভক্তের জন্য তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়। তৃতীয় দিনে জগদানন্দের রুদ্ধদ্বারের কাছে গিয়ে ডেকে বলেন—জগদানন্দ, ওঠ। আজ আমি তোমার এখানে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করবো। আমি শ্রীমন্দির দর্শন ক'রে তোমার এখানে ফিরে আসছি।

রাগ আর কতক্ষণ থাকবে? প্রভু স্বয়ং এসে অনুগ্রহ জানিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে জগদানন্দ নানা দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে রান্না করলেন। গৌরাঙ্গ যথাসময়ে এসে দেখেন ভোজ্য প্রস্তুত, জগদানন্দ অপেক্ষা করছেন। দুজন একই সঙ্গে আহার করবেন এই অভিপ্রায়ে বলেন—দুইখানি পাতা করো, আমরা এক সঙ্গেই বসি।

জগদানন্দ করজোড়ে বলেন—তুমি আগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করো। আমি আর সাহায্যকারী যে কয়জন আছে পরে সকলে একত্র ভোজন করবো।

দুই-এক গ্রাস খাবার মুখে দিয়েই প্রভু উল্লাসভরে বলেন—এ কি রাগ ক'রে রান্না করলে এমন সুস্বাদু হয়! এতেই প্রমাণ হ'ল তোমার ওপর কৃষ্ণের কৃপা কতখানি!

জগদানন্দের রাগ জল হয়ে গেছে। আনন্দে তাঁর মন পরিপূর্ণ। নিজহাতে পরিবেশন ক'রে নিজের মনের সাধ মিটিয়ে প্রভুকে ভোজন করালেন। অধিক খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও খেতে হ'ল, কি জানি কম খেলে অভিমানী সেবক যদি আবার রাগে দরজা বন্ধ ক'রে উপবাসী হয়ে থাকতে সুরু করে!

হৃষ্টচিত্তে প্রভু ফিরে আসেন নিজের বাসস্থানে। গোবিন্দকে রেখে আসেন জগদানন্দ খাবার গ্রহণ করেন কিনা তা দেখবার জন্য। গোবিন্দ এসে জগদানন্দের উপবাস-ভঙ্গের সংবাদ দিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। যেমন ভক্ত তেমনি ভগবান। প্রেমের ডোরে একজন অন্যকে বাঁধলে ব্যথা ও আনন্দ উভয়েরই সমান।

# দিব্যোন্মাদ

নীল সরোবরে একটি শ্বেত পদ্ম। একের পর এক পদ্মের পাপড়িগুলি বিকশিত হয়, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল টলমল ঝলমল করে; বাতাসে সৌরভের হিল্লোল। গৌরাঙ্গের জীবন-পদ্মও এমনিভাবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। উত্তর বঙ্গ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, তারপর উত্তর ভারত পরিক্রমা ক'রে ভক্তির অমৃতধারা বর্ষণ করেছেন তিনি। তাঁর প্রেম-ভক্তির ঢেউ লেগেছে কত লক্ষজনের অন্তরে। ভক্তি, জ্ঞান, নিষ্ঠা, সদাচার নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে বাস্তব উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেছেন অন্য সকলের সম্মুখে। ভক্তি-ধর্মের প্রচার ও স্থায়িত্বের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছে। যোগ্য গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করেছেন নিজের দিকে, কাজের শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের, তারপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁদের ওপর। রূপ ও সনাতনকে সংসারের আবর্ত থেকে টেনে এনেছেন প্রেম-ভক্তির আবর্তে। চাষীর জমি চাষ করা হয়েছে, বীজ বপন করা হয়েছে, জমির আগাছা তুলে ফেলা হয়েছে; এখন ফসল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। বাইরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, দৃষ্টি অন্তরের দিকে।

* * * *

নীলাচলে মহাপ্রভুর জীবন শেষের দিকে ক্রমশ রসঘন হয়ে আসে। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেলে গোপীগণের যে অবস্থা হয়েছিল, গৌরাঙ্গের মধ্যেও তেমনি বিরহের আকুলতা দেখা দেয়। প্রভু রাধার ভাবে ভাবিত, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে তিনি কেঁদে অস্থির হয়ে পড়েন। বিরহিণী রাধার উন্মাদ অবস্থা প্রকাশ পায় তাঁর আচরণে। সর্বক্ষণ তিনি কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর।

একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কৃষ্ণের রাসনৃত্য অবলোকন করেন। নবদূর্বাদলশ্যাম, পরিধানে পীতবাস, গলে সুন্দর বনমালা, হাতে মোহন মুরলী। সুঠাম তনু মনোহর ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে কন্দর্পদেবের মতো নৃত্য করছেন। গোপিনীরা পরস্পরের হাত ধ'রে কৃষ্ণকে ঘিরে নাচে; রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ এই মিলনচক্রের মাঝখানে যেন নীল ও শ্বেতবর্ণের দুইটি কমল একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত। বিচিত্র বসন-ভূষণ-সজ্জিতা সখীরা পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে

রাধাকৃষ্ণকে মাঝে রেখে রচনা করে রঙিন কুসুমের চলমান মালা। আনন্দে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত।

গৌরাঙ্গ এই অপূর্বসুন্দর স্বপ্নদৃশ্যে বিভোর হয়ে নিদ্রিত। যথাসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। গোবিন্দ এসে জাগিয়ে দেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল, জেগে উঠলেন তিনি স্থূল বাস্তব জগতে। সেই মধুর দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখে মন ভ'রে যায়। বাস্তবকে পিছনে ফেলে মন চলে যেতে যায় স্বপ্নের জগতে।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে জগন্নাথ-দর্শনে গেছেন। শত শত লোক দর্শনার্থী। গরুড় মূর্তির নিকট দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বিগ্রহের দিকে; মন কৃষ্ণময়, জগতের পৃথক অস্তিত্ব আছে ব'লে বোধ হয় না। অন্যান্য দর্শকের সঙ্গে একজন উড়িয়া রমণী জগন্নাথ দর্শন করতে গেছেন কিন্তু সামনে দর্শকের কি ভিড়। ভাল ক'রে দেখতে পান না, উঠেছেন গরুড় মূর্তির ওপর এবং এক পা স্থাপন করেছেন গৌরাঙ্গের কাঁধের ওপর। প্রভু আত্ম-সমাহিত, দেহবোধ তাঁর নাই। স্ত্রীলোকটি-ও এমনি তন্ময় যে, কোথায় উঠেছেন, কোথায় পা রেখেছেন, সেদিকে কোন খেয়াল-ই নাই। গোবিন্দ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিতেই প্রভুর চেতনা ফিরে এসেছে, বলেন—আহা, ওকে সরিয়ো না, প্রাণভরে জগন্নাথকে দেখতে দাও।

সচকিত স্ত্রীলোকটি এবার নিজের ত্রুটি বুঝতে পারেন, তাড়াতাড়ি নেমে গৌরাঙ্গের পদতলে লুটিয়ে পড়েন। প্রভু বলেন—আহা কি আর্তি! জগন্নাথ দর্শনের জন্য এই রমণীর যেমন ব্যাকুলতা এমনি যদি আমার হ'ত! এঁর দেহ-মন ঈশ্বরের চিন্তায় এমনি নিবিষ্ট যে, আমার কাঁধে পা রেখেছেন তা জানতেই পারেননি। ধন্য ইনি।

গৌরাঙ্গ দুঃখ-ভরা মন নিয়ে বাসায় ফিরে আসেন। মাটিতে বসে নখ দিয়ে আঁচড় কাটেন। চোখে নামে অশ্রুর বান, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। বিলাপ ধ্বনিত হয়—হায় কৃষ্ণকে পেয়ে-ও হারালেম! কে আমার কৃষ্ণকে কেড়ে নিল? আমি কোথায় এসেছি?

ভাবাবেশে অঙ্গ পুলকে থরথর ক'রে কাঁপে; যখনি জ্ঞান ফিরে আসে বিরহ-ব্যথায় আকুল অধীর হয়ে পড়েন এই অবস্থায় দিবারাত্রি কাটে। স্নানাহার চলে যন্ত্রের মতো; দেহ-ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার তদারক

করেন ভক্ত বৃন্দ কিন্তু প্রভু বেশীর ভাগ সময়ই থাকেন ভাব-লীন, মনকে নিয়ে অন্তর্মুখী, কৃষ্ণভক্তির সাগরে নিমজ্জিত।

*   *   *   *

কৃষ্ণপ্রেম হয়েছে নিবিড়। সর্বদা গৌরাঙ্গ সেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। রস আস্বাদনে সঙ্গী আর দুজন—রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেন রামানন্দ, কৃষ্ণলীলা কীর্তন করেন স্বরূপ। কথায়, সঙ্গীতে যে ভাবের প্রকাশ পায় গৌরাঙ্গ তা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন নিজের অন্তর-ক্ষেত্রে। বহির্জগৎ থেকে তিনি ক্রমে চলে আসেন মনোজগতে।

কৃষ্ণের বিরহে গোপীর যে দশ দশা হয়, মহাপ্রভুর-ও তেমনি দশা দেখা দিতে লাগল: এগুলি হ'ল কৃষ্ণের বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের ক্ষীণতা, অঙ্গের মালিন্য, প্রলাপ বকা, রোগের ন্যায় দেহের উত্তাপ, উন্মাদ-ভাব, মোহ ও মূর্ছা। এই দশ অবস্থার কোন্‌টি কখন জেগে ওঠে তার স্থিরতা নাই। রামানন্দ রায় আর স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর এই নিবিড় রসানুভূতির সঙ্গী। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তাঁরা তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় অতিবাহিত ক'রে প্রভুকে ভিতর-প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়ে রামানন্দ গেলেন নিজ-ঘরে; স্বরূপ এবং গোবিন্দ শয়ন করলেন প্রভুর দরজার সম্মুখে।

প্রভুর অভ্যাস সারারাত্রি ধ'রে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। একবার জেগে ভিতর থেকে গৌরাঙ্গের কণ্ঠে কৃষ্ণনাম শুনতে পান না। ব্যাপার কী? নীরব কেন? তাড়াতাড়ি উঠে ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখেন, অন্য তিনটি দরজার দ্বার বন্ধ করাই আছে কিন্তু কক্ষে কেউ নাই। কোথায় গেলেন প্রভু? সবাই চিন্তিত হয়ে মশাল জ্বেলে নিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজ করতে লাগলেন।

অবশেষে দেখা গেল, সিংহদ্বারের উত্তর দিকে এক জায়গায় গৌরাঙ্গ মাটিতে প'ড়ে রয়েছেন। দেখলে বিস্ময় লাগে। শরীর হয়েছে পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ, অচেতন, নাসিকায় শ্বাস বয় না। হাত-পা-গলা-কটিদেশ সকল সন্ধিস্থান ফাঁক হয়ে গেছে, জোড়ার হাড় পৃথক হয়ে পড়েছে, পাতলা চামড়া দিয়ে কেবল প্রত্যঙ্গগুলি সংযুক্ত রয়েছে। চোখের তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্থির হয়ে আছে, মুখ থেকে ঝরছে লালা ও ফেনা।

এই দৃশ্য দেখে ভক্তদের প্রাণ উড়ে যায়। প্রভু বোধ হয় ভাব-সমাধিতে

দেহত্যাগ করেছেন! স্বরূপ গোঁসাই তখন অন্যান্য সকলের সঙ্গে প্রভুর কানে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম শোনাতে লাগলেন। আবেগে ভক্তদের গলা কাঁপে; মনে ক্ষীণ আশা—নিশ্বাসবিহীন হ'লেও দেহ জ্যোতির্ময়; হয়ত সমাধি ভঙ্গ হ'তে পারে। অনেকক্ষণ পরে প্রভুর চেতনা ফিরে আসে, শিথিল অস্থি যথাস্থানে জোড়া লাগে, শরীর স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। 'হরিবোল' ব'লে গর্জন ক'রে উঠে বসেন তিনি। ভক্তদের উল্লাস-ধ্বনিতে নৈশ আকাশ মুখরিত হয়।

* * * *

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রের দিকে চলেছেন। চটক-পর্বতের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মনে হ'ল ওটি গোবর্ধন-গিরি। ভাবে আবিষ্ট হয়ে বায়ুবেগে ছুটে চললেন সেই দিকে। গোবিন্দ ছুট্‌লেন পিছে পিছে কিন্তু ধরতে পারলেন না। মহা সোরগোল উঠলো, যে যেখানে ছিল সবাই ছুট্‌লো গৌরাঙ্গকে অনুসরণ ক'রে—স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, শঙ্কর-পণ্ডিত, পুরী, ভারতী গোস্বামী—সবাই ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন সাগর-তীরে। খঞ্জ ভগবান আচার্য ধীরে ধীরে এলেন সকলের পিছনে।

প্রভু প্রথমে ছুট্‌ছিলেন বায়ুবেগে; হঠাৎ তাঁর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। স্তম্ভ-ভাব দেখা দিল, দেহ হ'ল অনড় অচল, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। প্রতি রোমকূপ ব্রণের আকারে ফুলে উঠেছে, তার ওপর রোমগুলি সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন প্রস্ফুটিত কদম ফুল। রোমকূপ দিয়ে ঘামের আকারে রক্ত ঝরছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে, ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছু উচ্চারিত হয় না। দুই গণ্ড বেয়ে পড়ে অশ্রুর ধারা; দেহ হয়েছে বিবর্ণ, রক্তহীন শঙ্খের মতো সাদা। সাগরের বুকে যেমন ঢেউয়ের আন্দোলন তেমনি তাঁর সর্বশরীর প্রবল কম্পে আন্দোলিত হ'তে থাকে; কাঁপতে কাঁপতে তিনি মাটিতে প'ড়ে যান।

প্রভু মাটিতে প'ড়ে যেতেই গোবিন্দ এসে উপস্থিত হলেন; করোয়া থেকে জল নিয়ে সর্বাঙ্গে সিঞ্চন করলেন, বহির্বাস দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে স্বরূপ এবং অন্যান্য ভক্তগণ এসে পড়েছেন। প্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। উচ্চ সংকীর্তন ক'রে ঘন ঘন শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে। এই রকম অনেকক্ষণ করার পর 'হরিবোল' ব'লে গৌরাঙ্গ আচম্বিতে উঠে বসলেন। আনন্দে সবাই 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রভুর যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেন কিন্তু কোথায় আছেন বুঝতে পারেন না। ভক্তদের দেখে অর্ধচেতনা লাভ করেন যেন। স্বরূপকে বলেন—গোবর্ধন থেকে এখানে আমাকে কে নিয়ে এল? কৃষ্ণের দর্শন থেকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে কে নিয়ে এসেছে? কৃষ্ণের লীলা দেখার সুযোগ পেয়েও দেখতে পেলাম না। তোমরা আমাকে দুঃখ দেবার জন্য কেন সেখান থেকে নিয়ে এলে!

ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণলীলা দর্শন করছিলেন। ভক্তদের চেষ্টায় জ্ঞান ফিরে আসায় সে ভাব তিরোহিত হ'ল, দুঃখে তাঁর অন্তর হ'ল পরিপূর্ণ। আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন তিনি। তাঁর দশা দেখে বৈষ্ণবগণ-ও অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন না। ভক্তগণ উপলব্ধি করেন প্রভু যতক্ষণ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় থাকেন ততক্ষণই তিনি আনন্দে প্রফুল্ল, জাগ্রত অবস্থা তাঁর কাছে কষ্টকর। কৃষ্ণের জন্য উন্মাদনা এমন প্রবল যে, বিরহ-জ্বালা সহ্য হয় না। যখন ভাবাবেশে বিভোর হয়ে থাকেন তখনকার অবস্থা দেখেও ভক্তগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনিভাবে কৃষ্ণ-বিরহে এবং ভাব-মিলনে দিন-রাত্রি কাটে। শরৎকালের জ্যোৎস্না রাত্রিতে মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ কিরণধৌত আকাশের নীচে গৌরাঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে এক উদ্যান থেকে অন্য উদ্যানে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ভ্রমণ করেন। রাসলীলার শ্লোক আবৃত্তি করেন, গান শোনেন। কখন-ও বা প্রেম-বিহ্বল হয়ে নিজেই রাসলীলার অনুকরণ করেন, আনন্দের আতিশয্যে উদ্যানের মধ্যে ছুটাছুটি করেন, কখন-ও সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যান। দিনরাত্রির প্রতি মুহূর্ত উন্মাদনাময়।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥

*　　*　　*　　*

একদিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় অতিবাহিত ক'রে তাঁকে ভিতরের প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়ে নিজেদের ঘরে গেলেন। গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করেছেন গোবিন্দ। সারারাত্রিই প্রভু কৃষ্ণ-নাম সংকীর্তন করেন। এক সময়ে গোবিন্দ প্রভুর ঘরের ভিতর থেকে সাড়াশব্দ শুনতে না পেয়ে উঠে এসে দেখেন গৃহমধ্যে গৌরাঙ্গ নাই। তাড়াতাড়ি স্বরূপকে ডেকে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে ভক্তগণ প্রভুর সন্ধান করতে লাগলেন। গম্ভীরার ভিতর থেকে রাস্তায় আসতে তিন মহলে তিনটি দরজা।

দরজা একটিও খোলা হয়নি, যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। অবশেষে দেখা গেল, সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে তেলেঙ্গা গাভীগণের মধ্যে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে রয়েছেন প্রভু। ভাবের আবেশে প্রাচীর ডিঙিয়ে এসে পড়েছেন।

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥

এবার অঙ্গের সন্ধিস্থল দীর্ঘ শিথিল হয়নি, হয়েছে তার বিপরীত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, কচ্ছপের মতো হাত-পা যেন দেহের ভিতরে প্রবেশ করেছে, দেহ রোমাঞ্চিত, চোখে অশ্রুর ধারা। অচেতন হয়ে আছেন কিন্তু অন্তরের আনন্দে দেহ উদ্ভাসিত। গাভীগুলি গৌরাঙ্গের চারিদিক ঘিরে তাঁর শ্রীঅঙ্গ শুঁকছে, সরিয়ে দিলেও যেতে চায় না, আবার ফিরে আসে দেহের ঘ্রাণ নেবার জন্য।

অনেক চেষ্টাতে-ও সম্বিৎ ফিরে এল না। ভক্তগণ তখন প্রভুকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন ঘরে; বহুক্ষণ উচ্চকণ্ঠে নাম-সংকীর্তন করার পর তাঁর চেতনা ফিরে এল ধীরে ধীরে। দেহ আবার স্বাভাবিক আকার ধারণ করলো। এইভাবে দিনরাত্রি প্রভু কৃষ্ণময় জগতে বাস করছেন, সেখানে দেহবোধ নাই, আছে কেবল আনন্দময় অনুভূতি।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা
আপনে আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥

মানুষের স্থূল দেহ কতখানি মনোময় হ'তে পারে, কতখানি নিবিড়ভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করা চলে, মহাপ্রভু নিজের ভাবাবেশের ভিতর দিয়ে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

* * * *

শরৎকাল। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ভক্তগণসহ প্রভু ভ্রমণ করছিলেন। আইটোটা থেকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো সমুদ্রের ওপর। নীল জলে তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, তার ওপর পড়েছে রজতশুভ্র চন্দ্রকিরণ। উপরে চন্দ্রালোকিত স্নিগ্ধ শান্ত আকাশ, নীচে তরঙ্গায়িত নীল জলে রূপালি জ্যোৎস্নার মেশামেশি। একটি স্থির, অন্যটি চঞ্চল। আকাশ শান্ত মহিমায় স্তব্ধ হয়ে থাকে, সমুদ্র উচ্ছল আনন্দে করতালি দিয়ে আহ্বান করে যেন। এই মনোহর দৃশ্য দেখে গৌরাঙ্গ জ্ঞান হারালেন, নিজেকে ভুললেন, সঙ্গীদের কথা ভুললেন, স্থান-কালের কথা বিস্মৃত হলেন। কৃষ্ণভাবে ভাবিত তিনি। তাঁর মনে হ'ল—ঐ তো

যমুনা! নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ ক'রে যমুনা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে!

বিমোহিত হয়ে গৌরাঙ্গ ছুটে গেলেন সমুদ্রের দিকে, অন্যের অলক্ষ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সমুদ্রের জলে। মূর্ছিত অচেতন তিনি; তরঙ্গে কখন-ও ভেসে ওঠেন, কখন-ও ডুবেন। ঢেউয়ের দোলায় ভাসতে ভাসতে তিনি চলে গেলেন কোণারকের দিকে।

অকস্মাৎ ভক্তদের নজরে পড়লো—প্রভু তো দলে নাই। কোথায় গেলেন? ভাবোন্মাদ অবস্থায় কোন্ উদ্যানে গিয়ে পড়লেন? না, গুণ্ডিচা-মন্দিরে? চটক-পর্বতে? না কি কোণারকের দিকে ছুটে গেলেন? চারিদিকে খোঁজাখুঁজি ক'রে কোন সন্ধান মিলল না। অবশেষে সমুদ্রের তীরে এসে সবাই সমবেত হলেন। সকলের মনেই একই প্রশ্ন—প্রভু কি এবার অন্তর্ধান করলেন? অবসন্ন ক্লান্ত হতাশ ভক্তগণ। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।

সমুদ্রের তীরে এসে বিহ্বল ভক্তবৃন্দ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে শেষবারের মতো প্রভুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল। একদল গেল চিরায়ু-পর্বতের দিকে; স্বরূপ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে চললেন পূর্বদিকে সমুদ্রের তটের ওপর দিয়ে জলে এবং সমুদ্রের ধারে খোঁজ করতে করতে। সবাই বিষাদে অভিভূত, প্রভুর তিরোধানের আশঙ্কায় সকলেরই মুখ পাণ্ডুর। কেবল প্রেম-বলে অন্বেষণ ক'রে চলেছেন।

এমন সময় দেখা গেল, একজন জেলে মাছ-ধরার জাল কাঁধে নিয়ে পাগলের মতো আচরণ করতে করতে সেই দিকে আসছে। কখন-ও হাসে, কখন-ও কাঁদে, কখন-ও হরি হরি ব'লে গান গায় আর নাচে। ধীবরের এই অবস্থা দেখে সবাই বিস্মিত হন। স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেন—ওদিকে কোন লোক দেখেছ কি? তোমার এমন দশা হ'ল কেন, বল ত?

—ওদিকে কোন মানুষ আমার নজরে পড়েনি। একবার জাল খুব ভারি বোধ হ'ল, ভাবলেম বড় মাছ বুঝি। টেনে তুলে দেখি একটি মৃতদেহ। দেখে ভয় হ'ল। পাঁচ-সাত হাত দীর্ঘ, হাত-পায়ের জোড়ার হাড়গুলি ঢিলা হয়ে গেছে, শুধু চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে, নড়বড় করে। চোখ উল্টানো, কখন-ও গোঁ গোঁ করে, কখন-ও অচেতন অসাড়। ভয়ে ভয়ে জাল থেকে তাকে ছাড়াতেই তার গায়ে হাত লেগেছে কি অমনি আমার শরীর কাঁপতে লাগল, গা শিউরে উঠলো, চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে

লাগল ; গলা যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। ব্রহ্মদৈত্য, কি ভূত ঠিক বলতে পারি না। সেই মড়া ছুঁয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-পুত্র বাঁচবে কেমন ক'রে ? তাই আমি ওঝার কাছে চলেছি ভূত ছাড়ানোর জন্য।

স্বরূপ বুঝতে পারেন ধীবর নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর স্পর্শলাভ করেছে। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—আমি বড় ওঝা, ভূত ছাড়াতে জানি। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যাকে দেখেছ তিনি স্বয়ং মহাপ্রভু। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কোথায় তাঁকে দেখেছ আমাদের দেখিয়ে দাও।

ধীবর বলে—আমি তো প্রভুকে আগে অনেকবার দেখেছি কিন্তু এ তিনি নন। এ অতি বিকৃত-আকার।

স্বরূপ বলেন—প্রেমের বিকারে দেহ ঐ রকম হয়ে থাকে ; অস্থি-সন্ধি ছেড়ে শরীর দীর্ঘ হয়ে যায়।

আশ্বস্ত ধীবর ভক্তদের নিয়ে যায় সমুদ্রের তীরে। বালির ওপর দীর্ঘ দেহ প'ড়ে আছে। বহুক্ষণ জলে থাকায় দেহের রং ফ্যাকাসে রঙহীন সাদা হয়ে গেছে।

জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায়।
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায়॥

অঙ্গ-সন্ধি এমন শিথিল হয়েছে যে, সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে আনাও কষ্টকর। ভেজা কৌপীন পরিবর্তন ক'রে শুষ্ক কৌপীন পরিয়ে দেওয়া হ'ল, গায়ের বালু ঝেড়ে ফেলে বহির্বাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে সবাই মিলে সংকীর্তন সুরু করলেন, প্রভুর কানে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম শোনাতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে জ্ঞান সঞ্চার হ'ল, দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল ; 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে হুঙ্কার ক'রে তিনি উঠে বসলেন। অর্ধবাহ্য অবস্থা। সুমধুর স্বপ্ন দেখে সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন যেন। সেই স্বপ্নের আবেশ এখন-ও রয়েছে মনের মধ্যে। ভক্তগণ আনন্দে উল্লাস-ধ্বনি ক'রে ওঠেন। সমুদ্র-কল্লোলের সঙ্গে সে ধ্বনি বাতাসে ভেসে যায়।

পূব আকাশে অরুণোদয় দেখা দেয়। সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ে নীল আকাশে, নীল সাগর-জলে। শুভ্র ফেনপুঞ্জ মাথায় নিয়ে ঢেউ ছুটে আসে তটের ওপর, যেন বিছিয়ে দেয় কুসুমাঞ্জলি। ভক্তদের মন শান্ত হয়েছে কিন্তু উদ্বেগ কাটে না। আর কতদিন এভাবে প্রভুকে ধ'রে রাখা যাবে ?

# অবসান

যাবার সময় হ'ল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি, ভ্রষ্টনীড়, পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে উড়ে যাব রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু-পরপারে।

মহাপ্রভুর পুণ্য মহাজীবন অবলম্বন ক'রে যে ভক্তিরসের উৎস গড়ে উঠেছে তার রস আস্বাদন করতে বহুজন এসেছে তাঁর সংস্পর্শে। নিজের দীপ্ত অন্তরের আলোকে অপরকে উদ্ভাসিত করেছেন তিনি। জীবন তাঁর শুভ্র জ্যোতির্ময় প্রদীপ-শিখার মতো। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী শ্রীরাধিকার মহাভাবের যে লক্ষণের কথা শাস্ত্রপরাণে লেখা আছে, গৌরাঙ্গের সাধন-জীবনে তা প্রমাণিত হ'ল। মন দেহের অধিপতি। ঐশ্বরিক ভাবের আবেশে মন যখন বিভোর, দেহের কেমন বিকার ঘটে তা দেখা গেল গৌরাঙ্গদেবের জীবনে। মানুষ মনোময়, দেহ স্থূল আধার মাত্র।

দিন-রাত্রি কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে মগ্ন থাকলেও গৌরাঙ্গ তাঁর জননীর কথা একেবারে বিস্মৃত হ'তে পারেননি। যখনি প্রকৃতস্থ হতেন মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্যপালনের কথা মনে পড়তো। তিনি তো জননীর কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে পারেননি। এদিক দিয়ে যে তাঁর কর্তব্য পূর্ণমাত্রা পালিত হয়নি। তার জন্য বেদনাবোধ ছিল মনের মধ্যে। মাঝে মাঝে তাই ভক্তদের কাউকে পাঠাতেন মায়ের খবর নিতে, তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে।

জগদানন্দ প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে গিয়ে কিছুদিন বসবাস ক'রে এসেছেন। গৌরাঙ্গ তাঁকে আবার পাঠালেন মায়ের কাছে। মাসখানেক সেখানে থেকে, নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের বিবরণ শুনিয়ে সকলের আনন্দ দান ক'রে জগদানন্দ ফিরে এলেন।

পার্ষদগণসহ প্রভু কৃষ্ণ-কথায় নিবিষ্ট ছিলেন। জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে ফিরে হৃষ্টচিত্তে প্রাণের ঠাকুরকে প্রণাম করলেন এবং সকলের কুশলবার্তা নিবেদন করলেন। ক্ষণেকের জন্য গৌরাঙ্গের মন বাল্যের লীলাস্থল নবদ্বীপ

ও ভক্ত সঙ্গীদের স্মৃতিচিত্রে পূর্ণ হয়ে গেল। বাল্যের চপলতা, কৈশোরের পাঠাভ্যাস, যৌবনের স্নেহপূর্ণ স্বপ্নময় দিন, তারপর কীর্তনের মাতোয়ারা ভাব ও কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা—এ-সব মনের পটে আঁকা, ছায়াছবির মিছিল যেন। ক্ষণেকের জন্য উন্মনা হন তিনি।

—অদ্বৈতের বার্তা কি ?

তিনি মহাপ্রভুর কাছে একটি কবিতার তর্জা পাঠিয়েছেন। জগদানন্দ তা পাঠ ক'রে শোনান—

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে বিকায় না চাউল॥
বাউলকে কহিও কারে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

হেঁয়ালিপূর্ণ কবিতা। কী বা অর্থ এর। শ্রোতারা অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। জগদানন্দ নিজেও কিছু বোঝেননি, ভাবেন এটি অদ্বৈত গোঁসাইয়ের খামখেয়ালের একটি নমুনা। তর্জা পাঠ ক'রে তিনি হাসতে থাকেন।

কবিতা শুনে গৌরাঙ্গ ঈষৎ হেসে বললেন—তাঁর যা আজ্ঞা তাই হবে।

তবে তর্জার মধ্যে কোন ইঙ্গিত নিহিত আছে ? এর ভিতর দিয়ে কোন আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ জানানো হয়েছে ?

গৌরাঙ্গের কথা শুনে স্বরূপের মনে খট্‌কা লাগে। তবে কি আচার্য এর ভিতর দিয়ে প্রভুকে কিছু বললেন ? নিজে ঠিক অনুমান করতে পারেন না, প্রশ্ন করেন—তর্জার অর্থ কি ?

মহাপ্রভু বলেন—আগমশাস্ত্রের বিধি অনুসারে প্রথমে আরাধ্য দেবকে আহ্বান করা হয়, কিছুকাল পূজা ক'রে পূজা সমাপ্ত হ'লে বিসর্জন হয়ে থাকে। মনে হয় অদ্বৈত আচার্যের এই মনোভাব এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি কি ভেবে কথাগুলি বলেছেন তা ঠিক বলতে পারিনে।

তর্জার ভাবার্থ শুনে ভক্তগণ বিস্মিত হন। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে থাকে। দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজে ; তারই করুণ সুর যেন মনের কানে ভেসে আসে। বিষাদের ছায়া পড়ে সকলের অন্তরে।

স্বরূপ গোস্বামীর কানে কথা কয়টি বাজতে থাকে—পূজা সমাপ্ত হ'লে বিসর্জন দেওয়া হয়—বিসর্জন—বিসর্জন! বিসর্জনের দিন বুঝি সত্যিই ঘনিয়ে এল।

যে কয়জন অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরায় কৃষ্ণ-কথায় প্রেমানন্দ লাভ করতেন তাঁদের মধ্যে স্বরূপ একজন। এই ঘটনার পর থেকে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-বিরহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। ভক্ত সঙ্গীরা অনুভব করেন—এ বুঝি প্রদীপ নেভার আগের অবস্থা। সদাই বিভোর। রাত্রিতে প্রেমাবেশে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, বাহ্যজ্ঞান নাই, বেরোনর পথ পান না; দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে, ঘষা খেয়ে নাক-মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য এই আকুলতা দেখে ভক্তরা চোখের জল রোধ করতে পারেন না।

আগমশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী অদ্বৈত আচার্য বিসর্জনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন; জানিয়েছেন—আবাহনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে; প্রেমভক্তি সমাজে বড়ই দুর্লভ ছিল, জ্ঞান ও শুষ্ক তর্কের ধূলিঝড়ে মানুষের বুদ্ধি ও চিত্ত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভগীরথের-আনা গঙ্গার ধারার মতো ভক্তির প্রবাহ মানুষের মনের জমিতে প্রবাহিত করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মানুষের মনে আর দুর্ভিক্ষ নাই, ভক্তিভাবের বন্যায় দেশ ডুবুডুবু। বাংলাদেশে প্রেমধর্মের যাঁরা প্রধান প্রচারক তাঁদেরই একজন খবর পাঠিয়েছেন প্রেমের অবতার যিনি তাঁরই কাছে। এবার চাঁদের হাট ভেঙে দেবার পালা।

*    *    *    *

গৌরাঙ্গের তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন রূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। ভক্তদের কাছে যিনি পরমপ্রিয়, আনন্দের উৎসস্বরূপ, তাঁর অন্তর্ধানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে লেখনী স্তব্ধ হয়। যিনি মনের মধ্যে চিরভাস্বর হয়ে আছেন, তাঁর তিরোধান হবে কিরূপে? এভাবও হয়ত গ্রন্থকর্তাদের মনে উদিত হয়ে থাকবে।

জনশ্রুতি:

যমেশ্বর টোটায় পণ্ডিত গদাধর স্থাপিত শ্রীগোপীনাথের শ্যামবর্ণ পাষাণ-বিগ্রহ ছিল। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল অবস্থায় একদিন গৌরাঙ্গ সেই দেব-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আর বেরিয়ে এলেন না। ভক্তগণ ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন মন্দিরের মধ্যে কিন্তু পাষাণ-বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নাই। গৌরাঙ্গ কি

কৃষ্ণাঙ্গে বিলীন হলেন? বিদ্যুৎ চমকের পর সৌদামিনী যেমন মেঘের গায়ে মিশে যায়, উজ্জ্বলতনু গৌরাঙ্গ কি তেমনি আত্মগোপন করলেন? ভক্তদের আকুল হাহাকার উঠলো—

কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি স্ফুরে
মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।

* * * *

চৈতন্যমঙ্গল-লেখক শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর তিরোধানের বিবরণ দিয়েছেন। ১৪৫৫ শক, আষাঢ় মাস, রবিবার, সপ্তমী তিথি। প্রভু ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনের জন্য মন্দিরে এসেছেন। ক্রমে সিংহদ্বারে গিয়ে উপনীত হলেন। অন্যান্য দিনের মতো মন্দিরের বাইরে থেকে দর্শন না ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। সঙ্গীরা থাকলেন পিছনে। গৌরাঙ্গ সহসা আবেগভরে ছুটে গিয়ে জগন্নাথের দারুময় মূর্তি দুই হাতে বেষ্টন ক'রে ধরলেন এবং কালো মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহ জগন্নাথ-দেহে বিলীন হ'ল।

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

প্রদীপ নিভে গেল। ভক্তদের কাছে জগৎ অন্ধকারময় মনে হয় কিন্তু এ ভাব স্থায়ী নয়, সাময়িক। ভক্তজনের অন্তরে গৌরাঙ্গের প্রেমঘন জ্যোতির্ময় মূর্তি স্থিরদীপ্তিতে বিরাজ করতে থাকে। সে আলোক অম্লান, অনির্বাণ।

* * * *

দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবস রাত্রি।
সম্মুখে গেছে অসীমের পানে জীবযাত্রার পন্থ,
সেথা চল তুমি—বলো, কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত॥

—রবীন্দ্রনাথ

---